দৌলতি

মহাশ্বেতা দেবী

নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট/কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭২ / জুন ১৯৬৫

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০ ডবলু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা—৭০০ ০৬

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

॥ ১ ॥

গনোরি নাগেসিয়াকে এখন সবাই টেঁড়া নাগেসিয়া বলে। আগে ও টেঁড়া, অর্থাৎ বেঁকাতেড়া ছিল না। সকলের মতো সোজা শক্ত মানুষ ছিল। কেমন সকালে ঘুম থেকে উঠত, দাঁতন করতে করতে লোটা নিয়ে চলে যেত মাঠে। মাঠ থেকে ঘুরে এসে বউকে বলত, কিছু দিবি রে?

—হাঁ হাঁ, ভাত ডাল পুরী কচৌরী।

কোন নাগেসিয়াকে কোন বউ সকালে ভাত ডাল পুরী কচৌরী দেয় না। এটা ওদের গভীর দুঃখের কথা। কিংবা যে স্বপ্ন সত্যি হয় না, সেই স্বপ্নের কথা। নাগেসিয়াদের বউরা সকালে স্বামীদের দেয় মকাই ছাতু, বা কুরথি কলাই ঘাটো। গনোরির বউও গনোরিকে তাই দিত।

খেয়ে দেয়ে এক পেট জল খেয়ে এক টিপ খৈনি মুখে দিয়ে গনোরি ছুটত মনিবের ঘরে। সকাল থেকে রাত অবধি খাটত, ধান ও গমের বোরা পিঠে বইত।

বড়ই কপাল দোষ ওর, ভেঙেচুরে টেঁড়া হয়ে গেল।

জাতে নাগেসিয়া ও, সমাজটা ওদের ছোট। পালামৌয়ে নাগেসিয়া, পারহাইয়া, এদের সমাজটা ছোট। ভুঁইয়া, দুসাদ, ধোবি, গঞ্জু, ওরাওঁ, মুণ্ডার সমাজটা খানিক বড়। গ্রামটির নাম সেওরা। মুনাবর সিং চন্দেলা রাজপুত ওর মালিক। মুনাবরের হালের বলদ দেখাটা ওর কাজ। সবই ওর কাজ। কোন্‌টা ওর কাজ, কোন্‌টা ওর কাজ নয়, তা টেঁড়ার হিসেব থাকে না।

মাঝে মাঝে টেঁড়া কল্পনা করে, শহর থেকে গাড়ি চেপে কোন চশমা আঁটা বাবু এসেছে, আর ওর কাছে শুনে শুনে সব লিখে নিচ্ছে। আসলে টেঁড়ারা শুনেছে যে কামিয়ৌতি প্রথা সরকার তুলে দেবে। সে সময়ে শহর থেকে চশমা আঁটা বাবুরা আসবে আর কাগজে সব লিখে নেবে। এটাও একটা স্বপ্ন। টেঁড়া কল্পনায় তেমন বাবুর সঙ্গে কথা বলে।

—মালিকের বাড়ির সব কাজ তোমার?

—কেন নয়, হাঁ মহারাজ?

—মুনাবরের বাড়ির সব কাজ তোমাকে কেন করতে হবে?

—কেমন করে করতে হবে না।

ও চশমা আঁটা লিখাই-পড়াই শহরের বাবু
মুনাবরের সব কাজই টেঁড়ার কাজ
আমি যে ওর কামিয়া।

—কামিয়া তুই?

– আমি ওর সেওকিয়া।

—সেওকিয়া তুই?

—আমি যে ওর বেঠবেগার।

—ওরে তুই কি? কামিয়া, সেওকিয়া, না বেঠবেগার?

—আমি সব, আমি ওর কেনা গোলাম। নাও নাও, লিখে নাও সব। লিখে নিয়ে চেপে বোসো গাড়িতে, ভোঁ করে চলে যাও শহরে, আমি জঙ্গলে পড়ে থাকি। যে যার জায়গায় থাকি। তুমি আর আমি তো দুই দুনিয়ার মানুষ।

এ রকম কথাবার্তা তো হয় নি। সবই টেঁড়ার কল্পনা। যদি এমনটি ঘটত, যদি কোন চশমা আঁটা বাবু আসত, তাহলে সে এমন কথাই টেঁড়া নাগেসিয়ার কাছে শুনত।

টেঁড়া নাগেসিয়া মুনাবর সিং চন্দেলার কামিয়া। টেঁড়া নাগেসিয়ারা কত দিন ধরে মুনাবরদের কাছে সেওকিয়া কামিয়া হয়ে আছে, তার হিসেব বা কে রাখে? সে তো শত শত বছরের কথা।

এই জঙ্গল পাহাড় দেশে কবে এলো বহিরাগত রাজপুত ব্রাহ্মণ। কবে সব জমি গেল তাদের হাতে। দরকার পড়ল শস্তা ক্ষেতমজুরের। দাদন দিয়ে দাস বানানোর সেই তো শুরু।

টেড়া নাগেসিয়া মুনাবরের কামিয়া। মুনাবর চন্দেলা মস্ত মানুষ। চারটে গ্রাম পেরিয়ে যাও। বাস রাস্তার ওপর গঞ্জ জায়গায় মস্ত বাড়ি ওর, ছড়ানো বাগান। মুনাবরের ছেলে সেখানে থাকে। ছেলে খুব লায়েক। সরকারের বড় চাকুরে। এখন দিনকাল অন্য রকম। জমিজমা ধরে রাখার জন্যেই সরকারী দপ্তরে নিজের লোক দরকার। ছেলে সরকারের বড় চাকুরে। মুনাবরের খুঁটি তাতে খুব শক্ত হয়েছে।

মুনাবর সিং চন্দেলা ওই বাড়ি বানিয়েছে। কিন্তু ও বাড়িতে সে থাকে না। সে থাকে সেওরা গ্রামে। দুসাদ, ঘাসি, নাগেসিয়া, মুণ্ডা, লোহার, ওরাওঁ, ভুঁইয়া, চামার, পারহাইয়াদের সে কামিয়া করে রাখে। কতজনকে সে দাদন দিয়েছে, কতজনকে কামিয়া বানিয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। কিসের জোরে? কোথায় তার জোর?

সে কথা সব কামিয়া মেয়েরা জানে। শীতের রাতে কামিয়া বুড়িরা আগুন জ্বেলে হাত পা সেঁকে। তখন ওরা বলে,

ঋণের জোরে, ঋণের জোরে।
দুই টাকা দশ টাকা একশো টাকা
দশ সের গম পাঁচ সের চাল
ধার দেয় মুনাবর আমাদের
আমরা জানি না কি করতে হবে
বোকার মতো চেয়ে থাকি
ওর পোষা লাকড়াগুলো আমাদের হাত চেপে ধরে
আমাদের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে কালি মাখায়
সাদা কাগজে ছাপ নিয়ে নেয়
কাগজটা তুলে রাখে সিন্দুকে
এ রকম কত হাজার কাগজ ওর আছে

ঋণের জোরে ও মহারাজ।
ঋণের জোরে ও সরকার।
পাটোয়ারি ও, জঙ্গল অফিসার ও,
থানা ও, পুলিস ও,
ওই হাকিম হুকুম আদালত।
ও যদি শহরে যেতে চায়
সেদিন রেলগাড়ি দাঁড়ায় চৌকিপুরা হল্‌টে
ও যদি নেমন্তন্ন করে
মন্ত্রী চলে আসে সেওরা গ্রামে
ঋণ দিয়ে ও সরকার বনে গেছে
আর আমরা বনে গেছি কামিয়া
আমাদের আর মুক্তি নেই॥

টেড়া নাগেসিয়ার নাম যখন গনোরি, তখন ও মুনাবরের কাছে টিপছাপ দিয়ে তিনশো টাকা নিয়ে নেয়। কতখানি সাহস বেড়েছিল ওর, যে তিনশো টাকা নিয়েছিল, ভাবলে পরে আজও ওর মাথা ঘুরে যায়। সে সময়ে ওর দরকার পড়েছিল খুব। হাট থেকে মোষ চুরি করার দায়ে ওরা বেশ কয়েকজন জেলে গিয়েছিল। জেলে গেলে জেল খাটলে পরে বাড়ি ফিরে জাতপাতকে ভোজ দিতেই হবে। এটা এমন একটা নিয়ম, যে তা থেকে আর অব্যাহতি নেই।

সে সময়ে একই সঙ্গে ওর বড় মেয়ের বিয়ে হল, বড় ছেলের বিয়ে হল, জাতপাতকে ভোজ দিতে হল বার বার। জেল থেকে ফেরার দরুণ প্রায়শ্চিত্তও ছিল। জামাইকে একটি ছাগল দিতে হল। নানা কারণ ওই অত টাকা গনোরি ধার নেয়। সব কাজ মিটে যাবার পরেও কিছু আটা বেঁচেছিল। সে আটা জলে গুলে ফুটিয়ে বেশ কয়েকদিন খাওয়া গিয়েছিল। ওই টাকা নিয়েই গনোরি কামিয়া বনে যায়।

কামিয়া বনে যাওয়াটা সেদিন গনোরির কাছে বিশেষ কোন দুর্ভাগ্য বলে মনে হয় নি। জন্ম থেকেই সে কামিয়া দেখছে'চার

ধারে। কামিয়া হয়ে যাওয়াটা বিধির বিধান। বিধাতাপুরুষ নেড়া-মাথা বামুন সেজে নবজাতকের ললাটলিপি লিখতে আসেন। তিনি যা লিখে দিয়ে যান, কেউ সে লিপি এড়াতে পারে না।

উঁচু জাতের ছেলের কপালে লিখে দেন জমি-জেরাত, গাই-মহিষ, তেজারতি কারবার। লেখাপড়া, চাকরি-নোকরি, ঠিকাদারি।

নিচুজাতের ছেলের কপালে লিখে দেন কামিয়ৌতি।

আকাশে চাঁদ সূর্য ওঠে, বিধাতার নিয়ম। সেওরা গ্রামের গরিব ছেলেরা মুনাবরদের কামিয়া হয়, বিধাতার নিয়ম।

সে নিয়ম কে পালটাবে?

গনোরি নাগেসিয়া সে মানুষ নয়। সে মালিকের লক্ষ কাজ করত, হাল-বলদ দেখত। সন্ধেবেলা দামী দামী বলদ মহিষ গোহালে তুলে দিয়ে তবে ওর কাজ ফুরাত। তখন ও নিজের ঝোপড়িতে ফিরত। ঝোপড়ির চেয়ে ভালো ঘর ওদের হয় নি, কখনো হবে না। বনো নাগেসিয়া ভালো ঘর বানাতে গিয়েছিল, তারপর তার খুবই দুর্দশা হয়।

নাগেসিয়ারা এ কথা ভালো করেই জানে যে, একটি নাগেসিয়া শিশুর বয়স যেদিন ছয়দিন হবে, সেদিন আকাশ থেকে বিধাতাপুরুষ ঝুলিয়ে দেবে একটি হলুদরঙা হলুদে ছোপানো সুতো। সেই সুতো ধরে বিধাতাপুরুষ নেমে আসবে পৃথিবীতে। চেহারাটা হবে একটা নেড়া-মাথা বামুনের মতন।

নাগেসিয়ার শিশু আর মা যে ঘরে, সেই ঝোপড়িতে সে ঢুকবেই না কোন মতে। ঝোপড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে খেরো খাতায় মোটা কলমে কায়েথি হিন্দীতে সে লিখে দেয়, যেমন জনম নিয়েছ, তেমন জীবন কাটাবে। ঝোপড়ি ছাড়া ভালো ঘর কখনো বানাবে না।

সেওরা গ্রামের বনো নাগেসিয়া সে কথা মনেই রাখল না। বরাবর তার পায়ের নিচে চাকা। এখানে যায়, ওখানে যায়। বিহারের বাতাসে না কি টাকা ওড়ে। উঁচু জাতের মানুষরা সে খবর জানে। আমি তো নাগেসিয়া, খুব নগণ্য মানুষ। তা বলে চেষ্টা করে দেখব না? যৈসে জনম ঐসে করম এ কথা আমি মানি না।

বনো চলে গিয়েছিল কয়লা কাটতে ধানবাদে। এক ঠিকাদার তাকে ডেকে নিয়েছিল। রাঁচি জেলায় মুণ্ডাদের নিয়ে যাচ্ছি কয়লা খাদানে। ওদের মতো তোর নামটাও মুণ্ডা বলে লিখে নিই। ঠিকানা লিখে নিই ডুরাণ্ডা থানা। চল্ রে চল্। কয়লা খাদানে কাঁচা পয়সা পাবি।

কয়লা কেটে কাঁচা টাকা নিয়ে ফিরে এসেছিল বনো। টাকার গরমে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল ওর। কেন ঘুরবে না, তাই বল? কাঁচা টাকা, নগদ টাকা, সেওরা গ্রামে কোন্ নাগেসিয়াটা দেখেছে?

আর কোন্ নাগেসিয়া জেনে এসেছে পাতালের খবর? মাটির ওপরের দুনিয়াটা দেখ. নিচে আছে পাতাল। বনো বলত, আরে বাপরে বাপ! আকাশের অন্ধকার দেখেছি। কয়লা খাদানে দেখলাম পাতালের অন্ধকার। ডবল আঁধার। কত নিচে নামতাম, সে যেন পাতালপুরী।

—কি দেখলি?

—কি দেখার আছে? আঁধার দেখে এলাম।

ধানবাদ থেকে টাকা এনে বনো ঘর বানাতে গিয়েছিল। কাঁচা ইঁটের ঘর। এ ঘর খুব পাকা, খুব শক্ত।

কাঁচা ইঁটে চমৎকার ঘর বানিয়েছিল। ধানবাদ থেকে যত টাকা এনেছিল সবই ও ঘরের পিছনে ঢেলেছিল। দেখে অন্য নাগেসিয়ারা নিশ্বাস ফেলেছিল।

হিংসেয় নিশ্বাস ফেলে নি। সেওরা গ্রামের নাগেসিয়ারা হিংসেয় নিশ্বাস ফেলে না। তারা তো মুনাবরের বউ নয় যে হিংসেয় নিশ্বাস ফেলবে।

মুনাবরের বউ পরের ভালো দেখতে পারে না। সাদাসিধে মানুষ, মোটা শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করে। হুঁকো টানে। কোন কথা সে লুকোতে জানে না। সব সময়ে বলে, পরের ভালো দেখতে পারি না মা!

মাঝে মাঝে ছেলের বাড়ি যায়। বলে যায়, একটি মাস থাকব ওখানে। চারদিন বাদেই ফিরে আসে।

—কেন ফিরে এলে, ও মালকিন ?

—থাকতে পারলাম না।

—কেন মালকিন কেন ?

—বউ থাকতে দিল না।

—বউ কি করল ?

—কিছুই করে নি আমাকে। আমাকে কি করবে ? হালুয়া বানাবে, তা দিল এতখানি ঘি ঢেলে। কাপড় ছিঁড়ল, তো দিয়ে দিল দাইকে। সাধুসন্ত ভিক্ষে চাইল, দিল একটা টাকা। দেখে হিংসে হয় খুব, বুক যেন পুড়ে যায়।

—সেইজন্যে চলে এলে ?

—আরো দেখলাম, নতুন ঘর তুলছে, গরু কিনছে। পরের ভালো দেখতে পারি না মা, হিংসে হয়।

—পর কোথায়, তোমারই ছেলে তো।

—ওগো, আপনি ছাড়া সবাই পর।

মুনাবরের বউ খোলামেলা মানুষ। পরের বাড়বাড়ন্ত দেখলেই তার মনে কষ্ট হয়। তাই ও দেখতে যায় না কিছু। ঘরে বসে মোটা হবার কষ্টে হাঁসফাঁস করে আর শাপশাপান্ত দেয়।

মুনাবর অসৎ রকম মানুষ।

সেওরার নাগেসিয়ারা বনো নাগেসিয়ার ঘর তোলা থেকে নিশ্বাস ফেলেছিল। এ কি করছে বনো ? এমন কাজ তো নাগেসিয়ারা করে না। হাতে দুশো টাকা এসেছে বলে ঘর তুলবে

প্রথমত নাগেসিয়ার হাতে টাকা থাকতে নেই। থাকে যদি, সে টাকায় ঘর তুলতে নেই। ঘর তুলেছ, বা মোষ কিনেছ, তখনই মালিকের নজর পড়বে। জমি কিনলে মালিক কেড়ে নেবে। গরু মহিষ কিনলে মালিক কেড়ে নেবে। মাথার ছাতা, পায়ের জুতো কিনলে ঘরের উঠোনে খুঁটিতে বেঁধে পিটাবে। সেজন্যেই বনোকে ঘর তুলতে দেখে অন্য নাগেসিয়ারা নিশ্বাস ফেলেছিল। এ কেমন কাজ করছে বনো, মুনাবর সিং চন্দেলা তো এটাকে ভয়ংকর ঔদ্ধত্য

বলে ধরে নেবে। যে ভাবেই হোক, বনোকে শাস্তি দেবেই দেবে।

বুড়ো ভুনেশ্বর বলেছিল, সংসারে তোর পিসি, বউ আর ছেলে। টাকাটা নিয়ে ওদের নিয়ে যদি অন্য কোথাও চলে যেতিস তাহলে কত ভালো হত।

—কোথায় যেতাম?

—আবার ধানবাদ যেতিস।

—গিয়ে কি করতাম?

—খাদানে কাজ করতিস।

—খাদান! কাজ!

—বা রে, সেই কাজ করেই তো টাকা আনলি। বাপ রে বাপ! অত অত টাকা!

—এ সব কথা তো ফাঁস করতে চাই নি। এখন দেখছি যে বলতেই হয়। আমি ছিলাম ঠিকাদারের লেবার। ঠিকাদার যাকে নেয়, সে লেবার কাজ কবে খাদানে। হাতে টাকা সামান্যই পায়।

—সে কি কথা?

—ঠিকই বলছি। ঠিকাদাররা জবর ঠকায়। সে কথা ইউনাইনের বাবুদের বলতে বাবুরা সে কথা মুখে মেনে নিল। কাজের কাজ কিছুই করল না। ঠিকাদার আর ইউনাইনে ভেতর ভেতর দোস্তালি। কয়লা খাদান সরকার নিয়ে নিল। কিন্তু পাকা লেবার আর কতজন? লেবার তো আনে ঠিকাদার। পাকা লেবারের জন্যে ইউনাইন আছে। ঠিকাদারের লেবারকে পাকা কর এ কথা কোন ইউনাইন বলবে না।

—তার মানে দাঁড়াল কি?

—ওই তো কথা! সরকার—ইউনাইন—ঠিকাদার—বস্তিমালিক—বাজারিয়া—দোকানিয়া—ডাকঘর, সবাই সবায়ের দোস্ত। খাদানে নামতাম, সে কি আঁধার রে বাবা! আর হপ্তা যেদিন মিলত, সেদিন তো খাদানের উপরেও ডবল আঁধার। ঠিকাদারের মস্তানরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। টাকা কেড়ে নেবে। আমরা হাতে পাব ওল্টো বাট্টা দিয়ে।

—তোদের তো খুব কষ্ট গেছে।

—ইউনাইন কোন সুরাহা করে না। সরকারী অফিসারকে বল, তো সে হাসবে। বস্তিমালিক ঘর ভাড়া কেটে নেবে। বাজারিয়া দোকানিয়া লোক ভুখা লাকড়ার মতো ছোঁ মারবে। গরহিসাবে হিসাব বুঝে নেবে। কুলির রক্ত সবাই শুষে খায়। ঘর থেকে খত গেলে পিওন খত দেয় না. টাকা দাও। ঘরে টাকা ভেজব, তা ডাকবাবু বলে, আমার বাট্টা দে।

—তবে টাকা আনলি কেমন করে? তোর পিসি খুব কাঁদত তোর জন্যে। আমি বুঝাতাম, কেঁদে কেঁদে বনোর অমঙ্গল করছ কেন? সে ভালো আছে।

—না চাচা, ভালো ছিলাম না।

—টাকা আনলি কেমন করে?

—অনেক কষ্ট করে। তুমি ভাবছ যে সেওরাতেই টাকা ধার নিয়ে মানুষ বন্ধুয়া হয়ে যায়? খাদানেও ধার নেয় আর মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে যায়।

—তোর টাকার কথা বল।

—একটা মস্তান আসত কুলিধাওড়ায়। তার মদের দোকানও ছিল। সে ধাওড়ায় ঘুরত। তার অনেক টাকা। সব সময়ে পকেট মোটা। সিগারেট কিনবে, তাও একশো টাকার নোট বের করত। তার মতো পয়সাঅলা লোক দেখা যায় না।

—ধাওড়ায় যেত কেন?

—মেয়েছেলের লালচে। কোন মেয়েটাকে ছাড়বে না। তারপর আমাদের ঘরে ঢুকে ঘুমোবে। সেদিন অনেক রাত হয়েছিল। মদও খুব খেয়েছিল। শেষে বেহোঁস বেচেতন হয়ে আমার ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে গেল। কত লোক আছে, তারা ঘুমোলে বাচ্চাদের মতো দেখায়। মুখ দেখলে মনে হয় এ কোন মায়ের দুলার হবে, মনে মমতা আসে। মস্তান ঘুমোলে মনে কোন মমতা আসে না। দেখলে পরে তাকে মায়ের দুলার বলেও মনে হয় না। এই মস্তানটা সেই রকম।

—তার টাকা নিলি ?

—কোন মমতা আসে না মনে। মস্তান ঘুমোলে তোমার মনে হবে, এ কোন শয়তান ঘুমোচ্ছে।

—তাকে মারলি ?

—আমি মারি নি চাচা। আমি বসে ওকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কুলির টাকা চুষে নেবে বলে ধাওড়ায় চোলাই মদের কারবার খুলেছ। কুলির মেয়ে বউয়ের ইজ্জত নিচ্ছ। তুমি বহোত শয়তান। সেই সময়ে...

—কি হল ?

—আমার হাত দুটো যেন নেচে উঠল। হাত দুটো বলল, দিই গলাটা টিপে। আমি তো তাদের কত বুঝালাম। হাত দুটো তা মানল না। বলল যে আমরা খাদানে কয়লা কাটি। আমাদের যা ইচ্ছে তাই করব।

—তারপর ?

—আমার হাত তো নেচে উঠল। ছুটে গেল। ঘুমোলে মাতাল কত ভারি হয়ে যায়। মরে গেলে তো আরো ভারি। হাত দুটোর কি শক্তি তাই বল ? আমার শরীরেও শক্তি তো নেই। দুবলা পাতলা মানুষ। আমিই তো সেই রাতদুপুরে ওকে টেনে টেনে কত দূরে নিয়ে গেলাম। বহোত দূরে একটা নালার কাছে ফেলে দিলাম। গড়িয়ে দিলাম নালায়। তখন মনে শুধু একটা ভাবনা যে, বস্তিতে ওর লাশ পাওয়া গেলে কুলিদের ওপর হামলা হবে।

—ওর টাকা নিলি ?

—না, বনো টাকার জন্যে খুন করে নি। ঘরে ফেরার সময়ে দেখি ওর ব্যাগটা পড়ে আছে। ব্যাগ খুলে দেখি অনেক টাকা।

—তোকে ধরবে না পুলিস ?

—চাচা, ধানবাদ টাউনে এমন কত খুন হয়, কোন্‌টার বা ফয়সালা হচ্ছে ? আর ধরবে কাকে ? ওরা কি আমার নাম জানে,

না ঠিকানা জানে ? ওরা জানে আমি বনো মুণ্ডা, রাঁচি জেলায় ঘর। খুঁজলে খুঁজবে বনো মুণ্ডা, ডুরাণ্ডা থানা, রাঁচি জেলা।

—যাক, বেশ করেছিস।

—আমি নয়, আমার হাত দুটো।

—ঘর বানাচ্ছিস কেন, তাই বল।

—কি করব বল ? বাসন-বর্তন, গরু-মহিষ, যা কিনব তাই তো কেড়ে নেবে মালিক। ঘর তো নিতে পারবে না।

—ভালো ঘর বানাচ্ছিস, মালিক রুখে উঠবে না ?

—না না। আমি মালিকের কাছে গিয়েছিলাম। মালিকের পা ধরে হুকুম চেয়ে নিয়েছি।

—মালিক হুকুম দিল ?

—দিয়েছে।

—দিয়েছে !

ভুনেশ্বরের ভুরু কুঁচকে গেল। তার মনে সংশয় দেখা দিল। বনো নাগেসিয়া নিজের খরচে কাঁচা ইটের ঘর তুলবে, মালিক তাকে অনুমতি দিল ? কেন দিল ? তার মনে যে সংশয়, তার মূল অনেক গভীরে। তার পিছনে আছে এক কাহিনী, যে কাহিনী গঙ্গানদীর মতো, হিমালয় পাহাড়ের মতই চিরন্তন।

এ সব কথা শহরের চশমা আঁটা বাবুরা কখনো বুঝবে না। সেওরা গ্রামের নাগেসিয়াদের মধ্যে বনো গিয়েছিল ধানবাদ, আর ভুনেশ্বর একবার ডালটনগঞ্জ গিয়েছিল। পাশের গ্রামের মাস্টার বাবু তাকে ডেকেছিলেন। সেখানে এক চশমা আঁটা বাবু তাকে কত কথা জিগ্যেস করেছিলেন। সব কথাব জবাব ভুনেশ্বর দিতে পারে নি। কিন্তু মনে তার অনেক প্রশ্ন জেগেছিল। সেগুলি সে মাস্টার বাবুকে শুধায়। মাস্টার বাবু জাতে চামার, পাটনা জেলার লোক। চামার জাতের লোক মাস্টার হয়ে এসেছিল বলে মুনাবরের মতো সব মালিকরাই খুব ক্ষেপে যায়। তারাই কৌশল করে মাস্টারকে তাড়ায়। মাস্টার ডালটনগঞ্জ চলে যাবার সময়ে

ভুনেশ্বরকে যেতে বলেছিলেন। ভুনেশ্বর তাঁকে পরে অনেক কথা বলে।

—বাবু! চশমা পরা বাবু এলো শহর থেকে। শহরে বিজলীবাতি জ্বলে, কত গাড়ি চলে। সেখানে জাতপাতের কথা কেউ বলে না। সে তো বলে গেল যে আমরা সবাই আজাদী হয়ে গেছি, এখন আর জাতেপাতে ভেদ নেই।

—তাই তো সত্যি চাচা!

—তা যদি হবে তাহলে নিয়মগুলো পালটায় না কেন? নাগেসিয়া-দুসাদ-গঞ্জু কখনো বন্দুক উঁচিয়ে ব্রাহ্মণ বা রাজপুতকে তো মারে না?

—এ সব চিরকাল হয়ে আসছে, তা বলে এখন আর চলতে পারে না। সেও তো সত্যি।

—বাবু, যা হয়ে এসেছে সেই আদতই বহাল আছে। আমি তো দেখছি যে সুরজনারায়ণ পূবে উঠছেন. পাখি বটফল খাচ্ছে, কোয়েল নদী বহে যাচ্ছে।

—বা ভুনেশ্বর, বেশ বলছ তো?

—আর দেখছি যে পুরনো নিয়মই বহাল আছে। আমার টাকায় আমি ঘর বানাব, মালিকের হুকুম চাই। আমার পয়সায় বাসন-বর্তন কিনব. মালিকের হুকুম চাই। আমি পয়সা থাকলেও কাঁসা পিতলের বাসনে খেতে পারব না, মাথায় ছাতা পায়ে জুতো দিতে পারব না, সরকারী ইস্কুলে ছেলে পাঠাতে পারব না, মালিকের হুকুম নেই।

— এ রকম নিয়মও আর নেই।

—এই নিয়মই চলছে বাবু। রাজপুত বা ব্রাহ্মণ তো চামার আর ঘাসির পায়ের কাছে নজরানা নামিয়ে বলে না, হুকুম দিয়া যায় মালিক পরোয়ার! আমার ছেলের বিয়ে দেব, আমার মেয়ের দ্বিরাগমন হবে, মা মরেছে, কিরিয়া কাম করব। সবাই সমান? কিসে সমান?

—বললে না কেন বাবুকে ?

—বাপরে, বললে পরে আঁখ মোটা করে বাবু আমাকে ধমক মারত না ? শহরের উঁচু জাতের বাবু দেহাতের ছোটলোকের কথা শুনে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে উঠে যেত ।

ভুনেশ্বর এ সব কথা বনোকে বলল না। মালিক হুকুম দিয়েছে, এ কথাটা ওর মনে যে সংশয় জাগাল, তা খচখচ করতে থাকল ।

বনো নাগেসিয়া ঘর উঠাল। ঘরের দেয়ালে চুনকাম হল। ঘরের চালে ছোন পড়ল। বনোর পিসি রং গুলে সাদা দেয়ালে আঁকল বানর, হাতি, ঘোড়া, পাখি, ফুল। সবাই দেখতে এলো। সবাই তারিফ করল।

মুনাবর সিং চন্দেলা লোক দিয়ে বাড়ি ঘিরিয়ে বনোর ঘরটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। লোকগুলো লাঠি মেরে পিসি, বউ, ছেলে আর বনোকে বের করেছিল। বনোকে ওরা শুওরের মতো আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে-ছেঁদে টাঙিয়ে মুনাবরের কাছারিতে নিয়ে গিয়েছিল।

তখন বেশ অন্ধকার। মুনাবরের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু বনো বুঝতে পারছিল যে মুনাবরের মুখ দেখলেও মনে কোন মমতা আসবে না। একবারও মনে হবে না মুনাবর কোন মায়ের দুলার।

মস্তানটা যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন বনোর হাত দুটো তাকে অনেক কথা বলেছিল। এখন তো ওর দুটো হাতই নতুন দড়িতে বাঁধা। তাই হাত দুটোও কোন কথা বলছিল না। সারা রাত মুনাবর ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। সকালে বাঁধন খুলে দিয়ে একটা সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে নিয়েছিল।

—এই নে পঁচিশ টাকা। ঘর জ্বলে গেছে বলে ধার নিচ্ছিস টাকাটা। এখন থেকে তুই আমার কামিয়া। গতরে খেটে টাকা শোধ দিবি। তোর পিসি, বউ আর ছেলেকেও কামিয়া বানাতে পারতাম। কিন্তু ওদের দেহে কোন শক্তি নেই, খাটতেও পারবে না। সকলকে জলখাই লুকমা দেবার খরচই উঠবে না।

বনো উঠে দাঁড়িয়েছিল।

—মন দিয়ে খাটলে পঁচিশ টাকা শোধ হয়ে যাবে। আবার যাবি ধানবাদ, আবার টাকা আনবি।

বনো জবাব দেয় নি।

—যা, পাকা মকান তুলে নে। কথাটা বলে মুনাবর হেসেছিল। ওর প্রশ্রয় পেয়ে আর পাঁচজনও হেসেছিল। বনো বেরিয়ে এসেছিল। ওর শরীরে রক্ত দনাদন চলছিল।

ওর পিসি, বউ আর ছেলেকে ভুনেশ্বর নিয়ে গিয়েছিল। বনোকে দেখে পিসি কেঁদে উঠেছিল। ভুনেশ্বর ওকে থামিয়ে দেয়। কান্নার কি হয়েছে? গরিব নাগেসিয়া নতুন ঘর বাঁধলে সে ঘর মালিক কি আগে জ্বালায় নি? গরীব নাগেসিয়া কি এর আগে কামিয়া বনে যায় নি? এমনটা আগেও হয়েছে, পরেও হবে। সুরজনারায়ণ যতদিন পূবের পাহাড় থেকে উঠবেন আর পশ্চিম পাহাড়ে অস্ত যাবেন, ততদিন এমনই চলবে।

ভুনেশ্বর গভীর মমতায় বলেছিল, বনো! ভাবিস না। আমরা সবাই বন থেকে বাঁশ আনব, মেহনতও দেব, ঘর আমরা পাঁচজনে তুলে দেব।

—মৌয়া আছে?

—খাবি?

—গায়ে মালিশ করতাম।

—পিদিমের পোড়া তেল দিচ্ছি।

পিদিমের পোড়া তেল খুব যত্ন করে বনোর সর্বাঙ্গে মালিশ করে দিয়েছিল ভুনেশ্বর। বনোর পিসি আর বউকে বলেছিল, তোরা আমার ঘরে থাক এখন। নতুন ঘর হোক, তখন যাবি।

বনো দশটা টাকা দিল গনোরিকে।—হাট থেকে চাল কিনে আন গনোরি। মাড়ভাত রান্না হোক, সবাই মিলে খাই। গ্রামে কিনিস না। মালিক জেনে যাবে।

—তা বটে। গ্রামে নিলে ওজনেও ঠকাবে।

বনো সকলের সঙ্গেই খেতে বসল। খাওয়া হয়ে গেল, সে তো

পাতা ছেড়ে ওঠে না। ও বনো, ওঠ। হাতের এঁটো যে শুকোল। কতক্ষণ বসে থাকবি?

বনো বলল, পিসির কি হবে?

—কি বলিস রে?

—এ একটা ভাবনার কথা।

—কি বলিস পাগলের মতো?

—আমি ঘর বাঁধব বলে টাকা নিলাম, তো কামিয়া বনে গেলাম। ধানোর সঙ্গে বিয়ে দেব গনোরির মেয়ে দৌলতির। ধানো সে বাবদে টাকা ধার নিল, সেও কামিয়া হল। দৌলতি ঘরবসত করতে আসবে, পাঁচজনকে খাওয়াব। ধানোর মা টাকা ধার নিল, সেও গিয়ে কামিয়া হল।

—কি বলছিস?

—ঠিকই বলছি। তাহলে দেখ, বাপ-মা-ছেলে সবাই মুনাবরের কামিয়া হয়ে গেল। পিসিকে তো কেউ দেখল না। ও যে মরে গেল। ওর যে দাহ হবে, কিরিয়া হবে, সে খরচ জোগাতে ও নিজে কি কামিয়া হয়ে যাবে? আর তো কেউ নেই ঘরে, যে কামিয়া বনে? আমি দেখতে পাচ্ছি যে পিসি মরে গেল, মরে গিয়ে মুনাবরের কামিয়া হল। জ্যান্ত লোকও ওর কামিয়া, মরা লোকও ওর কামিয়া।

বলতে বলতে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ভেঙে বনো অজ্ঞান হয়ে যায়। তখন সবাই ওর মাথায় অনেক জল ঢালল, ওর জ্ঞান ফেরাল। জ্ঞান ফিরতে বনো নিশ্বাস ফেলে গাছের নিচে শুয়ে পড়ল। আর কারো সঙ্গে কথা বলল না।

সেদিন রাতে গনোরি নাগেসিয়ার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। গনোরি দরজা খুলল।

—কে, বনো?

—হ্যাঁ, গনোরি।

—আয়, ঘরে আয়।

—না গনোরি।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

—আমি চলে যাচ্ছি।

—কোথায় ?

—তা জানি না। তবে ওর কামিয়ৌতি খাটব না। যেখানে হয় সেখানে চলে যাব।

—মালিক যদি ধরে ফেলে ?

—আমি তো রেলে চেপে পালাব।

—কোথায় ?

—তা জানি ? ধানবাদ, পাটনা, কত জায়গা আছে। কলকাতাও খুব ভারি শহর। সেখানে ছুয়াছুতি নেই। ধানবাদে থাকতাম যখন, তখন কলকাতার কথা অনেক শুনেছি।

—চলে যাবি ?

—হাঁ রে। তোর মেয়েটার সঙ্গে ধানোর বিয়ে দেব, খুব ইচ্ছে ছিল। সে আর হল না। এই দশটা টাকা বউকে দিবি। আমি পাঁচ টাকা নিয়ে চললাম। ঘরের ভিটের নিচে একটা পিতলের থাল পোঁতা আছে। ভুনেশ্বর চাচা যেন ওটা তুলে নেয়।

সেওরা গ্রাম থেকে সেই যে চলে গেল বনো, আর তো সে ফিরল না। সেওরা গ্রামে কত কি হয়ে গেল। মুনাবরের সাদা ঘোড়াটা মরে গেল। বাজে পোড়া সিধা গাছটা একদিন হঠাৎ উল্টে গেল। আর হঠাৎ করে গ্রামে এলো ভালুকওলা। মুনাবরের বাড়ির সামনেই নাচাল বটে, তবু সবাই তো দেখতে পেল।

মুনাবর বৃথাই দাপিয়ে বেড়াল বনোর খোঁজে। নাগেসিয়াদের সে খুবই জেরা করেছিল। নাগেসিয়ারা কোন খোঁজই দিতে পারে নি। গ্রামের লোকরা এ নিয়ে নিজেরা কোন কথা বলে নি তবে মুনাবরের ক্ষেতে গম কাটতে কাটতে ওরা এ-ওর দিকে তাকাত আর মনে করত, আমরা মালিকের হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারি নি। তা হোক, আমাদের মধ্যে একজন তো পেরেছে। বনো তো পালিয়ে গেছে।

মনে পড়লেই মেয়েরা গম কাটার গান ধরত,

গমের ক্ষেতে নেমেছে এক হলুদ পাখি

ও তার ঠোঁট দুটো তো লাল॥

ওদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঝরে পড়া গমের দানা কুড়াত। পাখির মতোই খুঁটে খুঁটে দানা তুলত।

মুনাবর বনোর পিসি, বউ আর ছেলেকে কোন কাজ দেয় নি। ওরাও একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। বনোর কাছ থেকে কোন খবর পেয়ে চলে গেল কি না, তা জানা গেল না। এমনি করেই সেওরা গ্রাম থেকে "বনো" নামটি ক্রমে মুছে গেল।

॥ ২ ॥

গনোরি নাগেসিয়া কেমন করে টেঁড়া নাগেসিয়া হয়ে গেল, তাই বলতে গিয়ে কত কথা এসে গেল। এ সব কথা তো বলতেই হবে। সেওরা গ্রামের পৃথিবীতে গনোরি যেমন সত্যি, বনোও তো তেমনই সত্যি।

বনো চলে যাবার পর মুনাবর তার কামিয়াদের বিষয়ে বড়ই নির্মম হয়ে ওঠে। নাগেসিয়া, দুসাদ, ঘাসি, সব জাতের কামিয়ারা একসঙ্গে হলে এ কথাই বলাবলি করত। মালিক মহাজন তো গ্রামে গ্রামে আছে। সবাই তো এমন নির্মম নয়। 'কামিয়া প্রথা এ জেলার মাটিতে বোনা আছে। ঘরে ঘরে কামিয়া। সব মালিক এমন নির্মম নয়। ভালো মালিক কেমন হয় তা কেউ দেখে নি। তবে শুনেছে যে ভালো মালিকও হয়।

এর মধ্যে সকলকে বেজায় চঞ্চল করে এসে পড়ে ১৯৬১ সালের লোকগণনা বা আদমসুমারি। মানুষকে গরু ভেড়ার মতো গণনা করলে কি কি সর্বনাশ হতে পারে, তা মোহন দুসাদ জানে। সাবা ঘাসের চাট্রি বোনা এ এলাকার মানুষদের একটা উপরি আয়ের পথ। চাট্রি

বুনতে বুনতে মোহন হঠাৎ কথা বলতে শুরু করল। মোহনের কথা বলার ভঙ্গিতে বেশ নিজস্বতা আছে। সব কথাই ও ঝগড়ার সুরে বলে। যেন অনেকক্ষণ ধরে ঝগড়া হচ্ছে ও কথায় কথা বাড়ছে। চাট্টি বুনতে বুনতে ও হঠাৎ ঝেঁঝে উঠল।

—মানুষ গোনা খুব অধর্ম।

—কেন ?

—মানুষ গুনলেই দেখবে আকাল এসে গেছে। আমার বাবার বাবা যে, তার সময়ে একবার আদমসুমারি হল। সে সময়ে জোর আকাল লেগে গেল। আর ঘরে ঘরে যত ছেলে জন্মাল, সব ছেলে হল বোবা আর কালা। হাঁ, আমি শুনেছি।

—তোর মাকে গুনেছিল ?

—মা তখন জন্মায় নি।

—তোর মা যদি জন্মে থাকত, তাকে যদি গুনে থাকত, তাহলে তুইও বোবা-কালা হয়ে জন্ম নিতিস। আমাদেরও এত কথা শুনতে হত না।

—হাসি-তামাশার কথা নয়। তোমরা ভাবছ সুমারি খুব সহজ ব্যাপার। তা নয়।

সেওরা গ্রামে সুমারি এক কঠিন ব্যাপারই হয়েছিল। সরকারী লোকজন খুব নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। নাগেসিয়া, দুসাদ, ধোবি, গঞ্জু, এরা প্রথমে তো মুখও খোলে না, কথাও বলে না। তারপর মুখ যখন খুলল, তখন তাদেরকে থামানো মুশকিল।

—এ কেমন কথা ? যে ছেলেরা মরে গেছে, তাদের নাম লেখা হবে না ? মরুক আর যাহোক, তারা তো আমারই ছেলে। সরকারের খাতায় তাদের নাম থাকবে না ?

—আরে বাবুসাহেব! আমার মামার নামটা আগে লেখো। আমার ছাগল চুরি করে মামা গিয়ে বসে আছে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। তোমরা সরকারী লোক, তোমরা লিখলে আমি ঠিক ফেরত পেয়ে যাব।

—আমার বয়স লিখবে? লেখ লেখ, দশ হবে, বা 'বিশ হবে। কি বলছ? আমার নাতিনাতনি হয়ে গেছে, বয়স অত কম হতে পারে না? নাতিনাতনি হয়ে গেলে মানুষের বয়স কত হয়? পঞ্চাশ, ষাট? না না, ষাট বছর বয়স কি আমার হতে পারে? আমরা শুনেছি যে আমাদের মালিক পরোয়ারের বয়সই পঞ্চাশ। আমি জাতে ঘাসি, তায় গরিব। আমার বয়সটা কেমন করে তার চেয়ে বেশি হবে? মালিকের জমি-জেরাত, টাকা-পয়সা, সব আমার চেয়ে বেশি। বয়স কেমন করে আমার চেয়ে কম হবে? না বাবু, তুমি দশ কি বিশ লিখে নাও।

১৯৬১তে আদমসুমারি এমনি করেই হল।

১৯৬২ সালে এসে গেল ভোট। কি ভোট, কেন ভোট, সে সব কথা সেওরা গ্রামের লোকরা কি জানে তা বল। মুনাবর যাকে ভোট দিতে বলবে, ওরা তাকেই ভোট দেবে। ভোট বা চুনাওয়ের মতলব কি, তা তো ওরা জানে না। তবে মুনাবর সিং রাজপুত, জয়বন্ত সিংও রাজপুত। মুনাবর বলেছে যে ওর জাতভাইকে ভোট দিতে হবে। তাহলে ওরা তাই করবে। মালিকের কথায় তো 'না' বলা যায় না।

মুনাবর চন্দেলা ভোটের আগেই বিরোধী প্রার্থীদের বলল, এত তকলিফ কেন উঠাচ্ছেন? আমরা যাকে ভোট দিতে বলব ওরা তাকেই ভোট দেবে। আমরা যাদের ভোট দিতে বলব, ওরা তাদের ভোট দেবে। জয়বন্ত সিং আমাদের প্রার্থী, এবারে তাকেই সকলে ভোট দেবে। আপনারা কি কারণে এত দম খরচ করছেন? বক্তৃতা দিচ্ছেন, ওরা আসছে, এ তো তামাশা দেখতে আসছে।

জয়বন্ত সিংও মুনাবরের ওপর নির্ভর করে থাকে। বলে, ভোট কি ওরা দেবে?

—কেন দেবে না?

—কে জানে কি করবে। মাথা পিছু এক এক টাকা দেব? তুমি যা বল।

—ভৈয়া, এক টাকা তো ওরাও দিচ্ছে।

—পুরী-কচৌরি খাইয়ে দেব ?

—সে বরং ভালো।

এর অনেক পরে চুনাও ব্যাপারে বন্দুক আর মস্তান ঢুকে যায়। ১৯৬২-তে ছবি অনেক পরিষ্কার ছিল। জয়বন্ত সিং মুনাবরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকে। টাকা তো তাকে খরচ করতেই হয়। সব টাকাই সে মুনাবরকে দেয় এবং মুনাবর সকলকে বলে দেয়, জয়বন্তের নিশানীতে ছাপ লাগাবি, নইলে খুব খারাপ হয়ে যাবে সব।

এত কথার পরেও ভোট দেবার দিনে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। এটা যেন মেলা বা পরব। সবাই হইচই করে দল বেঁধে ভোট দিতে যায়। কিন্তু ভোটকেন্দ্রের চেহারাটি ওদের কাছে বড়ই সংশয়জনক ঠেকে।

সবজান্তা মোহন দুসাদ কানাকানি ফুশফুশ আরম্ভ করে। এ কেমন ব্যাপার, যে একেকজনকে একটা খালি খুপরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? ভোট অফিসার যতই বোঝাক, ছাপটা কাগজে দেব, না নিজের হাতে ? কিছুতেই বুঝতে পারে না ভুনেশ্বর। অফিসার চেঁচিয়ে তাকে ধমক মারে। ফলে মোহন দুসাদ বলে, এখন পালাও সবাই। এখন মারপিট হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সবাই পড়িমরি করে দৌড় মারে। প্রার্থীদের প্রতিনিধিরা ভোটদাতাদের ধরতে ছোটে। পুলিস দৌড়য় তাদের সাহায্য করতে। পুলিস দৌড়য় যখন, তখন হাঁপাতে হাঁপাতে মোহন দুসাদ বলে, সরকারের মতলব খুব খারাপ।

এভাবেই সগৌরবে শেষ হয়ে যায় তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। চুনাও হয়ে গেলে জয়বন্ত সিং আগামী পাঁচ বছরের মতো নিশ্চিন্ত হয় ও নির্বাচনকেন্দ্র থেকে উধাও হয়। মুনাবরের কাছারির সামনের বেলগাছটার গোড়া ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। গাছটি হঠাৎ হুড়মুড় করে ঝড়ে ভেঙে পড়ে। তাতে কথা রটে যায়, যে বরমপিচাস এতদিন বেলগাছে থাকতেন, তিনি রেগে চলে গেলেন। সবাই

ভাবছিল ওটা চৈতালি ঝড়। ঝড় নয়। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে বরম-পিচাশ চলে গেলেন।

বেলগাছটি পড়ে যাবার পর মুনাবরের মন খুব কাতর হয়। এবারে হয়তো গ্রামে কলেরা বা বসন্ত হবে। সে একটা প্রায়শ্চিত্ত পূজার আয়োজন করে। জনৈক শিক্ষিত সাধু পুরোহিত হয়ে আসেন। তিনি সকলকে বলেন, যে গৌমাতা পূজা করতে হবে আর হিন্দুধর্ম রক্ষাকল্পে সংঘবদ্ধ হতে হবে।

এ সব কারণে সেওরা গ্রাম খুব চঞ্চল থাকে। এমন সময়েই গনোরি নাগেসিয়ার অসাবধানতায় মুনাবরের হালিয়াতি বলদ বাঘের পেটে চলে যায়। এখনো সব জঙ্গল কাটা পড়ে নি। এখনো চিতাবাঘ আসে। মৌয়ার নেশায় গনোরি সন্ধ্যায় বলদটি আনতে ভুলে গিয়েছিল ক্ষেত থেকে। ক্ষেতের অনেক ওপারে জঙ্গল। বলদটি স্বাধীনচেতা। সম্ভবত সে চাঁদ দেখতে যাচ্ছিল। নইলে জঙ্গল পানে যাবার কথা তো নয়।

পবিত্র বেলগাছের পতন। তারপরেই হালিয়াতি বলদের অকাল-মৃত্যু। মুনাবর ক্ষেপে যায় ভীষণ। বলদ গেল তো তুই বোঝাই কর গাড়ি। নে কাঁধে জোয়াল, উঠা, উঠা। টান গাড়ি। একটা বলদের দাম কত তা জানিস? চাবুক মেরে তোকে সিধা করে দেব।

দৃশ্যটি খুব মনোরম। বড় অফিসারের বাপ, এলাকার বড় জমি-মালিক মুনাবর সিং চন্দেলা গাড়ির জোয়াল মানুষের কাঁধে জুতে গাল পাড়ছে, চাবুক নাচাচ্ছে বাতাসে। গনোরি গাড়িটি কাঁধের জোরে তুলতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। ওর ওপর জোয়ালটা চেপে বসে।

এগারো মাইল দূরে তোহরির হাসপাতাল। সেখানেই গনোরিকে নিয়ে যায় ভুনেশ্বররা খাটুলি চাপিয়ে। তিন মাস বাদে শরীরটা বেঁকে-চুরে যখন ফিরে আসে গনোরি, তখন থেকেই ও টেঁড়া নাগেসিয়া। কোমরটা ঝুঁকে গেছে, ডান পা লেংচে চলতে হয়। তোহরির হাসপাতালে এর চেয়ে ভালো মেরামতি আশা করা যায় না।

মাথাটাই কি ঠিক আছে? নিজের ছোট মেয়ে দৌলতিকে দেখে বলল, এ মেয়েটা কে?

বউ বলল, হায় রাম! ও যে দৌলতি।

—তাই বল। ছাগলটা কোথায়?

—বেচে দিলাম।

—নিজে বেচলি না কালিয়ার মা বেচল?

—নিজেই বেচলাম। নাও, বিড়ি নাও। বেশ কম্বলটা গায়ে দিয়েছ। হাসপাতাল থেকে কম্বলটা দিল?

—না না, বনো কিনে দিয়েছে।

—বনো? কোন্ বনো?

—বনো তো একজনই। বনো নাগেসিয়া।

—তাকে পেলে কোথায়?

—সে এসেছিল। আরে সেওরাতে যদি মানুষের মতো মানুষ থাকে, তবে সে বনো। আমরা সবাই জানোয়ার। ভালো হয়েছে যে মালিক আমাকে মেরে টেড়া করে দিয়েছে। জানোয়ারকে মারবে না তো কি করবে? বনো হল মানুষ, আর আমরা সবাই জানোয়ার, এই হল কথা।

—চুপ, চুপ, কে শুনবে।

—'কে শুনবে' আবার কি? এ সব কথা সবাই জানে।

—ওকে পেলে কোথায়?

—আরে হাসপাতালে আমাকে তো ঢুকাল। বাইরে বসে ভুনেশ্বর, ঝারি মুনার, জাকন, খুব জটলা করছে। ওরা ভাবছে যে আমি মরেই যাব। হাসপাতালের বাইরে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার চা খাচ্ছে। কি তাজ্জব বাত! সেই লরি থেকে নেমে এলো কে? আমাদের বনো।

—হায় বাবা মহাবীর। এ কি তাজ্জব কথা!

—আমরা তো ধরে নিয়েছিলাম সে শালা মরেই গেছে। না না, সে শালা মরে নি। ভুনেশ্বরদের শুধাল, তোরা এখানে সবাই মিলে

কি করছিস ? তোরা তো মুনাবর চন্দেলার কামিয়া, এখানে কেন রে ? সে কি কায়দা করে কথা বলছে।

—চেহারা কেমন দেখলে ?

—অন্য রকম। গায়ে লাল নীল জামা, মাথায় একটা ফেটি, আর গলায় ঝুলছে ঢোলক।

—কেন গো ?

—দূরে দূরে হাটে গঞ্জেও ঘোরে, ঢোলক বাজিয়ে লোক জমা করে, কিস্‌সা কহানি বলে গান গেয়ে গেয়ে। ভাবলে পরে অবাক হয়ে যাই যে কিস্‌সা বা শিখল কোথায়, গান বা শিখল কোথায় ? লরিতে চেপে বসে লরি পেলে।

—সত্যিই তাজ্জব কথা।

—সেওরা থেকে বেরিয়ে ও খুব ঘুরেছে এখানে ওখানে। আকালের সময়ে রামগড় গিয়েছিল। তখন কে ওকে ওই জামাটা দিয়েছে।

—স্বচক্ষে দেখলে ?

—নিশ্চয়।

—আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

—আমারই কি বিশ্বাস হয়েছিল ? হাসপাতালে চোখ খুলে দেখলাম যে বনো দাঁড়িয়ে আছে। তখন ভাবলাম, হায় বাবা ! নিশ্চয় বনো মরে গেছে, আমিও মরে গেছি। কেউ ওর গতিগঙ্গা করে নি বলে ও পিরেত পিশাচ হয়ে ঘুরছে, আর আমাকে নিতে এসেছে। কিন্তু ও আমাকে বলল, শালা কামিয়া ! জানোয়ারের বদলে তোকে জুতে দিল আর তুইও গাড়ি টানলি ? এ কথা শুনে বুঝলাম যে এ আমাদের বনোই বটে।

—ওর বউ, ধানো, পিসি ?

—সবাই বোরোতোতে পুকুর কাটছে।

—কি, বনো পুকুর কাটাচ্ছে ?

—শহরের বাবুদের মতো নেকা কথা বলিস না দৌলতির মা।

বোরোতোতে আছে বহোত বড় মিশন। মিশনের ফাদার আকালের পর একটা মস্ত পুকুর কাটাচ্ছে। বনোর বউরা মাটি কাটা কাজ করছে। বনো ঘুরে বেড়াচ্ছে হাটে বাজারে। বেশ করেছে। ও দুনিয়া দেখেছে। ওব সাহস কত। আমাদের মতো জানোয়ার তো নয়।

—এ কম্বলটা সে দিল ?

—বনো দিল। একদিন হাসপাতালে এসে দিয়ে গেল। বলল, মিশন থেকে আমায় দিয়েছিল, আমি তোকে দিলাম। বেচে দিবি না, গায়ে দিবি।

—বেশ কম্বল। শীত মানবে খুব।

—দৌলতির পবনে ভালো কাপড় দেখলাম ?

—সব বলব।

—কি বলবি বউ ?

টেড়ার গলা শুকিয়ে আসে। কি বলবে বউ ? কি শুনবে সে ? সে যখন ঘরে নেই, তার মেয়ে দৌলতির পরনে ভালো কাপড় আসে কোথা থেকে ? বাপকে মেরে ধরে হাসপাতালে পাঠাল। মেয়েকে কি তুলে নিয়ে গেল মালিক পবোয়ার ? এমন কাজ তো মুনাবর কখনো কবে না ? তার লালচ তো বয়স্কা স্ত্রীলোকে। মুকামী দুসাদিন আর রাজবি ধোবিনেব ঘরে মুনাবরের ছেলেরা জন্মায়। সে ছেলেরাও মুনাবরেব কামিয়া। দৌলতিকে দেখে মুনাবরের মাথা কি ঘুরে গেল ?

দৌলতিব মা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল। কি আর বলব বল ! তোমার জীবনের আশা নেই. আমি তো পাগল পাগল। মেয়েকে নিয়ে টাহাড় গেলাম।

—কেন ?

—মিশ্রজী দেওতা বরাস্তোন। তাঁর কাছে পরসাদী ফুল আর বেলপাতা নেব।

—সেখানে কি হল ?

—সেখানে বসেছিল আরেক দেওতা। মিশ্রজীর কেউ হবেন।

খুব হট্টাকট্টা জোয়ান চেহারা। তিন ছেলের বাপ। দৌলতিকে দেখে তার মনে খুব দয়া উঠে গেল। তোমার কি হয়েছে, কেমন করে কি হল, সব তো শুধাতে লাগল। সে কত কথা কি বলি!

—তুই কিছু বলিস নি তো?

—না না, তাই বলি? মুনাবব সিং সব সময়ে মিশ্রজীর কাছে যায়। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোলে মালিক তো সব জেনে যাবে।

—সেই তো কথা।

—কিন্তু সে দেওতা তো দৌলতিকে এত এত পুরী কচৌরি খাওয়াল, স—ব কথা জেনে নিল। যত শোনে তত মাথা নাড়ে, চুক চুক শব্দ করে, আর বলে, কি আফশোস, কি দুঃখের কথা।

—হায় রাম! দৌলতি সব বলে দিল?

—সব বলে দিল। তখন দেওতা আমাকে এক সের আটা কিনে দিল। আমি আটা আঁচলে বেঁধে বাড়ি চলে এলাম। খুব খেলাম দুটো দিন।

—বেশ করলি। তারপর কি হল?

—সে ধর আজ এক মাসের কথা। তারপর ভুনেশ্বরের সঙ্গে দৌলতি যাচ্ছিল সাবাই ঘাস আনতে। সেখানেও সেই দেওতা। ওদের দেখল।

—হায় রাম!

—ভুনেশ্বরের সঙ্গে কথা বলছিল আর দৌলতিকে দেখছিল। দৌলতি তো দৌড়ে দৌড়ে ঘরে চলে এলো। সেই দেওতা দৌলতির নাম করে এই কাপড়টা ভুনেশ্বরকে দিল। বলল, ওকে দিও। মেয়েটাকে দেখে মনে দুঃখ উঠে যাচ্ছে।

—দিল তো দিল। দৌলতি সে কাপড় পরল কেন?

—সব সময়ে টুটাফাটা কাপড় পরে। নতুন কাপড় পেলে আর ধৈর্য ধরে, না মন মানে?

—কেন তাকে সব কথা বলল দৌলতি? বয়েসটা কি ওর কম হল? বিয়ে হলে ছেলের মা হত। মনিবের কথা যে বলে দিল,

এ সব কথা মনিবের কানেও যাবে আর মনিব আমার চামড়া তুলবে।

—দেওতা লোক! ভয়ের চোটে বলে দিল।

—খুব দোষ করেছে।

—মনিব তোমার খোঁজ করছিল।

—যাব, ঠিকই যাব।

বিকেলে টেঁড়ার ঘরে ভুনেশ্বর, মোহন, মুনার, জাকম আর ঝারি এলো। তাদের মনে খুব কৌতূহল। গনোরি নাগেসিয়া মুনাবরের গাড়ি টানতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। শরীর বেঁকেচুরে ও টেঁড়া হয়ে গেল। এ জীবনে ও আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ওর দুর্ভাগ্যে সকলেই খুব দুঃখিত।

আবার এও তো সত্যি কথা, যে তোহরির মতো গঞ্জ জায়গায় হাসপাতালে থেকে এসেছে ও। সেখানে বিজলি বাতি জ্বলে। বাস চলে, ট্রেন দাঁড়ায়, হপ্তায় তিনবার হাট বসে, তাঁবুতে সার্কাস হয়। সিনেমাও মাঝে মধ্যে দেখানো হয়। তোহরি একটা ছোট খাট শহর। সেওরার মতো মুনাবরের সাম্রাজ্য নয়। তেমন জায়গায় থেকে এসেছে গনোরি, এটা কি কম কথা?

সকলে এসে পড়েছে। টেঁড়া নিজেকে খুব সম্মানিত বোধ করল। তারপরই তার চোখে জল এলো।

—লাঠি ছাড়া আর তো চলতে পারব না।

—হাঁ হাঁ, তা তো ঠিকই।

—কাজই কি ঠিকমত করতে পারব?

—কিছু কিছু পারবি।

—কপালে কি আছে?

—ভৈয়া, কপাল কপাল বোল না। যেমন চোট লেগেছিল মরে যাবার কথা।

—মরে গেলে ভালো হত।

—ছাড়ো তো ও সব কথা। এখন বল যে খাটে শোয়াল, সেই খাটে রেখেছিল, না মাটিতে নামিয়ে দিয়েছিল?

—খাটেই থাকতাম। বেশ গদি বালিশ, আর রাত হলে মশারিও টানিয়ে দিত।

—চলতে তো পারতিস না। সকালে মাঠে যেতিস কেমন করে? ওরা কি হাতে দাঁতন দিত, লোটা দিত, নিয়ে যেত?

এ কথায় টেঁড়ার মুখটি বিমর্ষ হয়। বড় দুঃখে সে মাথা নাড়ে। না না, মাঠে কেন যাবে? ঘরের সঙ্গে লাগাও পায়খানা, সেখানেও তো আগে যেতে পারে নি। মালিক মহাজনের ঘরে যেমন বাসন-বর্তন থাকে, তেমনি ঝকঝকে বাসন-বর্তনে তাকে পায়খানা আর পেচ্ছাপ করাতো। এর চেয়ে আশ্চর্য কথা কে কবে শুনেছে? বাসন-বর্তনে পেচ্ছাপ কর, পায়খানা কর? যেমন বাসন-বর্তনে জীবনে খেতে পাবে না, তেমন দামী জিনিসে ওই সব কাজ করতে হত তাকে, এ দুঃখটি মনে থাকবে।

—খেতে দিত পেট ভরে?

—হাঁ হাঁ, কেন দেবে না? ভাত দিত, ডাল দিত, তরকারী দিত, চা-পানি, আটার রুটি, ডবল রুটি, দুধ।

—ভালোই ছিলি তাহলে?

—ভালোই ছিলাম।

—হাসপাতাল জায়গা ভালো?

—তা ভালো। তবে একটা কষ্ট আছে। বিড়িও খেতে দেবে না, আর মেঝের ওপর কাশ থুথু ফেলতে মানা।

—সব সুখ কি হয় রে বাবা?

—এখন তোদের কথা বল।

—আমাদেরও কথা আছে।

—কি কথা?

—ভুনেশ্বর চাচা বলুক!

ভুনেশ্বর গুছিয়ে কথা বলতে খুব ভালোবাসে। এখন টেঁড়াকে অবাক করে সে একটা রূপকথা বলল। এই রূপকথা ফুরালে ঘুঁটেকুড়ানি রাজরাণী হয় না, রাখাল ছেলে রাজা হয় না। কিন্তু

১৯৬২ সালে পলামু জেলার তোহরি থানার সেওরা গ্রামে এ ঘটনা যেন রূপকথাই বটে।

টাহাড়ের শিবমন্দিরের পূজারী হনুমান মিশ্র খুব নামী-দামী মানুষ। তাঁর আত্মীয় এক দয়ালু দেবতা। দৌলতিকে দেখে তার খুব দয়া হয়েছিল। পুরী কচৌরি খাওয়াতে দৌলতিও তাকে সব কথা বলে দিয়েছিল। মুনাবর চন্দেলার কথা শুনে সেই দেওতা বারবার বলেছিল যে, ওঃ! উঁচা জাত কতদিন হরিজন আর আদিবাসীর উপর অত্যাচার চালাবে? এই অধর্মরাজ শেষ হবে কবে? সেই দেওতাই ভুনেশ্বরের হাতে দৌলতির জন্যে একটা নতুন কাপড় পাঠিয়েছিল। খুব ভালো কাপড়, পাকা রং, দশ হাত লম্বা। দাম তো দশ পনেরো টাকা হবে।

মুনাবরের ছেলে জিলা লাক্ষা উন্নয়ন কর্পোরেশনে বড় অফিসার। এমন কৌশল করে নিয়েছে, যে নিজের মকানেই থাকে, আবার সরকারের পকেট কেটে বাড়ি ভাড়াও নেয়। দিল্লীর গান্ধী মিশনের এক বড় সাধু পলামুতে এলেন। তাঁকে নিয়ে মুনাবরের ছেলে টাহাড়ে এলো। সে সময়ে সেই দয়ালু দেবতা সেখানে বসে ছিলেন।

—মুনাবরের ছেলে কমলজিত চন্দেলা?

—হাঁ হাঁ, আর কে?

—টাহাড়ে কোথায় এলো?

—হনুমানজীর মন্দিরে।

—তারপর কি হল?

—দিল্লীর সাধুজী বললেন, গান্ধী মিশন পলামুতে কেন্দ্র স্থাপন করবে। হরিজন আদিবাসীর উপর অত্যাচার একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। সে কাজে টাহাড়ের হনুমানজীকে সাহায্য করতে হবে।

—এ যে তাজ্জব কথা ভুনেশ্বর চাচা?

—আরে শোন্ না মন দিয়ে। সে দয়ালু দেবতা তো কমলজিত সিংকে চিনতে পারে নি। সে দিল্লীর সাধুজীকে বলল, এ সব বাতকে বাত হচ্ছে, কাজের কাজ হবে না। এই যে পলামু, এ হল ভয়ানক

অত্যাচারের জায়গা। এখানে সব ব্রাহ্মণরা ভালো আর সব রাজপুতরা বদমাশ। খুবই বদমাশ।

—এ কথা বলল কমলজিতের সামনে ?

—নয়তো কি ? কমলজিত বলল, জাতপাতের কথা তুলবেন না দেওতা। দেওতা বলল, কেন তুলব না ? সেওরা গ্রামের মুনাবর সিং চন্দেলা তার কামিয়া গনোরি নাগেসিয়াকে দিয়ে গরুর গাড়ি টানাচ্ছিল। লোকটা জোর জখম হয়েছে, হাসপাতালে পড়ে আছে। মুনাবর এমন পিশাচ যে গনোরির বউ আর মেয়ে কি খাবে সে ব্যবস্থা করে নি।

—কমলজিত কি বলল ?

—সে তো খুব চটে গেল। বলল, যা শোনা যায় তা সত্যি নয়, ছোটজাতের লোকরা উঁচা জাতের লোকের নামে মিছে কথা বলেই থাকে।

—মিছে কথা ?

—আরে, টাহাড়ের মন্দিরের যত দোকানিয়া লোক, তারাই বলল, না না, এ কথা খুব সত্যি। হাসপাতালে গনোরি নাগেসিয়া পড়ে আছে, দেখে আসুন।

—ওরা হাসপাতালে আসে নি তো ?

—না না। তখন লড়াই বাধল দিল্লীর সাধুজী আর টাহাড়ের হনুমানজীর মধ্যে। আমি ভিড়ের মধ্যে ছিলাম। তোকে দেখতে যেতাম তো, মন্দিরে যেয়ে বসতাম উঠানে। বসে বসে তামাশাটা দেখলাম।

সব দেখেছিল ভুনেশ্বর আর সব কথাই ও হাত নেড়ে নেড়ে টেঁড়াকে বলল। সে এক রূপকথাই বটে।

দিল্লীর সাধু বললেন, আমি সেওরাতে যাব। স্বচক্ষে দেখব যে উঁচাজাতের মালিক মহাজন হরিজন আদিবাসী কামিয়ার উপর অত্যাচার করে কি না।

হনুমানজী বললেন, ও সব আপনাদের শহরিয়া কায়দা। সেওরা

গেলে তো মুনাবর চন্দেলার ঘরেই থাকবেন, সেখানে ভোজন সেবা হবে, আর গরিবের দুঃখ দেখবেন। এমন সাধুজী আমি অনেক দেখেছি।

—আমি তেমন সাধু নই।

—থাকবেন কোথায়?

—সেওরা গিয়ে হরিজন টৌলিতে থাকব। ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমি ওই মালিক আর ওই কামিয়াদের নিয়ে উপাসনায় বসব। সাতদিন রামজীর নামগান হবে। রাম নামে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। গান্ধীজি তো শেষ অবধি রামনাম বলেছেন।

—গান্ধীজী সত্যিই মহাত্মা ছিলেন, হরিজন নামও তিনিই দিয়েছিলেন। এদের ভালোর জন্যে তাঁর চিন্তাও ছিল। কিন্তু তাঁর কাজকর্ম সব ভুল ছিল।

—কৈসে?

ম্লেচ্ছ দেশ বিলেত গিয়েছিলেন, আর কাফ্রি দেশে গিয়ে বুয়র লড়াই কালে বেজাতের মড়াও বয়ে নিয়েছিলেন। এমন কাজ কেউ করে?

—এ সব কি ভুল?

—জরুর ভুল। এই সব ভুল করেছেন বলে তো অপঘাতে মরলেন। বুড়ো বয়সে ঘর মকান থাকবে, বেটার কামাই খাবেন, বউয়ের সেবা নেবেন, কিছুই তো হল না। শেষে অপঘাতে মরে গেলেন।

—এ আপনি ঠিক বলছেন না। তিনি জাতপাত ভেদাভেদ তুলে দিতে চেয়েছিলেন।

—জাতপাত ভেদাভেদ তো নিয়ম! রামরঘুবরের নাম করছেন, তিনি কি শম্বুককে মারেন নি? শম্বুক ছিল শূদ্র। তাকে তো মারলেন। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ছুয়াছুত—সব ভগবানের নিয়ম। আপনি উপাসনা করুন, রামনাম করুন, তাতে মালিক—কামিয়া—জাতিভেদ—বর্ণভেদ, কিছু পালটাবে না। সব যেমন ছিল তেমন থাকবে। দিল্লীর নিয়ম পলামুক্তে চলবে না।

—তবে কি করতে হবে ?

—এই অছুত আদিবাসী লোক বহোত পাপী। আমার মন্দিরে খরচ দিয়ে ধুমধাম করে প্রায়শ্চিত্ত পূজা লাগান, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কেমন করে ?

—আরে প্রথমে সোর উঠাতে হবে যে সেওরা গ্রামের কামিয়ারা মহাপাপী আর তাদের পাপের কারণেই মহাপাপ ঘটে যাচ্ছে।

—তাও কি হয় ?

—কেন হবে না, আমার ওপর ভরসা রাখুন. সব হয়ে যাবে। সেওরাতে যদি প্রায়শ্চিত্ত পূজা লাগাই, তাহলে তো মুনাবর চন্দেলা চাঁদাও ওঠাবে, নিজেও টাকা দেবে। অছুতরা ঠিক্ চাল আর গুড় জোগাবে, আহীব লোকরা দুধ, ঘি দেবে।

—এ তো গরিবের ওপর অত্যাচার।

—অছুতদের কোমর ভেঙে যাবে। ওরা আর মালিককে 'তুমি জুলমি আদমি' বলবে না। মুখ বুজে সয়ে যাবে সব। বলবান জুলুম করে, দুর্বল সহ্য করে, এটাই তো নিয়ম। আপনি কি সেই চালু নিয়ম উলটে দিতে চাইছেন ?

এ কথা শুনে দিল্লীওয়ালা সাধুজী কানে হাত চাপা দিলেন। তারপর মুনাবরের ছেলে সেই সাধুজীকে নিয়ে সেওরা গ্রামে চলে এলো। দিল্লীর সাধুজীর যেমন কথা তেমন কাজ। সাতদিন তিনি রাজবী ধোবিনের উঠানে বাস করলেন। উঠানে চাঁদোয়া খাটানো হল।

শুনতে শুনতে টেড়া বলল, জবর তামাশা হয়ে গেল গ্রামে, আহা, আমি দেখতে পেলাম না কিছু।

ঝারি বলল, সব তো তোমার জন্যেই হল ভৈয়া। তুমি যদি মুনাবরের বলদ বনে গাড়ি না টানতে, তাহলে জখম হতে না। জখম হলে, হাসপাতালে গেলে বলেই কথাটা ছড়াল। তাতেই সব কথা শুনে দিল্লীর সাধুজী এসে সেওরা গ্রামে বসল।

তা সেই চাঁদোয়ার নিচে সাতদিন ধরে রামনাম গান হল।

সাধুজী গান করতেন, চরকায় সুতো কাটতেন, আর সকলকে ভালো ভালো কথা বোঝাতেন। তোমরা কেউ অছুত নও। তুমি, আমি, মুনাবর চন্দেলা, সব এক মায়েব সন্তান।

এ সব কথা শুনে রাজবী ধোবিন বলল, তা কি করে হবে সাধুজী ?

—কেন, কি হল ?

—আমরা সব এক মায়ের সন্তান ?

—হঁা বহিনজী, ঠিক ঠিক।

—না সাধুজী, বেঠিক বেঠিক।

—কেন ?

—এক মায়ের সন্তান হলে আমরা সবাই তো ভাই বোন হব, তাই নয় ?

—তাই হবে।

—কিন্তু মুনাবর তো সে কথা জানে না। আমার ঘরেও মুনাবরের ছেলে, মুকামী দুসাদিনের ঘরেও মুনাবরের ছেলে, আর সে সব ছেলেরা ওরই কামিয়া। এ কেমন কথা তাই বল ?

—সে মাতা নয় বহিনজী, ভারতমাতা।

—সে আবার কে ?

—আমাদের দেশ, ভারতবর্ষ।

—এটা আমাদের দেশ ?

—নিশ্চয়।

—ও সাধুজী, আমাদের ঘর তো সেওরা গ্রাম। দেশ কাকে বল ? তশীল জানি, থানা জানি, দেশ তো জানি না। দেশ তো ভারত নয়।

—আরে, তোমরা সবাই স্বাধীন ভারতবর্ষের আজাদী মানুষ, বুঝেছ ?

—না সাধুজী।

ভুনেশ্বররা এ ওর দিকে তাকায় আর চুপ করে যায়। ঝারি

রাজবীকে বলে, বয়স গেল, বুড়ো হলে, এখন ন্যাকা সেজেছ। সাধুজী যা বলছে সব শুনে যাও। ওরা কোন দিন আমাদের কথা বুঝবে না, আমরাও কোন দিন ওদের কথা বুঝব না।

সাতদিন ধরে নামগান চলল। আর সাধুজীর খরচে সেওরা গ্রামের সবাই সাতদিন ধরে পেট ভরে খিচুড়ি খেল।

ওদিকে মুনাবরের ছেলে বাপকে অনেক কথাই বোঝাল।

—বাবা! তুমি যে কামিয়াদের বেলা এখনো পুরনো নিয়ম চালাচ্ছ, এ তো ভালো করছ না।

—তা তো বলবেই। তুমি সরকারী অফসর, আমি হলাম ভৈঁসাল গৃহস্থ।

—আরে এ লোকটা দিল্লী থেকে এসেছে। তোমার নাম করে আমার নাম করে কাগজে যদি খবর বেরোয় তাহলে তো খুব বদনাম হবে।

—কেমন করে?

—আরে পাটনার কাগজে খবর বেরোবে যে অফিসারের বাপ কামিয়ার উপর জুলুম করে। এ নিয়ে কোন বদমাশ যদি বিধান-সভায় কথা তোলে, তাহলে খুব হইচই হবে। সবচেয়ে বিপদ মিশনের ফাদার বমফুলারকে নিয়ে। সে কামিয়াদের খবর নিচ্ছে, জেলায় ঘুরছে, বুঝেছ? কিছুই তো বোঝ না।

মুনাবর তার সরকারী অফিসার ছেলেকে খাতির করে, নরম গলায় কথা বলে।

—বেটা, বমফুলার কে?

—মিশনের ফাদার।

—তাতে আমার কী?

—কেমন করে বোঝাই? সে যদি কোন রিপোর্ট করে, তাহলে সেটাকে সবাই মানবে।

—দেখো! জমিজমা চিরকালের। অফসরিও নোকরি। আমি কোন দিন নোকরি করলাম না। তুমি যে অফসর হলে, তাতে কী

ভালোটা আছ? তোমার মা যখন লোটা নিয়ে মাঠে যায়, সঙ্গে দুটো দাই থাকে. তবে তাকে টেনে তোলে, সে এতই মোটা। তোমার বউটা রোগা পাতলা, যেন বাতাসেব আগে উড়ছে।

—বাবা, এগুলো কি কাজের কথা?

—আমি এখনো পাঁচ সের দুধ খাই, হজমও করি। তুমি তো এক সের দুধও খেতে পাবো না। যাক গে, মামাবাড়ি থেকে লেখাপড়া শিখেছ, দেশঘরের কানুন ভুলেছ। বাপ একটা কামিয়াকে কি করেছে, সেই কারণে দিল্লীর সাধুজীকে গ্রামে ঢুকালে। বেটা! পছিয়াঁ বাতাস ঘরে ঢুকাতে নেই। পছিয়াঁ বাতাস এলে ঘরের জানলা বন্ধ রাখতে হয়।

—তুমি বুঝবে না।

মুনাবর মাথা নাড়তে থাকল। পছিয়াঁ বাতাস উঠলে ঘরেব জানলা বন্ধ রাখতে হয়। নইলে খড়কুটো ঢুকে সব বিশৃঙ্খল করে ফেলে। কমলজিত কেমন করে তা বুঝবে?

—দেখো বেটা! তুমি যখন ছোট শিশু, তখন ভারত স্বাধীন হয় নি। জঙ্গলমহালে আবাদ করাতাম আর আদিবাসীদের নুন দিয়ে মজুরি দিতাম। তখন আমি রাঁচি জেলায়। টাউনে থাকতাম, মহালে যেতাম। তো থানা সিপাই এসে দুধরাম মিশ্রকে অন্তরীণ করে রেখে গেল। দুধের ছেলে, মায়ের দুলার, সে গিয়েছিল অংরেজেব সঙ্গে লড়াই করতে।

—এ সব কথা তো শুনেছি।

—আবারও শোনো। সে গ্রামে এলো, তো পছিয়াঁ বাতাস ঢুকিয়ে দিল গ্রামে! বাতাসে যেমন খড়কুটা আসে, তেমনি করে সর্বনাশা সব চিন্তা বাতাসে চলে এল ভেসে।

—জঙ্গলমহালে পছিয়াঁ ঢুকে গেল?

—নিশ্চয়। আদিবাসীরাও সত্যাগ্রহ শুরু করল। লবণ মজুরি চলবে না, পয়সা দাও। যে জমি আবাদ করছি, ফলফসলের ভাগ দাও। তা নিয়ে বহোত হাঙ্গামা হয়েছিল, আমার খুব মনে আছে।

সে কি পছিয়াঁ রে বাবা! আদিবাসীদের দমন করতে অনেক দিন লেগেছিল এ গ্রামে বনো নাগেসিয়াও পছিয়াঁ হয়ে এসেছিল, বেরিয়ে গেছে তো গ্রাম এখন শান্ত। তুমি আমার ছেলে হয়ে গ্রামে ঢুকালে পছিয়াঁ। এখন আবার কি হয় তাই দেখ। বাঁধা নিয়ম চলাই ভালো। গরনিয়ম ভালো নয়।

—কি হবে বাবা? সাধুজী সাতদিন থাকল, রামনাম গান কবুল। তুমিও মদত দিলে, আমিও মদত দিলাম। এখন আর কোন ঝামেলা হবে না।

টেড়া সব কথা খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল, সবই তো শুনলাম রে ভাই। তাতে আমার কোন্ আসানি তাই বল। আমার শরীর তো বেঁকে চুরে গেল। আর কি আগের মতো খাটতে পারব? মানুষের ছায়া উঠোনে পড়ছে তো চমকে উঠছি। ভাবছি আমাকে ধরতে বুঝি পাইক বা পেয়াদা পাঠাল মালিক।

—ভাবিস না অত।

—চিন্তা তো আসে।

—তোর বউ এখন মালিকদের মতো পূজাউজা করছে। খুব ঠাকুরদেবতা চিনেছে।

টেড়ার বউ বলল, কেন করব না? চাট্টি বুনতে পারলে বেচতে পারব। যেদিন পারলাম না, সেদিন তো উপোস। তখন বলি, আজ আমার সংকটনারায়ণের পূজা, আজ উপোস করতে হয়।

—সংকটনারায়ণ আবার কোন্ দেওতা?

—আমি জানি? হাটে নতুন তশীলদার এসেছে। সে প্রতি শুক্রবার সংকটনারায়ণের পূজা লাগাচ্ছে।

ভুনেশ্বর বলল, পয়সা পিটছে কত! হাটের তোলা, পূজার পয়সা, বেটার চেহারা যেন পালটে গেছে একেবারে। আমরা একবার পূজা লাগাব?

ঝারির বয়স কম, কথাবার্তা বেশ নকুলে। সে পেট বাজিয়ে বলল,

হাঁ হাঁ, এ খুব ভালো কথা। আমাদের পেটের নামই সংকটনারায়ণ। একে খাইয়ে দাও। দেওতা সন্তোষ হবে।

ভুনেশ্বর বলল, সে কথাও সত্যি। কি যে হারাম কাজ করে গেল দিল্লীওয়ালা সাধুজী। সাতটা দিন খুব খাওয়াল, খুব খেলাম। পেট ভরে খাবার অভ্যেসই হয়ে গেল। তারপর সে তো চম্পট দিল। এখন খাবার অভ্যেস মরতে সময় লাগছে। আগে ভুখা থাকলে এত কষ্ট হত না। এখন বড্ড কষ্ট হয়।

ঝারি বলল, রাম রাম বলত, হারাম কাজ করে গেল। যা হোক, পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি।

সংকটনারায়ণ একদিন মানুষ হয়ে গনোরি নাগেসিয়ার ঘরে চলে এলেন। সেই ব্রাহ্মণ দেবতা, যিনি হনুমান মিশ্রের আত্মীয়। বেঁটে খাটো মানুষ, খুব জোয়ান, খুব কালো। কাঁচাপাকা চুল ছাঁটা, টিকিও আছে। চোখের পল্লব নেই বললে চলে। দৃষ্টি খুব উগ্র আর ঝকঝকে।

—আমার নাম পরমানন্দ মিশির। তুমি গনোরি নাগেসিয়া? এতদিন হাসপাতালে ছিলে?

—হাঁ দেওতা, চরণ লাগি দেওতা।

ছোঁয়া বাঁচিয়ে মাটি ছুঁয়ে টেড়া প্রণাম করল। দেওতাকে বসতে বলল না। ঘাবড়ে গেছে ও। পেটের মধ্যে কি যেন নড়ছে, গায়ে ঘাম দিচ্ছে। জীবনেও এমন ঘটনা ঘটে নি। পলামু জেলায় কোন পরমানন্দ মিশির এসে দাঁড়ায় নি কোন টেড়া নাগেসিয়ার উঠোনে।

যদি তেমনটি আগে একবারও ঘটে থাকত, তাহলে টেড়া নাগেসিয়া জানত, এমন অবস্থায় কি করতে হবে। সে তো জানে না। তাই 'চরণ লাগি দেওতা' বলে লাঠির ওপর ভর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রণাম করে ও দাঁড়িয়ে থাকল।

॥ ৩ ॥

পরমানন্দ মিশির টেড়ার বাড়ির চাট্টিতে বসল না। বলল, মৃত্তিকাসনে দোষ নেই। মাটি হল সবার মা। এই মাটিতে জনমকরম।

উঠোনের নিষ্ফলা আমড়া গাছটির নিচে ও বসল। বলল, বোস, কথা আছে।

—না দেওতা। দোষ লেগে যাবে।

—কোন দোষ হবে না।

—মালিক রেগে যাবে।

—মালিক রাজপুত। আমি ব্রাহ্মণ। আমি যা বলব সেটাই ঠিক কথা হবে।

—মাটিতে বসতে কষ্ট হয়।

—দাওয়ায় বোস। শোন গনোরি, কতদিন তুমি মুনাবর সিং চন্দেলার কামিয়া হয়ে আছ?

—অনেকদিন হয়ে গেল।

—কত দিন?

—হিসাব করতে পারি না।

—দৌলতি তখন হয়েছে?

হ্যাঁ, দৌলতি তখন এতটুকু।

—ওর বয়েস কত·

—মালিক-লোকদের আর আপনাদের যখন আজাদী হল, মালিক সকলকে পুরী কচৌরি খাওয়াল, খুব ধুম মচাল, টাউনে গেল, তার পরের বছর দৌলতি হল। সে সময়ে ধান পেকেছিল।

—কত টাকা নিয়েছিলে?

—তিনশো টাকা।

—টিপসহি দিয়েছিলে?

—হ্যাঁ দেওতা।

—হাঁটতে পারো ?

—হাঁ। দেওতা।

—আমার সঙ্গে চল তো একটু।

—কোথায় যাব ?

—কথা আছে।

পরমানন্দ আগে হাঁটল, পিছনে ঢেঁড়া। গ্রামের সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল। এ রকম ব্যাপার আগে কখনো ঘটে নি এই গ্রামে. পলামু জেলায়। বামুন এসে নাগেসিয়াকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে।

পরমানন্দ বলল, গনোরি! আমি তোমাকে নিয়ে মনিবের কাছে যাব আর তোমার হিসাব ক'র টাকা শোধ করে দেব।

--কি বললেন দেওতা ·

—টাকা শোধ করে দেব।

—আমি ঢেঁড়া নাগেসিয়া দেওতা, অছুত, বড় গরীব দেওতা। ভাত খাই পালেপরবে।

—আরে! কি হল ?

—আমার সঙ্গে তামাশা করবেন না দেওতা।

—তামাশা ? না না।

—আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নি দেওতা।

—এ সব কথা কি বলছ ?

—আমি আপনার তামাশার যোগ্য নই।

—তামাশা আমি করি না।

—তবে টাকা দিতে চাইছেন কেন ? তিনশো টাকা ? বাপ্ রে, মাস ভরে ফসল কেটে তিন টাকা মজুরি চেয়েছিল পার্‌হাইয়ারা, মালিক গুলি মেরে দিল। তিনশো টাকা কে কাকে দেয় দেওতা ? এ তামাশার কথা নয় ?

- বাপু হে, কাজের কথা আরো আছে।

—কি, দেওতা ? ওকে টাকা দিলে আমি আপনার কামিয়া হব,

নয়? কেমন করে হব? কোন্ মেহনতে টাকা শুধব? আমার শরীর যে খুঁতো হয়ে গেল।

—আরে! এ যে বোঝে না দেখি।

—আপনি বিদেশী লোক, চলেও যাবেন। আমি আপনার সঙ্গে বিদেশে বা যাব কী করে? আমার তো বিদেশে যাবার সাহসও নেই। সে সাহস আছে আমাদের মধ্যে এক বনো নাগেসিয়ার। সে তো এখানে নেই, চলেও গেছে

পরমানন্দ তখন ভীষণ চেঁচিয়ে ধমকে বলল, উজবুক, গাধা, বুড়ো বতু কোথাকার! কে চায় তোকে কামিয়া করতে? আমি কি কামিয়া প্রথা পছন্দ করি?

—আমার কামিয়ৌতি খুব অপছন্দ
আমি দয়াবান, পরম দয়াবান
বাপ-পিতামহ রেখে গেছে কামিয়া
তাদের দিয়েছি মুক্ত করে
আমি তো দয়াবান, পরম দয়াবান
জৌখান গ্রামে আমার ক্ষেতখামার
স ব দিযে দিয়েছি বউ ছেলেদের
দয়াবান আমি, টাকার থলিয়া নিয়ে
খালাস করে বেড়াই কামিয়াদের
কলিযুগে ব্রাহ্মণই হল অছুতের মুক্তিদাতা
আমি সেই ব্রাহ্মণ, সংকটনারায়ণ আমি।

টেড়া তো বুঝে পেল না কিছু। কেঁদেই আকুল হল। তখন পরমানন্দ যে কথা বলল, তা খুবই আশ্চর্য। কিংবদন্তী ছাড়া এমন কথা কেউ শোনে নি।

পরমানন্দ বলল, নারায়ণ হয়ে কাজে নেমেছি, সঙ্গে লক্ষ্মী চাই। তোর মেয়ে দৌলতিকে আমি বিয়ে করব।

এ কথা শুনে টেড়া, হায় রাম! পাগলের পাল্লায় পড়েছি—বলে টেড়া শরীর নিয়ে দৌড় লাগাল।

পরমান্দের সঙ্গে দৌড়ে সে পারবে কেন? টেড়ার জীবনের এ কথাগুলি তো গল্পকথাই। টেড়াকে সে ধরে ফেলল। টেড়া বলল, ছেড়ে দাও দেওতা, ঘর যাই।

—ছাড়ব কেন রে বুড়বক?

পরমানন্দ টেড়াকে চেপে ধরল। টেড়া আকাশ বাতাস ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল, সত্যনাশ হয়ে গেল গো, ধরমনাশ হয়ে গেল গো। আমাকে এই ব্রাহ্মণ এই দেওতা ধরে রেখেছে গো! এ কোন বদ্ধ পাগলই হবে।

—আরে মহামূর্খ, চেঁচাস কেন?

—হায় রাম, হায় ভগবান!

টেড়া কম জোরে চেঁচায় নি। হাসপাতালে খেতে পেয়েছিল ক' মাস, শরীরে জোর ছিল। আর, পরমানন্দের কথাবার্তায় ঘাবড়ে গিয়েছিল বেজায়, প্রাণের ভয়ে গলায় জোর এসেছিল।

দুজনে চেঁচাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, এমন সময়ে একটা তৃতীয় গলা আরো জোরে চেঁচাল, আরে! হচ্ছেটা কী?

মুনাবর চন্দেলা। মুনাবর কখনো একলা চলে না গ্রামের পথে, দিনেমানে। আগে-পিছে লোক না দৌড়লে ওর মান থাকে না। রাতে-ভিতে ও একাই পথ চলে। মুনাবরের লোকরা দুজনকে ছাড়িয়ে দিল।

—কি হয়েছে গনোরি?

—মালিক। এই দেওতা···টেড়া কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে, এই দেওতা বলছে টাকা দিয়ে আমার কামিয়ৌতি ছুট করাবে, বলছে, বলছে দৌলতিকে বিয়ে করবে।

—অ্যাঁ?

—বলছে।

মুনাবর তখন চেয়ে দেখল ভালো করে। তারপর টেড়াকে ঘাবড়ে দিল একেবারে।

জোখানের পরমানন্দ মিশ্র, না? মেয়ের বাপ দেখে কামিয়ৌতি ছাড়ায়, মেয়েকে বিয়ে করে।

মুনাবর চিৎকার করে হাসতে লাগল, আরে! কী তামাশার বাত! এসো এসো দেওতা এসো। গ্রামের দুলহন তুমি, চলো তোমাকে সিধা বের করে দিই, পাকসাক করো, সেবা লাগাও। বিয়ের ব্যাপারটা কি আমার ওখানেই হবে?

পরমানন্দ কটকট করে সুপুরি খেতে লাগল। কোন কথা বলল না। মুনাবর বলল, টেঁড়া, তুই ঘরে যা। দেওতার সঙ্গে আমি কথা বলছি।

টেঁড়া বলল, যাচ্ছি মালিক।

—নির্ভয়ে যা। এ দেওতা এমন খেলা গ্রামে গ্রামে খেলে বেড়ায়। কত বউ হয়েছে ওর, ভালো ভালো ঘর বানিয়ে সকলকে কত সুখে রেখেছে।

টেঁড়া বাড়ি চলে এল।

পরমানন্দের সঙ্গে মুনাবরের নিশ্চয় অনেক কথা হয়ে থাকবে। আর মুনাবরের বাড়িতেই সেবা ভোজন হয়ে থাকবে তার, কেননা সে-বেলা ও এলই না আর। বিকেলে মুনাবরের লোক টেঁড়াকে ডাকতে এল।

কাছারিতে মুনাবর ও পরমানন্দ বসে ছিল। মুনাবর বিনা ভূমিকায় বলল, এই দেওতা তোর কামিয়ৌতি ছুট করিয়ে দিচ্ছে তিনশো টাকা দিয়ে। তেরো বছর আগে তিনশো টাকা নিয়েছিলি। সুদে বাড়তে বাড়তে সে যে কত হয়েছিল, সে আর নাই বা শুনলি। এখনো বেকসুর আরো তেরো বছর তোকে খাটাতে পারতাম।

কিন্তু তা পারি না, দয়ার শরীর আমার
আর! জগতের যত দয়ামায়ার ক্ষীর-সর-চাঁছি
তাতেই যে আমার শরীর-মন গড়ল ভগবান
ফি বছর কাছারিতে রামনবমীর দিনে
গরিবকে এক টাকা দেবই দেব
না দিয়ে যে পারি না, দয়ার শরীর!
দয়ার শরীর আমার, নইলে দেখ দেখি

সেমরা গ্রামের গনোরি ভূইয়া,
হাঁ হাঁ, সেও এক গনোরি, সেও এক গনোরি—
নিজের বিয়েতে পাঁচশো টাকা নিয়েছিল
জোয়ালা পাঁড়ের কাছে
আটতিরিশ বছর কামিয়া খাটছে গো—
আটাত্তর বছর বয়েস হয়ে গেল গনোরির—
কামিয়ৌতি ধার রক্তবীজের ফৌজ
একেক টাকা জন্ম দেয় হাজার হাজার টাকার
ঋণ তো শোধ হবে না—
গনোরি সে কামিয়ৌতি ধার ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে
রামশিঙে ফুঁকবে ভোঁ ভোঁ করে।

কেলকার গ্রামের পিয়ারি ভূইয়াকে চিনিস?
ভোলা সাউয়ের কাছে নিল সত্তর টাকা
পেটে খাবে বলে, পেটের জ্বালায় জ্বলে
বাস্, বিশ বছরে সে টাকা শোধ হয় নি
আগামী বিশ বছরেও শোধ হবে কি?
কামিয়ৌতি ধার যে রক্তবীজের ফৌজ
একেক টাকা জন্ম দেয় হাজার হাজার টাকার
ঋণ তো শোধ হবে না—
পিয়ারির ভাইটাও ভোলা সাউয়ের কামিয়া বনে গেছে।
সিমরি গ্রামের তপেশ্বর মান্ঝি জাতে তুসাদ গো
বরম পণ্ডিত তাকে ধার দিল আশী টাকা
পনেরো বছর বয়েস তখন তপেশ্বরের
তার বাপের অসুখে ধার দিল বরম পণ্ডিত, বাস!
আজ পঁচিশ বছর তপেশ্বর কামিয়ৌতি বেগার দেয়
দিতে দিতে—দিতে দিতে—
তপেশ্বরের বয়েস? তা চল্লিশ হল?

কামিয়ৌতি ধার তো রক্তবীজের ফৌজ,
বেড়ে চলে হাজাবে হাজারে।
আমি তো তোকে খাটাতে পারি আরো-কতকাল
যতকাল বাঁচবি, রেখে দিতে পারি কামিয়া করে
কামিয়ৌতি ধার কখনো শেষ হয় না
কিন্তু ওই যে বললাম '
জগতেব যত দয়া-মমতার ক্ষীর-সর-চাঁছি
তাই নিছিয়ে পুঁছিয়েই কি আমায় গড়েছিল ?
কিছুতে পারি না নিষ্ঠুর নিদয় হতে ।
আমেব কালে একটা আম ভিখিরিকে দেবই—
তোদের নাস্তার লুকুমায় জলের সঙ্গে দুটো
মকাই-বাজরাও ফেলে দিই—
পঞ্চায়েতী কুয়ো থেকে তোদেরও জল দিয়ে ফেলি--
দয়া মমতাতেই আমাব এই হাল—
শহরবাজার হলে
আমাব নামে বাস্তা হত, রাস্তা ॥

—কিন্তু টেঁড়া। দেওতা যা বলবে, সব শুনবি। এ লোক সামান্য নয়: হনুমানজী এব আত্মীয়, এব কথা না মানলে তিনি চটে যাবেন। আর হনুমানজী চটে গেলে বাজপুত-ভুঁইহারাই ভয় খেয়ে যায়। তুই তো নাগেসিয়া।

টেঁড়া বলল, জী হজৌর।

কী কথা, কী শুনতে হবে, তা সে ভাবলই না। যা শুনল, তাতেই 'হ্যাঁ' বলে দিল। কেননা মালিক পরোয়ার কিছু বললে পরে ভয়ের চোটে টেঁড়ার মাথার ভেতরকার যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। মালিকের গলার গাঁকগাঁক আওয়াজটা শোনে, কথাগুলো বোঝে না। মনিবের কথায় 'জী হজৌর' বলা ওর অনেক কালের অভ্যেস।

ও 'জী হজৌর' বলার সঙ্গে সঙ্গে কাছারির লোকজন, মুনাবর, পরমানন্দ, সবাই কেন হেসে উঠল, তা বুঝলই না টেঁড়া। ও শুধু

দেখল, পরমানন্দ অবহেলে একতাড়া নোট বের করে দিল আর মুনাবর গুণে নিয়ে বলল, গরম কোটটা তাহলে করিয়ে ফেলি।

মুনাবরের সিন্ধুকের ভেতর লাল শালুতে বাঁধা এত এত কামিয়ৌতি দলিল। টেড়ার দলিলটা বের করে মুনাবর ছুঁড়ে দিল টেড়ার দিকে। বলল, এবার খাবি কী?

টেড়া হাত চিত করে ঘাড় হেলিয়ে নিজের অসহায়তার কথা বুঝিয়ে দিল। 'কী খাবি এবার?' এ প্রশ্ন টেড়া নাগেসিয়াদের করতে নেই, তা মুনাবর জানে না। টেড়ারা তো খায় না, না খেয়েই ওরা অভ্যস্ত। আর তবু খিদে যায় না, এই হল ঝামেলা।

আর এমনি করেই রচিত হল এক আশ্চর্য রূপকথা। টেড়া নাগেসিয়া, কামিয়া, তাকে নিয়ে দয়া দেখাবার জন্যে ব্রাহ্মণ পরমানন্দের সে কী ঝুলোঝুলি। মুনাবর চন্দেলার বা সে কী দয়া। স্বর্গরাজ্য নেমে এলো পাপের পৃথিবীতে, অভিশপ্ত জংলা জেলা পলামুতে। যেখানে মানুষ, নাগেসিয়া-পারহাইয়া-ওঁরাও-মুণ্ডা-ভূইয়া দুসাদ-গঞ্জু-ধোবি-চামার জাতের মানুষগুলো সব আজীর। পেটের জ্বালায় যাদের অত্যন্ত কম টাকায়, কম শস্যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণ রেখে চলে ক্রীতদাস। আর সমাজবিজ্ঞানীরা পলামু ঘুরে ঘুরে নথিপত্রে লেখে, সব বেটা বিয়ে-সাদী-শ্রাদ্ধ-পূজার কারণে কামিয়া বনছে, ছোট চাষী যে জোতদারের কামিয়া বনছে, সে-সব কথা সমাজবিজ্ঞানীরা সুকৌশলে এড়িয়ে যায়।

এই সব পণ্ডিতরা চায় সরকারের মদত
সরকার চায় জোতদারের মদত
জমির মহাজন, এই নতুন জুনকারের জাত
এ জাত তো স্বাধীন ভারত-সরকারের সৃষ্টি
সরকার চায় জুনকার-জোতদারের মদত
কেন না কিছু নয় কিছু নয় কিছু নয়
ভিলাই-বোকারো-জামসেদপুর
সরকারী খাজানা জোগায় লাঙ্গলচষা জমি

সে জমির রাজাবাদশা এরা।

আর জোতদার, জুনকার, বাজাবাদশারা

চায় মুফৎ শ্রম, মুফৎ জমি -

তাই তারা রংরুট করে কামিয়া-সেওকিয়া হরোয়াহা

সে সব কথা জানতে নেই, লিখতে নেই, কেন না— ॥

রূপকথাই থেকে যেত সবটুকু. কিন্তু রূপকথার উপসংহার হল জীবন, রক্তাক্ত, যন্ত্রণার্ত জীবন

তাই পরমানন্দ একদিন টেড়ার চোদ্দ বছরের মেয়ে দৌলতিকে নিয়ে চলে গেল। টেড়া অনেক আপত্তি করেছিল। কিন্তু মুনাবর চোখ বাঙিয়ে বলল, টাকা দেয় নি তোকে? তোকে না খালাস করল!

—মেয়েকে দেব কেন হজৌর?

—বিয়ে করবে বলছে, এ তোর ভাগ্যি। যদি কিছু না বলে বলত, কামিয়া করব ওকে, তাই নিয়ে যাচ্ছি?

ফিরে এল টেড়া। দৌলতি কিছুই বোঝে নি। বামুন করে নাগেসিয়া মেয়েকে বিয়ে করে? ভুনেশ্বরের বউ বলল, যখনই কাপড় দয়েছে, আটা দিয়েছে, তখনই জানি এর মধ্যে কোন গোলমাল আছে।

মেয়েরা সবাই ভিড় করে এসেছিল দৌলতিদের বাড়ি, পুরুষরা কথা কইছিল উঠোনে।

সকলেই মাথা নাড়ল ঘন ঘন। না, কেউই এমন কোন কথা কখনো শোনে নি। এর মধ্যে আরো কোন কথা আছে, মালিক সমাজের কোন সুগভীর ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রটা জানতে পারলে এরা খুব নিশ্চিন্ত হয়, টেড়া যায় ঘাস কাটতে, টেড়ার বউ যায় খেত গুঁড়াতে।

ভুনেশ্বর বলল, তোর বড় ছেলেকে খবর দে।

টেড়া মাথা নাড়ল। যে যে কারণে ও তিনশো টাকা নিয়েছিল একদা, ওই ছেলের বিয়ের ব্যাপার তার মধ্যে একটি। ও বলল, বড় আর ছোট কি, ছেলে তো ওই একটাই। কোথায় সে? কোন দিন

খবর নেয় আমাদের? লাতেহারেও তো থাকে না এখন, কোথায় আছে তাও জানি না।

বিয়ে করবে বলছে, জাতপাঁত মানে না বলছে। ঘরে ওর বড় বড় ছেলে আছে। এ কী ব্যাপার?

ঝারি অবশ্য বলল, জোখান তো দূরে নয়। যাবে কোথায় ওকে নিয়ে? খবর ঠিক নিয়ে আসব।

দৌলতি আর ওর মা পরস্পরকে জড়িয়ে পাথর হয়ে বসে ছিল। মা মেয়ের গায়ে হাত বোলাচ্ছিল সমানে। ফাটা চটা হাত। হাতের আঙুল বুলিয়ে ও গুনগুন করে কাঁদছিল, এ কী কথা মা, কখনো শুনি নি? ক্ষেতখামার থেকে আমাদের বউ-মেয়ে তুলে নিয়ে যায় মালিক-মহাজন চিরকাল। বামুন কবে আমাদের মেয়ে বিয়ে করে? বিছানায় ওঠায়, তাও তো ঘরের বাতি নিভিয়ে। মুখ দেখলে পাপ হবে। বিয়ে! এ যে আশ্চর্য কথা হয়ে গেল মা!

দৌলতি ওর আস্ত কাপড়টা পরল। পরমানন্দ বলল, ছেঁড়া-ফাটা ন্যাকড়া-চোকড়া নিতে হবে না। সে-সব আমি কিনে দেব। ও সব রেখে যা।

সব রেখে দৌলতি নাগেসিয়া পরমানন্দের পিছন-পিছন সেওরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। গ্রামের বর্ণেতর নিরন্ন সমাজকে বোবা করে রেখে গেল। এ কী হল? রূপকথা।

রাজবী ধোবিন্ হুঁকো টানতে-টানতে বলল, লোকটার চোখ দেখেই বোঝা যায় ও শয়তান। ওর কি মতলব আছে, ঠিকই জানা যাবে।

মুকামী হুসাদিন্ বলল, দৌলতি কী খেত, কী মাখত, কে জানে। এমন দলমলে চেহারা হয়েছিল ওর, তাতেই নজর পড়ল। আমাদের ঘরের মেয়ের জওয়ানী এলে শকুন মাথার ওপর উড়বেই। কত যে দেখলাম।

॥ ৪ ॥

হাঁটতে হাঁটতে দৌলতির পা ধরে গিয়েছিল। ভয় যত, কৌতূহলও তত। কিন্তু ও শান্ত মেয়ে। একটা গাছের নিচে বসে ওরা খানিক জিরোয়। পরমানন্দ পুঁটলি খুলে ওকে দিয়েছিল চিড়ে ও বাতাসার ঠোঙা।

জল খেয়েছিল দৌলতি বাসরাস্তায় পৌছে চায়ের দোকানে। পরমানন্দ খেয়েছিল চা।

বাসে চড়ে কোথাও যাবার অভিজ্ঞতা দৌলতির এই প্রথম। মবিলের গন্ধে বমি করতে করতে ও ঝিমিয়ে পড়ে। তারপর ওরা তোহ্‌রির বাসজংশন ছেড়ে একটা গঞ্জ জায়গায় নামে। জায়গাটাতে পরমানন্দ নিশ্চয় অনেকবার আসে। কেন না এই মাধ্‌পুরায় ঘর একটা ওর ভাড়া করাই ছিল। তালা খুলে ও দৌলতিকে একটা মাদুর ফেলে দিল মেঝেতে। বলল, শো খানিক। ভালো লাগবে।

শুয়েই দৌলতি ঘুমিয়ে পড়ে। খুব ঘুমোয় ও। ঘুম ভেঙেছিল সন্ধ্যে পেরিয়ে। পরমানন্দ বলল, যা—ওখানে পিসাব কর, হাত-মুখ ধুয়ে নে।

প্রস্রাব-মলত্যাগের এমন ব্যবস্থা দৌলতি কখনো দেখে নি। খুব উঁচু পাঁচিলে ঘেরা উঠোন, একপাশে শৌচের ব্যবস্থা, সেও ঘেরা টিনের দেওয়ালে। না রান্নাঘর, না দালান। উঠোনের একপাশে ইঁদারা, দড়ি আর বালতি ঘরে ছিল। ঘরটা মাঝারি।

দৌলতি ঘরে এসে বসল। পরমানন্দ একটা লণ্ঠন জ্বেলেছে। বলল, ওই কোণে মাটির ভাঁড়ে খাবার রেখেছি, খা। জল খা। আবার ঘুমা। আমি ঘরের বাইরে তালা দিয়ে ঘুরে আসছি।

পরমানন্দ বেরিয়ে গেল। কী বন্ধ, কী চাপাচপি। মাটির বড় ভাঁড়ে পুরী-তরকারী-লাড্ডু। দৌলতির চোখ ফেটে জল এল।

তার বাবা, তার মা, কোন দিন খায় নি এত ভালো ভালো খাবার। অবশ্য তাদের সঙ্গে আর তো দৌলতির তুলনা চলে না। দৌলতি যে ব্রাহ্মণ দেবতার বউ হতে চলেছে।

দেবতাটির মতলব বোঝা যাচ্ছে না। বিয়ের পর দৌলতিকে ও এখানেই রাখবে না কি? এই রকম চারদিকে ইটের দেওয়াল আর চালে খাপরা যার, তেমন ঘরে? দৌলতিদের ঘর অনেক ভালো। ঘরের দোরে দাঁড়ালেই দেখা যায় গাছটা, আকাশ। ঘরের দোরে সেজখানা। মা গো! কত ভালো মাঠে যাওয়া। দৌলতির এক কাকা, ছোটবেলায় যখন মাঠে গিয়েছিল, বাঘ তাকে ধরে নিয়ে যায়। দৌলতি লাকড়া, হুড়ার, শেয়াল, সব দেখেছে। বাঘ কখনো দেখে নি।

ছোটবেলা মা রাগলেই বলত, চল্ তোকে বাঘের গর্তে ফেলে রেখে আসি।

দৌলতির বাবা বাঘ দেখেছে কতবার। আর ভুনেশ্বরৎনানা যে কী বলে! বলে, তুই বাঘকে না দেখলেও বাঘ তোকে ঠিকই দেখেছে।

পরদিন সকালে উঠে ও বুঝল, দেওতা রাতে খাটেই ঘুমিয়েছে। ওর গায়ে হাত দেয় নি। কিছুক্ষণ বাদে একটি এক-চোখ কানা লোক এল। পরমানন্দের সঙ্গে কথা বলতে।

—এবার কি একটাই জোগাড় হল মিশিরজী?

—হ্যাঁ।

—কারো বউ?

—না না, বিয়ে হয় নি, আর—পরমানন্দ চোখ মটকে বলল, এখনো কুমারীই আছে।

—সে কী!

—আরে সত্যি বলছি।

—আপনি থাকতে ও কুমারী রয়ে গেল?

—কী করি বাবা! টাকা খেয়েছি।

—কার?

—লাটিয়া বাবুর।

—হাঁ হাঁ, লাটিয়াজী অনেক দিন ধরে বাহানা করছে বটে, হরিজন মেয়ে চাই, কুমারী মেয়ে চাই। আমাকেও বলেছিল বটে, কিন্তু জওয়ানী মেয়ে, আবার কুমারীও থাকবে, সব হয় কি করে? সব তো ছোটবেলা বিয়ে হয় আর একটু বড় হতে না হতে ঘরের মরদ বাইরের মালিক-মহাজন—কুমারী থাকতে দেয়? আমি তো খুব মুশকিলে পড়েছিলাম।

—শুনেছি।

—তারপর লাটিয়াজী আপনাকে পাত্তা লাগাল?

হাঁ হাঁ।

—আপনি কি বললেন?

—দেখুন আমার কাছে 'মুশকিল' আছে, কিন্তু 'মুশকিল' হচ্ছে বলে হাল ছেড়ে দেব, সে লোক আমি নই। সে কাজ যত কঠিন তা করবার জন্যে আমার তত রোখ চেপে যায়। তালাসে থেকে-থেকে বের করলাম ঠিক জিনিস।

—দেখতে তেমন সুরতছাপা নয়।

—লাটিয়াজীর দরকার মিটে যাক। রামপিয়ারী সুরতছাপা করে দেবে।

—সুরতছাপা দিয়ে কি হবে?

—লাটিয়াজী…সে মেয়েটার কথা…

—কে? আঃ, সে-সব কথা কেন?

—লাটিয়াজী যা করে মেয়েগুলোকে নিয়ে! হাতিও মরে যাবে সে দাপট সইতে হলে।

—এরা হল মহাত্মাজীর হরিজন। মেহনতী মানুষ। এরা একমণ ধানের বস্তা উঠাতে পারে।

—দেখুন! আপনার কপালজোর আছে।

—পুরুষ হল সিংহ। কপাল সে বানিয়ে নেয়। আমি যদি বসে থাকি, তাহলে পেট চলবে?

—খাশা কামিয়৷তি কারবার ফেঁদেছেন আপনি। কোথায় কোন্ কামিয়ার জওয়ান মেয়ে আছে, কোন্ মেয়েটা কুমারী, কবে রাজবদল হবে আর আপনাকে ধরবে পুলিস!

—কে ধরবে ভৈয়া? পুলিসের বাবু, রেলের নিস্‌পেকটার, রাম-পিয়ারীর বাড়ি না গেলে কার চলবে?

—সে কথাও ঠিক।

—এখন আমি একটু দোকানে যাব। কিছু কাপড়-জামা মেয়েটার জন্যে কিনব। এত্ত বাজে খরচ। কিন্তু লাটিয়াজী আছে, রেলের কণ্ট্রাকটর বাবু আছে, আর বাসগুমটির পাঞ্জাবীগুলোও আছে—কাপড় জামা কিনতে হবে, সাবান, তেল।

—এও আমার মনে খুব জানবার ইচ্ছা!

—কি?

—কামাই তো আপনি নিবেন?

—জরুর। একশোবার। আমার হক।

—ওদের কাপড়ালত্তা, খানাপিনা, তেল-সাবুন, বিমারে ইলাজ চলে, তাহলে কি দিয়ে?

—আপনি কি করেন?

—আমি তো তোহ্‌রিতে যাব, মাস ফুরালে হিসাব করে সকলের কাছ থেকে দিন দু-টাকা—এক টাকা—আট আনা, এমনি যার যা হিসাব নিয়ে নেব, বাস্। তার উপর যা থাকে, তা ওদের।

—খাবে, ঘর ভাড়া দেবে, সব?

—ঘরভাড়া তো আমি দিই। খাবে নিজের খরচে।

—আপনি সাইকেল রিকশার কারবার করেন ধানবাদে, আর এ কাজেও সেই নিয়ম বহাল রেখেছেন। এরা তো আমার কামিয়া, সেওকিয়া না? বাড়ি আমার, খাইখরচ আমার। খদ্দেরের মন ভুলিয়ে কাপড়-তেল-সাবানের খরচা উঠাতে পারো, ভালো। না পারো ধার নাও।

—আর সে ধারভি মুল ঋণের সঙ্গে জুড়ে দেবেন? তাই তো বলছেন?

—নয়তো কি দাতব্য করব?

—পরমানন্দজী আপনার পদম্শ্রী জরুর মিলবে।

—হাঁ হাঁ? সে কি জিনিস?

—এ উমদা জিনিস।

—কি?

—সরকারী খেতাব। এলেমদার মানুষ পায়।

—আমাদের কথা কে জানছে বলুন? এই জংলা জায়গায় হেঁটে হেঁটে মাল যোগাড় করে দোকান চালানো—এ যে কি কষ্ট কাকে বলি, কাকে বুঝাই।

—সবকার ঠিক জেনে যাবে। আর পদ্মশ্রীও বানিয়ে দেবে তখন। চলি তাহলে। রাম রাম পরমানন্দজী! ঈশ্বর আপনার ভালো করুন।

—যাব একদিন। দেখে আসব তোহ্‌রিতে।

— যাবেন।

দৌলতির সামনেই এভাবে বলাকওয়া হয় সব কথা আর খানিক বোঝে না দৌলতি, কিছু কিছু যেন বোঝে। যা বোঝে না, তাতেও ভয় করে ওর, যা বোঝে তাতেও।

লোকটি চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে এক বিকট মোটা মেয়েছেলে। পরনে ছাপা কাপড় আর দৌলতি অবাক হয়ে দেখে পায়ে মল আছে, জুতোও আছে।

—গোড় লাগি দেওতা।

—এসো রামপিয়ারী।

—কখন যাবেন?

—বিকালে।

—কিষণজী এসেছিল মনে হলো?

—হাঁ হাঁ। শালা শয়তান, গন্ধ পেয়ে যায় ঠিক, আর চলে আসে এখানে। এই যে এলো, এখন কি করবে তা জানি। যতদিন দেখবে

মালটা খদ্দের টানছে, ততদিন গুয়ের মাছির মতো ভনভন করবে আর ভাংচি দেবে।

—আমি আছি, ভাববেন না।

—সেই তো ভরসা।

—তাহলে চলি। বাজার ঘুরে যাব।

—যাও। আর দেখো, খাইখরচে ফতুর কোর না আমাকে। বাজার খুব খারাপ, বুঝেছ?

—আপনি যা বলেন। বলেন তো হাওয়া খাইয়ে রেখে দেব। হাওয়া তো মিনিমাংনা মিলে।

—তা বলি নি গো।

—তো আর কত বুঝব বলুন? আপনাকে আজ থেকে দেখছি না, আর আপনার মুখে তো আজ অবধি কখনো শুনি নি বাজার ভালো। এখনো মাধপুরাতে এক টাকার বেগুন-ভিণ্ডি কিনলে একটা ছোট বোরা ভর্তি হয়ে যায়। তা এতগুলো মানুষ খাবে, আপনি পাঁচ টাকা বাজার করবেন না? এই রকম দৃষ্টি আপনার, তাতেই বক্না বাছুর কিনেন, পাঁচ বছরে সে হয়ে যায় বুড়ী গাই, বাঁজাটা। আর রোগ-বিমারিতে, না-ইলাজ, না দাওয়াই, ফটাফট মরে যায়। তখন আপনি হায়-হায় উঠান,আর আপসোস করেন।

যা বাবা, যা ভালো মনে করিস তাই কর্ গে যা।

আমার সে-কথাটার কি হল?

কি কথা?

সে নথ্নি?

এই দেখ! এবারও আনতে ভুলে গেলাম?

ভুলে আপনি যান নি কেন মিছা বলেন। যাক গে। কথায় কথা বাড়ে বই তো নয় আমি চলি। একবার তোহরি গিয়ে কিষণ-জীর হাবেলিটা দেখে আসবেন। পাকা ঘর, দুটা ইঁদারা, যার কামাই নেই তার পয়সা ছাড়্ দিচ্ছে, ব্যাপারই আলাদা।

ওর কথা থাকুক।

আবার বলে কি! এখন সবাই ইউনাইন করে, ধানবাদে আমার সাইকেল-রিক্শাওয়ালারা ইউনাইন করে—তা এদের কিছু থোড়াবহোত আরামস্বস্তি তো চাই ছুটি হয়ে যাবে যখন, তখন হাতেও কিছু চাই। আমি যদি সেসব না ভাবি, এরাও ইউনাইন বনাবে।

হাঁ হাঁ, সবাই ইউনাইন বানাল, হক আদায় করল, এখন বাকি আছে এরা।

চলি দেবতা।

তোহ্‌বির হাবেলি, ধানবাদের সাইকেল রিকশা ধানবাদের বাড়ী, সব শ্বশুব দিয়েছিল ছেলেপিলে নেই, কোন মায়ামমতা নেই ওর। ওব কথা আলাদা।

রামপিয়াবী এবার সত্যিই উঠে পড়ল, অত্যন্ত মোটা বলে ওর ওঠার ব্যপারটি খুব কষ্টসাধ্য। দোলতি হেসে মুখ ফেরাল। রামপিয়ারী বলল, হাসলি? হেসে নে। যে মোটা হচ্ছি সবাই হাসে। শরীর জল-ভসকা হয়ে যাচ্ছে।

রামপিয়াবী চলে গেল।

পরমানন্দ বেরিয়ে গেল। ঘুরে এল যখন, তখন ওব হাতে একটা রঙিন টিনের বাক্স। বাক্সটা নামিয়ে দিয়ে বলল, দেখে নে। ওঃ গলাকাটা দাম হয়েছে সব।

নতুন শাড়ি দুখানা। একখানা ছাপা শাড়ি, একখানা সিল্ক আর সুতি মেশানো। সায়া ব্লাউজ, আলতা, কাজল, মাথার ফিতে, চিরুনি আয়না, দস্তার চুড়ি মল, পুঁতির হার, কাচের দুল, কপালের টিপ। একটা সাবান। গামছা।

এসব আমার?

সব তোর। এই সাবান মেখে স্নান কর্‌। পরনের কাপড় কেচে দিবি। স্নান করে এই ছাপা শাড়ি জামা আর সায়া পরে নে। তারপর চুল শুকালে তেল দিয়ে বাঁধবি।

এত নতুন জিনিস পেলে বহু দুঃখ ভোলা যায়। স্নান করে

চুল শুকোল দৌলতি তারপর তেল ঘষে চুল বাঁধল। চোখে কাজল পরল, কপালে টিপ।

একটা লোক ভাত-তরকারি বয়ে আনল, টক দই। পেটভরে ভাত খেতে খেতে দৌলতির মনে হল, যা হচ্ছে, সবই স্বপ্ন। ভাত হল পালেপরবে খাবার জিনিস। করম পূজায়, সোহরাইয়ে দেওয়ালিতে বছরে কয়েক দিন দৌলতিরা ভাত খায়। ভাত একটা স্বপ্নে পাওয়া সম্পদ।

ভাত খেয়ে, ভাতের ওমে গা ঢেলে ঘুম এল। এই দৌলতির জীবনের শেষ ঘুম, যা দুঃস্বপ্নতাড়িত নয়, কিন্তু তা দৌলতি এখনো জানে না।

বিকেলে পরমানন্দ ওকে ডেকে তুলল। এখানে নয়, অন্য কোথাও যেতে হবে।

কোথায় দেবতা?

অন্য জায়গায়।

বাসে চেপে?

না না, কাছেই।

লোকটা কাপড়ালত্তা, জেবর-উবর দিয়েছে। খাইয়েছে অনেক, গায় হাত দেয় নি। এর সঙ্গে দৌলতির বিয়েও হবে। তাই দৌলতি টিনের বাক্স মাথায় পথ চলতে-চলতেই বলল, সাদীর জন্যে যাচ্ছি?

হাঁ হাঁ, তাইতো।

অন্য জায়গায়?

বড় বকে তো মেয়েটা? হিসেবটা গুলিয়ে দিল, তিনশো টাকা মুনাবরকে দিলাম, কাপড়লত্তায় পঞ্চাশ? না বাহান্ন? বাক্সটা... কি দাম হয়েছে সব!

বকতে বকতে ওরা পৌঁছল একটা অদ্ভুত বাড়িতে, খুব উঁচু মাটির পাঁচিলে ঘেরা হাতার একপাশ দিয়ে সারসার মাটির ঘর, খাপরার চাল। ঘরে ঘরে আলো, লোকজন।

রামপিয়ারী এগিয়ে এল, চল চল দৌলতি। আমি সেই থেকে ঘর-বার করছি।

পরমানন্দ বলল, ওর সঙ্গে যা। ও তোকে সাজিয়ে দেবে। ভালো করে সাজাস বাপু।

একটা ঘরে বসাল ওকে রামপিয়ারী। দরজা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। তারপর বলল, বাক্স রাখ। বোস্ খাটের উপর। এঃ, পায়ে যে ধুলা!

দরজা খুলে ওকে নিয়ে গেল কুয়োতলা। হাত-পা মুখ ধুয়ে এল দৌলতি। তারপর রামপিয়ারী বলল, সাবান মেখে স্নান করেছিস তো?

করেছি।

করলেই ভালো। ঘর থেকে এসেছিস, গায়ে তোর বুনো গন্ধ, দেবতার মন উঠবে কেন?

রামপিয়ারী নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, চুলটা খোল্ ভালো করে বেঁধে দিই।

চুলে খোঁপা বাঁধা হল, মুখে মাখাল কি সাদা জিনিস, হাতে-পায়ের পাতায় আলতার নকশা, সব শেষে সেই ভালো শাড়ি ভালো জামা। সাজিয়ে-গুজিয়ে হাতে আয়না দিল রামপিয়ারী।

দৌলতি নিজেকে চিনতে পারল না।

বিছানায় বোস্, এই শরবতটুকু খা। বসে থাকবি। দরজা আমি টেনে দিয়ে যাচ্ছি।

বন্ধ কোর না, ভয় করে।

না, বন্ধ করছি না।

শরবতের খালি গেলাসটা হাতে নিয়ে রামপিয়ারী তবু দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, ভয় করে। ভয় করে যদি, তবে ওর সঙ্গে এলি কেন?

দৌলতি জবাব দিল না। হঠাৎ রক্ত যেন চনমন করে উঠল ওর, তারপর অবশ অবশ লাগল। খাটে শুয়ে পড়ল ও। কি বড়

চৌকি, কি নরম বিছানা। বিয়েটা তাহলে এখানেই হবে। দেবতা বোধহয় বর সেজে আসতে গেল। ওরকম চেহারার লোককে বর সাজালে কি রকম দেখাবে কে জানে? বিয়ে দেবে কে? বিয়ের গান কি এই রামপিয়ারীই গাইবে? গানগুলো ও জানে তো?

কিন্তু শরীর যেন ঝিমঝিম করছে।

ধড়াম করে দরজা খুলে গেল। ত্রস্ত উঠে বসবে দৌলতি, উঠে বসতে পারছে না। এরা কারা?

একটা প্রৌঢ়, জুলপি-দার, বিশালকায় লোক। সঙ্গে পরমানন্দ। আরো লোক তিনজন।

পরমানন্দ বলল, দেখে নিন লাটিয়াজী, গাঁয়ের মেয়ে, হরিজন, বিয়ে হয় নি আর কুমারীই আছে।

কুয়ারী আছে?

আজ দেখে নিন, কাল দাম দিবেন।

সবাই বেরিয়ে গেল। লাটিয়া দরজা বন্ধ করল। তারপর বলল, এই ওঠ, কাপড় খোল্।

দৌলতি চেঁচাতে গেল, ভয়ে গলা দিয়ে স্বর সরল না। লোকটা ওকে হিঁচকে টেনে তুলল। তারপর কাপড়টা টেনে খুলে ফেলল। দৌলতি বাধা দিতে গিয়ে বুঝল, ওর শরীর বর্তমানে অত্যন্ত অবশ। শরবতে রামপিয়ারী কিছু দিয়েছিল।

দৌলতি, সেওরা গ্রামের গনোরি, ওরফে, টেড়া নাগেসিয়ার মেয়ে দৌলতি যেন দেখতে থাকল, ময়ুরকণ্ঠি রেশম স্থতির সাদিয়ালী কাপড়ে স্থসজ্জিতা আরেকটা দৌলতি কেমন আতঙ্কে চেয়ে আছে। কাপড়টা টেনে খুলল লাটিয়া, জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। নিজের জামা খুলে ফেলছে, লোকটা কি উলঙ্গ হচ্ছে না কি?

ঠোঁট নড়ছে, চোখে জল দৌলতি কি বলছে?

না না সরকার, না না না সরকার, ছেড়েদাও সরকার—

—দর্শক দৌলতি আর নির্যাতিতা দৌলতি কি এক হয়ে যাচ্ছে?

লাটিয়া এখন কি করছে? এ কি? দুই দৌলতি এক হয়ে গেল আর ভীষণ যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল একটা আর্ত মেয়ের গলা।

পুরুষকার সতেজ ও পাশব রাখার জন্য লাটিয়া হেকেমী ওষুধ খায়, যৌন ক্ষুধা ওর অপরিসীম। সারা রাতে দৌলতি রক্তাক্ত হয়ে যায় বারবার। শেষে ওর কান্না মিনতি আর শোনা যায় নি। কিন্তু শুওর যে রকম শব্দ করে খাবার খোঁজে, তেমন "ঘাঁতঘোঁত" শব্দ শোনা গিয়েছিল।

সকালে পরমানন্দ যখন ঢুকল তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ দৌলতি পড়ে আছে। বিবশ, বিবিভ্র। সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক লাটিয়া বসে আছে চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে। দরজা খোলা। লাটিয়ার প্রচুর টাকা, ঠিকাদার সে। পাটনা অবধি তার দৌড়। রেণ্ডিবাড়ি এটা রামপিয়ারীর বাড়ি। এখানে ওর উলঙ্গ হয়ে বসে থাকতে কোন বাধা নেই। এখানে সবাই ওকে ভয় পায়। এরকম আচরণ লাটিয়া আগেও করেছে। এরকম ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

লাটিয়ার স্বাভাবিকতাকে দৌলতি ভয় পেল।

পরমানন্দ এভাবে আরো অনেকবার এ-ঘরে ঢুকেছে।

ধর্ষিতা, উলঙ্গ হরিজন রমনীর অসহায় শরীরের দিকে একবারও না তাকিয়ে বলাৎকারীর সঙ্গে লেনদেন চুকিয়েছে। এ আচরণ ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

পরমানন্দের স্বাভাবিকতাকে দৌলতি ভয় পেল।

পরমানন্দ গালে সুপারি ফেলে বলল, রাম রাম লাটিয়াজী, কেমন ঠাণ্ডা বইছে কাল রাত থেকে দেখছেন?

আমি কেমন করে ঠাণ্ডার মালুম পাব, বুড়বক? ও হেকিমী ইলাজে এখন শরীর গরম। মাদী হাতিকে ভি ফেলে দিব। তুমি বদমাশ, শিকড়বাকড় খাইয়ে আমার মর্দানী নাশ করে দিচ্ছিলে।

লাটিয়াজী! অশ্বগন্ধা মূল আর কাঁচা দুধ রাতে খেলে মর্দানী বেড়ে যায়।

তোমার বাড়ুক শালা।

তা, কেমন হল? ঠিক মাল দিই নি?

তা দিয়েছ। দাও কামিজটা দাও।

একমুঠো নোট পরমানন্দের দিকে ছুড়ে, দিল লাটিয়া। বলল, রামপিয়ারীতে বল, এখন এ লেড়কি আমার থাকল। আমি ছাড়লে তবে গাহক আনবে।

হাঁ হাঁ লাটিয়াজী কেন নয়?

ওকে পাঠিয়ে দাও একে সাফসুতরা করুক, কামরা খুলে দিক। আমি ঘুমাব।

অপার অসীম ঔদ্ধত্যে লাটিয়া উলঙ্গ শরীরে হেঁটে চলে গেল দামী খদ্দেরের রিজার্ভ কামরায় ঘুমোতে। পরমানন্দ ওর জামাকাপড় নিয়ে গেল।

রামপিয়ারী ঘরে ঢুকল। নিশ্বাস ফেলে বলল ওঠ্ কাপড় জড়া। নাইবি চল্। তেদের বাপবাও। বলিহারি যাই।

এ জনোয়ার বলে, সাদী করব, সাদী করবে দুসাদ গঞ্জ ধোবি, চামার, পারহাইয়া মেয়েকে? ব্রাহ্মণ? যারা হরিজন পুড়ায়? কামিয়া করবে বলে ধরে আনে···কাপড়টা জড়া। আমি ধরছি তোকে। কামিয়া করবে বলে ধরে আনে···তোদের কামাই খাবে এখন··কাঁদছিস কেন? কাঁদিস না। আমাকেও তো ধরে এনেছিল একদিন···চল্ আমাকে ধরে ধরে চল্। পরে তোকে আরো শিখাব। বেরোতো তো পারবি না। কামিয়ৌতি এর নাম। আমার মত কৌশল করে বাঁচতে শিখাব। চল্, দাঁত তো মাজবি? আয়।

আরেকটি মেয়ে, আরেকটি মেয়ে—রামপিয়ারী বলল, রেওতী। সোমমী। একে দেখ্ তোরা। স্নান সারুক, সাফা হোক, খেতে দে কিছু। আমি বাজারে যাই। লাটিয়া থাকা মানে বহোত নাখারা। মাংস পরোটা খাবে।

দৌলতি অনেক চেষ্টায় বলল, এরা সবাই রেণ্ডি?

আরে তুইও তো রেণ্ডি এখন। রেণ্ডি হলেও হত। তোরা সবাই ওই পরমানন্দের কামিয়া।

এরা সবাই পরমানন্দের কামিয়া
দৌলতি আর রেংতী আর সোমনী
খেতমজুরি, মাটি কাটাই, কুয়া কাটাই কাজ
এ করে না, ও করে না, সে করে না —
মালিক এদের জমি বানিয়ে নিয়েছে
শরীরের জমি চষে চষে ফসল তোলে মালিক
ওরা সবাই পরমানন্দের কামিয়া ।।
ওরা সবাই কাদের যেন মাত —
হিমালয়ের পায়ের কাছে জৌন্‌সার-বাওয়ারে
কামিয়া তো বলে না, ওদের বলে মাত্‌—
তুল্‌সা আর বিম্‌লা আর কম্‌লা
কোল্‌তা মেয়েরা সব কাদের যেন মাত
খেতমজুরি, মাটি কাটাই কাজ
এ করে না, ও করে না, সে করে না—
মালিক ওদের জমি বানিয়ে নিয়েছে
শরীরের জমি চষে চষে ফসল তোলে মালিক
ওরা সবাই কাদের যেন মাত্‌ ।।

॥ ৫ ॥

অক্ষতযোনি হরিজন মেয়েটি প্রথম রাতের পর আর কুমারী থাকে না, লাটিয়ার আকর্ষণও নিমিষে ফুরায়। দৌলতির বেলা আকর্ষণটা তিনবছর থেকে গিয়েছিল।

প্রথম মাসেই দৌলতি ওয়াক তুলতে শুরু করেছিল, এ রামপিয়ারী, একে দাওয়াই দে।

দাওয়াই ?

আরো হেকিমী ইলাজে মর্দানা বাড়ে। আর এ ছুঁড়ি তো দেখছি সোমনীর চেয়েও ফল্‌ন। পেট বানিয়ে বসে আছে। দে দাওয়াই। উসিসে বহোত মজা উঠাতা, সব নষ্ট হয়ে যাবে।

হাঁ হাঁ হজোর। কিন্তু···

জানি জানি। তিন-চার দিন আসব না।

সাতদিন তো রেহাই দেবেন। নইলে···কলাবতীকে নিয়ে কত হাংগামা হয়েছিল। দৌলতিকে ওষুধ দিয়ে রামপিয়ারী বলল, তোর উপর মন খুব পড়ছে।

কার ?

লাটিয়াজীর।

কি পড়েছে ?

মন পড়েছে

মন ?

দৌলতি অত্যন্ত আশ্চর্য হল। প্রত্যহ যে কামার্ত জানোয়ারটি ওকে ছেঁড়েখোঁড়ে, তার মন আছে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। নইলে কার পেটে ও দুটো-তিনটে বাচ্চা দেয় নি ? যতগুলো মেয়ে আছে, সবগুলোকে বছর বছর···ওর তো তাগদ

খুব বেশি। রোজ অত অত মাংস আর ঘি খায়। তোকে সাতদিন রেহাইও দিল কলাবতীকে…

কি ?

রামপিয়ারী নিশ্বাস ফেলে বলল, কলাবতীর উপর খুব মন পড়েছিল। তাও দু'মাসেই পেট হল। ওষুধও দিলাম। কিন্তু ওষুধ ছিল কড়া। তিনদিনের দিন জলের মত রক্তস্রাব, আমি ছুটলাম কবিরাজের কাছে। এর মধ্যে লাটিয়া মদ খেয়ে বেহোঁশ হয়ে ঢুকে গেল কলাবতীর ঘরে।

তারপর ?

মরে গেল মেয়েটা। থানাপুলিসও হল। লাটিয়াজী টাকা দিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলল।

মরে গেল ?

হাঁ হাঁ। ভয় পাস না। সবাই কি মরে ?

দৌলতি বলল, ভয় তো পাই নি।

দৌলতি ভয় পাবে কেন ? এই যদি তার জীবন হয়, তাহলে এ-জীবন সে বেছে নেয় নি। কামিয়ৌতি প্রথা তার তৈরি নয়। যাদের কামিয়া করা হয়, তারা স্বেচ্ছায় হয় না।

অন্ধ্রের মাতাংগী, জাগ্‌গালি, মালাজাংগম, মাহার আর অন্যান্য জাতের মানুষ হয় গোঠী। বিহারের চামার, নাগেসিয়া, পারহাইয়া, দুসাদ হয় কামিয়া বা সেওকিয়া। গুজরাটের চালওয়াড়ী, নালিয়া, ঠোরি ও অন্যরা হয় হালপাতি। কর্ণাটকের অন্ত্যজরা জীথো হয়, মধ্যপ্রদেশে হয় হরোয়াহা। ওড়িশায় গোঠী আর রাজস্থানে সাগ্‌রি। তামিলনাডুর চেট্টি রায়তরা রাখে ভূমিদাস। উত্তরপ্রদেশে ভূমিদাসদের নাম মাত্‌ বা খাণ্ডিত্‌-মুণ্ডিত্‌ বা সঞ্জায়ত্‌। লাক্ষাদ্বীপের ভূমিদাসরা হল নাদাপু।

একেক অঞ্চলে একেক নাম।

প্রথাটি দাসপ্রথা।

অন্ত্যজ যারা, যারা হরিজন, তারাই এ প্রথার বলি।

স্বেচ্ছায় কে হয় দাস? হয় ঋণের দায়ে। যার জমি নেই, অথচ যে ভূমিজীবী, অথবা যে ছোট চাষী, সেই হয় দাস। স্বেচ্ছায় নয়, ঋণের দায়ে।

যে সমাজব্যবস্থা টেড়া নাগেসিয়াকে কামিয়া বানায়, সে তো পুরুষের তৈরি। তাই দৌলতিকে, সোমনীকে, রেওতীকে পুরুষের মাংসের ক্ষুধা মেটাতে হয়। নইলে পরমানন্দ টাকা পায় না।

দৌলতি ভয় পাবে কেন? সে বুঝে গেছে, এটাই স্বাভাবিক। এখন আর ওর ভয় নেই, দুঃখ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। এ ওষুধ খেয়েও তো ও মরতে পারত।

দৌলতি চালান হয় সোমনীর ঘরে। বড্ড বুড়িয়ে গেছে সোমনী তিরিশ বছর বয়েস না হতেই। এখন আর ওর গাহক আসে না। কালেভদ্রে আসে হাটুরে। সেও অবরেসবরে।

রোজগার পড়ে গেলে বেরিয়ে যেতে হয়। ছেলেপিলে এ জীবনেও জন্মায়। তাদের নিয়েই বেরোতে হয়। তবু সোম্‌নী খুব বুদ্ধিমতী। শরীর খরচ হয়ে গেলে সেও যাবে, তা ও জানে। তাই অন্যভাবে ও রামপিয়ারীর কাছে নিজেকে দরকারী করে তুলেছে।

বড়ই মুটিয়েছে রামপিয়ারী। সোম্‌নী ওর বাসন মাজে, রান্না করে, কাপড় কেচে দেয়, পরিচর্যা করে।

এগারোটি মেয়ে আছে এখন। যে-যার মত রেঁধে নিতে খুবই ব্যাগ্র। কিন্তু পরমানন্দের মত নেই। রামপিয়ারী রাঁধবে, ওদের খেতে দেবে।

পরমানন্দ ওদের রোজগারের পয়সা নিঃশেষে নিয়ে যায় প্রতি মাসে। এদের জামা-কাপড় বা তেল-সাবান বা ওষুধবিষুধ, কিছু বলে কিছু পয়সা এদের দেয় না। কখনো দিনে দশটা গাহকও আসে। আর মাধ্‌পুরাতে হপ্তায় দু-বার বসে মস্ত হাট, বছরে তিনটে মেলাও হয়। সেসব সময়ে দিনে তিরিশটা গাহক প্রতি মেয়ের ঘরেই ঢোকে।

গাহকরা পয়সা দেয় রামপিয়ারীকে। রামপিয়ারী সে পয়সা

নিঃশেষে গুণে দেয় পরমানন্দকে। পয়সায় কোন গোলমাল হবার উপায় নেই। পরমানন্দ বড়ই সেয়ানা।

রামপিয়ারীর হাতে পয়সা থাকে। ও নিজে, এই মেয়েদের ধার দেয় জামাকাপড় বা তেলসাবানের পয়সা। আর বাড়তি গাহক এনে সে পয়সা তুলে নেয়।

পরমানন্দ এটা জানে না। তার পাকা বসবাস মাধ্‌পুরাতেই। সে মেয়েদের বলে, মানুষের জামাকাপড় লাগে, তেলসাবান পান-তামাকের পয়সা লাগে তা কি আমি জানি না? ধার নাও, ধার নাও।

কামিয়ৌতি কারবারে, কামিয়ৌতি প্রথায়, এই ঋণব্যবস্থাই হল সর্বনিয়ন্ত্রা।

এ যদি দেশঘর হত, তাহলে কামিয়া যে ধার নেয় তা যোগ হত সেই আদি ঋণেব সঙ্গে—যে ঋণটি লোকটিকে কামিয়া বানিয়েছে।

এখানেও সেই আদি ঋণের সঙ্গে যোগ হয় পরবর্তী সকল ঋণ, আর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বেড়ে চলে। যেদিন কামিয়া-রেণ্ডিটি বিতাড়িত হয় এ বাড়ি থেকে, সেদিন সে ভিক্ষেসিক্ষে করে বা ঘুঁটে বেচে ঋণ শোধ করে।

সোম্‌নীর ঘরে পড়ে রইল দৌলতি সাতদিন। সোম্‌নী বলল, রামপিয়ারীও কামিয়া ছিল, কিন্তু এক সময়ে ওর এক ভালবাসার লোক জুটেছিল।

এখানে?

হাঁ হাঁ, এখানেই। সে লোক পরে বহোত ভোট পেয়ে মায়লে বনে যায়, আর হিসাব কষে রামপিয়ারীর কামিয়ৌতি ছুট্‌ করিয়ে দেয়।

তারপর?

রামপিয়ারীকে সে টাকা দিয়েছিল। দুশো টাকা। রামপিয়ারী সে টাকা নিয়ে চলে যেত। কিন্তু দেওতা বলল, তুই থাক্। এই বাড়ির দেখ্‌ভাল্ কর্।

তুই কোথা থেকে এসেছিস সোম্‌নী?

আমাকে এনেছিল বাঢ়া গ্রাম থেকে।

সাদী করবে বলেছিল?

কেন বলবে? আমার তো সাদী হয়েই গিয়েছিল।

সাদী হয়েছিল?

হাঁ হাঁ। আর আমার মরদও ঘরে আছে।

তুই এলি কি করে?

না এসে উপায়? মরদ তো ওর কাছে দুশো টাকা নিয়েছিল। জমি-জমা নেবে বলে। বাস্, এক বছরে তা হয়ে গেল চার হাজার টাকা। তখন দেওতা মরদকে বলল, শোধ তো করতে পারবি না, কামিয়া তুই। বউটাকে পাঠিয়ে দে। পাঁচ বছরে ধার শোধ হবে, বউ হাতে টাকা নিয়ে ঘরে ফিরবে। ছেলেটাকে স্বামীর কাছে রেখে আমি চলে এলাম।

সে ছেলে?

বাঢ়াতেই আছে। বাঢ়াতে দেওতার বহোত জমিজমা।

এখানে তোর ছেলে-মেয়ে-ক'টা?

তিনটা।

সোম্নী গালে হাত রেখে বলল, কি অবাক কাণ্ড মা। ছোটবেলা সাদী হয়েছিল, মরদের কাছে এতদিন থাকলাম। মোটে একটা ছেলে হল। আর লাটিয়া আমাকে পর পর তিনটা ছেলের মা বানিয়ে দিল?

সে ছেলেরা?

হাটতলায় পড়ে থাকে। ভিক্ষা করে। ছেলে নিয়ে থাকতে দেয় না, আর ছেলে হবার আগে আটমাস অবধি গাহক আসে। তারপর তিন মাস তো আর পারি না।

তখন?

ধার দেয় দেওতা।

কাছে রাখতে দেয় না?

না না, তাই দেয়? যখন মন পুড়ায়, গিয়ে দেখে আসি।

দেওতীর ছেলেটা তো লাটিয়ারই ছেলে। আর লাটিয়ার লরীতে ধাক্কা খেয়েই লেংড়া হয়ে আছে। লেংড়া বলে ভিক্ষা বেশি পায়। একটা জামাও পেয়েছিল।

তুই কতদিন থাকবি ?

কি জানি। যতদিন দেওতার দয়া হয়।

তারপর ?

তারপর ভিক্ষা করব। শরীরে কিছু নেই আর। আর কি খাটতে পারব। চার-পাঁচ বছর ধরে তিরিশটা করে গাহক রোজ রোজ, ভিক্ষা করব।

গ্রামে ফিরবি না ?

কি করে ফিবব ? মবদ তো আবেকটা বউ এনে নিয়েছে আর তারা দুজনেই দেওতার কামিয়া। আমি যদি ফিরি, এ ছেলেগুলো যাবে কোথা ? মবদ কেন লাটিয়ার ছেলে পুষবে ? খেতে বা দেবে কি ? দেশেঘরে কি খাবার থাকে ?

না।

দৌলতি মাথা নাড়ল। তারপর বলল শহরের মানুষ বেশি খায়, বার বার খায়।

আমাব খুব ইচ্ছে করে বাঢ়া যেতে।

চলে যা না।

দেওতা তো খেতেও দেয় না পেটভরে। ভালো করে খেলে শরীরে তাগদ থাকত হয়তো।

তোর মরদ বউ এনে নিল কেন ?

না এনে বা কি কববে ? ঘরের কাজ থাকে। একা খেটে খেটে পারবে কেন ? ছেলেটাও তো, যাকে বলে হাবা তাই। তেমনি শাহানদার বুদ্ধিমান তো নয়।

সতীন মারে না ?

মারে না ? খুব মারে।

সোম্‌নী অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল। তারপর বলল,

তোর উপর লাটিয়ার এখনো মন আছে, কতদিন থাকবে কে জানে। টাকা তো ও রামপিয়ারীকেই দেবে। কিন্তু ওর অনেক টাকা। ঠিকাদার মানুষ ও। দু-এক টাকা চেয়ে নিবি। গাহকের কাছ থেকে আলাদা টাকা নিয়ে সরিয়ে রাখবি। টাকা, চাই পয়সা।

কেন?

নইলে আমার হাল হবে।

তিরিশ বছরের মেয়ে সোমনী, সত্তর বছরের ডাইনি বুড়ির মত বিস্বর খনখনে গলায় হাসল। বলল, মরদের ছেলেকে সতীন ঠেঙায়, গাহকের ছেলেরা ভিক্ষে করে, একটা পয়সা নেই।

তুই পয়সা রাখিস নি সরিয়ে।

রাখতাম তো? লাটিয়ার ছেলেগুলোকে খাওয়াতে গিয়ে সব খতম হল। এখন ভিখিরিরও অধম?

দৌলতি চোখ বুজল। সোমনীর ঘরে শুয়ে ওর যখন তখন ঘুম আসে। ঘুমঘুম গলায় বলল, কামিয়ৌতি কি আগে ছিল? এখন ঘরে ঘরে কামিয়া?

কামিয়া তো রাখে মালিক লোক। রাখবে না বা কেন? ক্ষেতী, বাগিচা, সব তো ওদের। কামিয়া রাখো, লুকমা দিয়ে কাজ উঠাও। ওদের তো গোরমেন।

বাইরে এত চেঁচামেচি কেন? কিসের জমায়েত?

কে জানে?

রামপিয়ারীর সুদের সাম্রাজ্য এ বাড়ির বাইরেও বিস্তৃত। মাধুপুরা টইল দিয়ে ও সুদ তুলে বেড়ায়। এখন ও ফিরল, আর বাজার নামিয়ে রেখে বলল, লড়াইয়ের জমায়েত।

কিসের লড়াই?

আমি জানি?

সোমনী বলল, মৌসি, চল না শুনে আসি।

তুই যাবি কি?

যাব না কেন? এ তো তামাশা

ঘরে রাঁধবে কে ?

এসে রেঁধে ফেলব।

হাটের দিন আজ।

আমার তাতে কি ?

যা তবে, আমি জিবোই খানিক।

জমায়েতে গিয়ে সোম্‌নী খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরল। না না, এ মোটেই ভালো তামাশা নয়।

আরে লড়াইটা কিসেব ?

কা জানে ? কে চীনা, তার সঙ্গে লড়াই।

কার ?

কে না কি ভারত, তাব। আমি তো বুঝলাম না কিছু। হাটতলায় খুব চেঁচাচ্ছে। চীনাকেও চিনি না, ভারতকেও চিনি না। দুজনে লডাই হলে আমি কি করব ?

রামপিয়ারী বলল, লাটিয়াকে দেখলি ?

সে তো বেশি চেঁচাচ্ছে।

ওসব ঠিকাদার লোকদের লড়াই। নে, চা বানা একটু। তোরা খা, আমাকে দে।

লডাই হলে নাকি খুব মাহাঙ্গা হবে জিনিস।

হোক্ গে। চা বানা।

কার্যকালে দৌলতি সাতদিনেব চেয়ে বেশি ছুটিই পেয়ে যায়। কেন না লাটিয়া একমাত্র লোক, যার বহু লরি আছে। লরিতে চেপেই কংগ্রেসী অঞ্চলনেতারা চীনের ভারত আক্রমণকে গাল পেড়ে বেড়ায় সর্বত্র। লাটিয়া, সরকারের অতীব বিশ্বাসভাজন এক ঠিকাদার। কুরুডা, সেইল, কোরা, রোহিনী, অঞ্চলের ছোট ছোট নদীগুলির ওপর সে যত ব্রিজ বানিয়েছে, সবগুলিই বার দুয়েক ধ্বসে পড়েছে।

লাটিয়া টাকা নিয়ে অকুস্থল ত্যাগ করে এবং শেষ পর্যন্ত অন্য ঠিকাদার সেতু বাঁধে।

একই নীতিতে সে রাস্তা তৈরি করে, বনবিভাগের আপিস

বাড়িগুলি। তাকে চুরির দায়ে, সরকারী টাকা তছনছ করার দায়ে এ পর্যন্ত কেউ অভিযুক্ত করতে পাবে নি।

জনৈক জেলা হাকিম নাচার হয়ে বলেছিলেন, এমন প্রতিভা নিয়ে জঙ্গলে পড়ে আছেন কেন? শহরে যান।

লাটিয়া বলেছিল, কি যে বলেন! জংলা জায়গায় সবটুকুই লাভ। আদিবাসী আর হরিজন সেবার শস্তা কত?

এই লাটিয়া লরি দেয় এবং নিজেও বক্তৃতা করে। হেঁকে বলে, যার যা অছে দিয়ে যাও এই চাদরে।

কেন হুজৌর?

লড়াই চলছে না?

কই, আমি তো জানি না।

তুমি আর জানবেও না শালা বুড়বক। চীন এসে ভারতকে সত্যনাশ করে দিচ্ছে।

হাঁ হাঁ? কিন্তু কোথায় চীন? ভারত বা কেথায়?

মায়লে বা এম, এল, এ, বলেন, এ দেশ তো ভারত।

না না, মাধুপুরা।

তবে রে! মায়লে বাবুর উপর কথা?

লাটিয়া হাতে খেঁটে নিয়ে জনসমুদ্রে ঝাঁপ দেয় ও জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়।

তারপর আবার চলে আসে লাটিয়া দৌলতির ঘরে। সঙ্গে থাকে আরো দুজন লোক। সরকারী অফিসার। সরকারী অফিসারদের তৈলনিষিক্ত না রাখলে লাটিয়ার ঠিকাদারী মেলে না। এমন সব জংলা জায়গায় অফিসারদের খুশি করা বড়ই কঠিন। সবাই মদ খায় না, সবাই রামপিয়ারীর বাড়ীতে আসতেও চায় না।

এ দুজন ছোকরা, এখনো বিয়ে করে নি।

লাটিয়া বলে, আজ আপনাদের বহোত্ মজা দেখাব। আপনারা ভাবেন, যত মজা সব শহরে।

দৌলতি, রেওতি, গোহুমনি বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ ছিল। পরমানন্দ

সকালেই এসে বলে গেছে, যা বলবে তাই করবি। দু-টাকার গাহক নয়, এর নাম লাটিয়াজী।

মাংস আর পরটা হয়েছে, মদ এসেছে রাঁচি থেকে। তিনটি মেয়েকেই ঘষেমেজে স্নান করতে হয়েছে।

লাটিয়া বলল, এঃ! রামপিয়ারী?

হুজৌর!

এ কি? সব ঠিকঠাক নেই কেন?

এখনি হবে হুজৌর।

রামপিয়ারী ফিশফিশ করে বলল, রেওতী আর গোহুমনি তো হুজোর, ছেলের মা। বাবুরা একটু নেশা করে নিলে ভাল হত না? ওদের শরীর তো টসকে গেছে।

তা বটে।

দৌলতির মত তাজা তো নেই ওরা।

দে বোতল দে।

একটি বড় বোতল শেষ হবার পর তিনটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ তারা। রেওতী ও গোহুমনি বাবুদের কোলে বসল। লাটিয়া দৌলতিকে কোলে বসিয়ে চটকাতে চটকাতে সগর্বে বলল, হরিজন এরা। মেহনত করে, শরীর তাজা রাখে।

বাঃ, বাঃ!

শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। আরে আমাকে দেখুন না।

তিনটি উলঙ্গ মেয়ে এবং লাটিয়ারাও দিগম্বর। "যা বলবে তাই করবি" দেওতার নির্দেশ। তাই গোহুমনি ছ্যাঁকা খেতে থাকে সিগারেটের। উন্মত্ত হয়ে ওরা এদের মাংস খায়। একটা পর্যায়ে বাবুরা ঘুমিয়ে পড়ে। রেওতী ও গোহুমনির ছুটি মেলে। দৌলতির ছুটি হয় না। চলে, চলতে থাকে।

ভোরের দিকে দৌলতি বলে, হুজৌর!

বল্। -

আমকে···আলাদা করে কিছু দিবেন?

দেব না কেন? দেব।

একটা টাকা দিল লাটিয়া, কিন্তু সকালে বলল, রামপিয়ারী! এ নাগেসিয়া মেয়ের বুদ্ধি গজিয়েছে। টাকা চায় আলাদা করে। শুনেছিস?

রামপিয়ারী বিরস মুখে বলল, কি করে হুজৌর? শহরের বাতাস এদের গায়ে লেগে যায়।

পরমানন্দ মক্ষিচোষ তো। এদের কিছু দেয় না।

না না হুজৌর কাপড়লত্তা, তেলসাবান, যা দরকার সেজন্যে ধার দেয় বই কি।

ধার দেয়? ধার?

লাটিয়া হো হো করে হেসে উঠল। বলল, বুদ্ধি তো খুব। কামিয়াদের রেণ্ডি-কাজের পয়সা নেবে, এক পয়সা দেবে না আর যা ধার দেবে তা পহেলা ধারের হিসাবে জুড়ে দেবে। এই জন্যে তোদের মেয়েগুলো কাঠের মত শুকিয়ে যায়। কিন্তু খবরদার! দৌলতির সঙ্গে কোন খচড়াই করবি না।

না না হুজৌর, তাই করি?

একদিন লাটিয়া একটা পাঁচ টাকার নোটই দিল। সাধারণত ও খুচরো পয়সা ছাড়া কিছু দেয় না। দোলতি একটা কৌটায় পয়সা জমাচ্ছে। কৌটোটা ও মেঝেতে পুঁতে রাখে।

এর মধ্যেই এল বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা। এ অঞ্চলে এই মেলাটি নামী মেলা। এক সময়ে সব জায়গাগুলিই ছিল নওয়তনগড়ের রাজাদেয় দখলে। মেলার প্রবর্তনও রাজারাই করে। একসময়ে মেলাতে রাজার প্রতিনিধি হিসেবে পালকি চেপে আসত একজোড়া তরোয়াল। তরোয়াল দুটিকে রাখা হত উঁচু বেদীতে। মেলায় আগন্তুক প্রতিটি মানুষ সেই তরোয়ালের সামনের পিতলের থালায় নজরানা রাখত। এই পয়সায় নৃপবর দেওয়ালীতে জুয়া খেলতেন।

মেলা চলে তিনদিন। এ তিনদিন পরমানন্দ মেলার মাঠে

কয়েকখানা ঘর তোলে এবং মেয়েদের ঘরে গড়ে চল্লিশটি করে গাহক আনে। মেলার সময়ে ও সোম্‌নীকে গাল পাড়ে।

পরমানন্দ খেতেমাখতে দেয় নি, লাটিয়া পর পর ওর গর্ভাধান করেছে। তা বলে শরীরটা ছিবড়ে করে তোলা কি সোম্‌নীর ঠিক হয়েছে? একেক গাহক পাঁচ টাকা অবধি দেয়। সোম্‌নী চালু থাকলে তিন দিনে কোন ছয়শো পেত পরমানন্দ?

পরমানন্দ খেপে গিয়ে বলল, মাত্র নটা মেয়ে চালু আছে। দৌলতি তো লাটিয়াজীর মাল এখন। তাকে পাব না, তোকেও পাব না। দেখ্ সোম্‌নী তোর মরদ যে একশো টাকা নিয়েছিল, সাত বছরে তা অনেক হয়েছে। হিসেব করে দেব। ধার শোধ করে বেরো তুই।

রামপিয়ারী বলল, আহা-আহা কি বুদ্ধি তোমার!

বুদ্ধি কি তোর একার আছে?

পয়সার লালচে যে সব জ্ঞানগম্যি গুলে খেয়ছ তুমি। বলি, ভেবে দেখেছ? আমি থাকব মেলায়। দৌলতি কি একা থাকবে? সোমনি ঘরে না থাকলে ঘর দেখবে কে?

তুই এসে দেখে যাবি।

বয়ে গেছে। আমি পারব না।

মেলা দেখবে বলে দৌলতির মন নেচে উঠল। গোহুমনি বলল, যা দেখ। আমাদের সময়ে আমরাও দেখেছি।

গোহুমনির মন খুব খারাপ। ওর গাঁ সুবাদে ভাই মাসে একবার মাধপুরা আসে মালিকের কাজে। সে খবর দিয়েছে, গাহকদের কাছে পয়সা চেয়েচিন্তে স্বামীকে যে ছাগলটা কিনে দিয়েছিল, সেটাকে সাপে কেটেছে। এ কি অবিচার ভগবানের?

গোহুমনি চোখ মুছে বলল, কামিয়ারেণ্ডি আমি, গতর শুকোলে লাথি তো খাবই। তখন ঘরে গিয়ে ছাগলটা থাকলে বাচ্চা বেচতাম, দুধ বেচতাম, বড় আশা করেছিলাম।

রেওতী বলল, মেলা হয় কেন ? একটার পর একটা গাহক ঢুকায় ঘরে, একটু জল খেতে সময় দেয় না।

রামপিয়ারী ওদের নিয়ে যাবে। যাবার আগে এক কাণ্ডই হল। ঝালো মেয়েরা কথা বলে খুব কম। বেশ লম্বা-চওড়া মেয়ে হাড়ের কাঠামো মজবুত।

মেলায় বেরোবার আগে ঠিক ঝালো এসে দাওয়ায় বসল বিড়ি ধরাল, সোমনীকে বলল, আমিও যাব। নিয়ে চল তুই আমার আটা, বানিয়ে নে লেট্টি।

রামপিয়ারী বলল, এ কি কথা ঝালো।

শুনতে তো পেলে।

শুনলাম তো কথাটা কি ?

দৌলতি বুঝল রামপিয়ারীর গলার স্বর যথেষ্ট নরম। যেন একটু তোশামোদের ভাবও আছে।

কথাটা তুমি জান না ?

সে তো আমার তোর কথা।

না, সাফ কবুল কর।

সোমনি এখন ন্যাকা সেজে বলল না মাসি। তুমি তো জান, দেরি হলে দেওতা কত ঝামেলা করবে। তাড়াতাড়ি বল না।

রামপিয়ারী বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস ফেলল। বলল, তাই হবে। নে চল্।

ঝালো ক্ষমাহীন। রুক্ষ গলায় ও বলল, সবার সামনে কবুল কর তোমাকে আমি চিনি। তোমার সঙ্গে সাফ কথা না হলে-কি গোহুমনি চুপ করে আছিস কেন ?

গোহুমনি বলল, বলে মার খাব আবার ?

ঝালো বলল, মারুক আমাকে ? মেরে দেখুক। এই ঘরে বসে মন্তর পড়ে দিব, মৌসি না ভঁইসীর তেরাত্তির কাটবে না। গলায় রক্ত উঠে মরবে।

রামপিয়ারী হঠাৎ সকাতরে বলল, না না ঝালো। কবুল করছি

আমি কবুল করছি না। হায় রাম! এ কি বিপদে ফেললে আমায়? এ আমার কি হল?

ঝালো গলায় বিষ ঢেলে বলল, বহোত খারাপ লাগছে তাই নয়? আর তুমি যে এতকাল ধরে একটা-দুটো গাহকের পয়সা নিজে মার মেলা থেকে? "হায় রাম" বলছ?

দেওতার সঙ্গে বেইমানি করব?

বেইমানি তো তুমি সকাল থেকে রাত অবধি একশোটা কর। ভোচকী মাগী, ভঁইসী কোথাকার?

হায় রাম!—রামপিয়ারী প্রায় কেঁদে ফেলল। প্রবল আবেগে ওর পর্বতপ্রমাণ মাংসস্তূপ কাঁপতে লাগল থলথল করে হাতে গালে, পেটে। তারপর ও বলল বাণমারা করিস না আমাকে। আমি তো এত মোটা ছিলাম না, বাণ মেরে কে এ দশা কবল। কবুল যাচ্ছি আমি মেলার তিনদিনে পাঁচটা গাহক ঝালোর একার। সে কামাই আমি জানতে যাব না, নিতে যাব না।

কেন?

আমরা কি দোষ করলাম?

আমরা বাদ যাব কেন?

রামপিয়ারী কি বলতে যাচ্ছিল, ঢুকে পড়ল কিষণচাঁদ। হেসে বলল, বাঃ বাঃ বাহা রে! কামিয়া রেণ্ডিয়া কি ইউনিয়ান বানিয়ে ফেলল?

রামপিয়ারী দেঁতো হেসে বলল, কিষণবাবু! মেলায় যাও নি এখানে কেন?

এমনি চা খেতে এলাম।

সোমনী মোড়া দে বসতে। চা বানিয়ে দে। চল চল রে মেয়েরা। তোদের আমি আছি, আমার তোরা আছিস ঝুট ঝামেলা করিস কেন? আমাকে কেন? আমাকে কেন বিপদে ফেলিস? আমি তো তোদের জন্যে কম করি না।

ঝালো বলল হাঁ হাঁ অনেক কর। তাতেই কলাবতীটা খুন

হয়ে গেল। যখন তার বাপ এসে বসে-বসে ফিরে গেল, একটা টাকা তার বাপকে দিলে না। তুমি তোমার দেওতা, আর কে কে তা তুমিই জান। চল এখন।

কিষণ বলল আরে ঝালোয়া? না শহর গেলি, না পরমানন্দ হল মালিক, এ হাবেলি হল কারখানা। রামপিয়ারী হল পরমানন্দের ওবরসিয়র আর তোরা সবাই লেবার।

আবার ওইসব হিজিবিজি কথা?

ধানবাদে গেলে বুঝতিস।

বুঝেছি, এখন নয়জন আমরা কিছু কিছু দিয়ে দাও তো মেলায় খরচ করব তোমার নামও করব।

হাঁ হাঁ নামটা করিস।

কিষণবাবু সকলকে একটা করে টাকা দিল। রামপিয়ারী, দৌলতি আর সোমনীকেও। তারপর বলল, মেলায় তোদের সকলকে নিয়ে নাগরদোলা চড়ব।

ওরা মেলায় চলে গেল। যাবার আগে রামপিয়ারী বলল, বেশিক্ষণ বোস না কিষণবাবু, দেওতা রাগ করবে।

না না দেওতা এখন পদ্মশ্রী হতে চলেছে, আর মেলাতে ঘুরপাক খাচ্ছে, মেয়ে খুঁজছে।

আমি চললাম।

কিষণ চা খেল, সোমনী বলল সে কথাটার কি হল হজৌর?

কোন কথাটা?

ছেলেগুলোকে মিশনে দেবে বলেছিল? মিশনে!

কিষণ কি ভাবল তারপর বলল, আকাল তো আসছে। তিনটা ছেলেকে নিয়ে মিশনের দরজায় বসিয়ে দিবি, বাস।

বাপ রে! ওরা তাড়িয়ে দেবে না?

ওরা তাড়ায় না। ঠিক রেখে দেবে।

দৌলতির সঙ্গে একটা কথাও বলল না কিষণ। ও চলে গেলে সোমনী বলল, ও বাবা! লাটিয়াকে ভয় পায় না কে? লাটিয়া

তোর গাহক বলে ও কোন কথা বলল না। এখন আর ও মেয়ে ভাঙায় না। আগে চেষ্টা করত।

দৌলতি বলল, ভাঙাবে? কেমন করে? কামিয়া মেয়েমানুষ কি চলে যেতে পারে?

কখনো পারে না।

ঝালোর কথা মৌসি মেনে নিল কেন?

ও বাবা! ঝালো যে মন্তর জানে। বাণ মারতে জানে, ব্যথা বিষ হলে গা ঝেড়ে দেয়, গুণী মানুষ।

এত জেনে কামিয়া রেণ্ডি?

কামিয়া রেণ্ডি তো আছেই ঝালো কথা বলে না।

না ওর বুদ্ধিও বেশি। এখানে এল আর ওষুধ করে নিল। ওর কোন ছেলে মেয়ে হয় নি এখানে, দেশে ওর স্বামী আছে মেয়ের বিয়ে দেবে। ঝালো তাই টাকা জমায়। ওর এক কথা স্বামী কামিয়া, আমি কামিয়া, কিন্তু ছেলে মেয়েকে কামিয়া হতে দেব না। আর ওর কাছে মৌসিও জব্দ থাকে।

তোর ছেলেরা কি মিশনে যাবে?

কে জানে? আমি তো বলি, যদি বেঁচে যায় তবে দিব কামিয়া করে দেওতার। লুকমা তো খেতে পাবে।

আমরা মেলা দেখব না?

একবার যাব।

কার্যকালে সোমনীর যাওয়া হয় নি দৌলতিরও হয় নি। মেলার পর ওরা যখন ফিরল তখন সোমনী আর দৌলতি গিয়েছিল ভাঙা মেলা দেখতে। কত যে দোকানপাট বসেছিল, কিছুই ওদের দেখা হল না। ভাঙা মেলায় সোমনীর ছেলেগুলো চায়ের দোকানের ভাঙা মাটির ভাঁড় আর শালপাতার ঠোঙা হাঁটকে হাঁটকে খাবার খুঁজছিল। দৌলতি সোমনীকে বলল, ওদের ডবল রুটি কিনে দে। এই নে পয়সা। আমি একটু ঘুরে-ফিরে দেখি।

মাথায় ফেটা বাঁধা একটি পাকানো চেহারার প্রৌঢ় চা খাচ্ছিল একটা দোকানে। তাকে দেখে দৌলতির বুকের নিচে ধড়াস করে উঠল। বনো! বনো নাগেসিয়া!

বনো চাচা!

দৌলতি?

হাঁ বনো চাচা।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল দৌলতি, ডুকরে কেঁদে উঠল। কোন রেণ্ডির মত নয় ঠিক যে কোন দেহাতী মেয়ের মত। শ্বশুরাল থেকে মেলা দেখতে এসে বাপের বাড়ির মানুষ দেখলে দেহাতী মেয়েরা আগে তো কেঁদে নেয়। তাই হল নিয়ম। না কাঁদলে সবাই যে নিন্দে করবে শ্বশুরালে এত সুখে আছ, যে বাপের বাড়ির কথা তোমার মনেই পড়ে না? নিয়মের কারণেও কাঁদে, আবেগেও কাঁদে, দৌলতি কাঁদল আবেগে।

বোস শান্ত হ। মেলাতে এসেছি আর তোকে খুঁজেছি কত। কই মেলা দেখতে আসিস নি?

না চাচা।

আমি তো জানি সব। তোর বাবা তোহ্‌রিতে এসেছিল হাসপাতালে দেখাতে। তার কাছে জেনেছি।

বাবা ভাল আছে? মা ভাল আছে?

যেমন থাকে। চাট্টি বুনছে, লাকড়ি গুড়াবার পোরমিট নেবে এবার। তা তুই এসেছিস সে তো ছ-মাস হয়ে গেল।

হাঁ চাচা।

এই দেখ্‌ ধানোকে।

বাপ্‌ রে, ধানো কত বড় হয়েছে।

ও মেলায় দোকান দিয়েছিল। পানের দোকান। ধানো তো এখন লাতেহারে পান দোকান করে।

বিয়ে করেছে?

হ্যাঁ বিয়েও করেছে।

তুমি কি করছ ?

কাজ দৌলতি, মিশনের ফাদার বমফুলারের সঙ্গে ঘুরছি।

তুমি মিশনে ঢুকেছ চাচা ?

না না। এই ফাদার খুব ঘুরছে পলামুতে আর কোথায় সেওকিয়া কোথায় কামিয়া, সব হিসাব নিচ্ছে।

কেন ? কামিয়া রাখবে ?

না না, কামিয়েৌতি বন্ধ করতে বলবে গোরমেনকে। আর এ হল মোহন শ্রীবাস্তব। তোহ্‌রিতে ইস্কুলে মাষ্টার। এও ফাদারকে মদত দিচ্ছে।

তুমি কি কর ?

কামিয়ার হিসাব কামিয়া জানে। আর সেপরা থেকে বেরোবার আগে জানি নাই রে কামিয়া সমাজটা আমাদের কত বড়। কত কত কামিয়া রে চিরোয়া, চাতকপুরে, রামকাণ্ডা, দাহো, পালদা, চন্দোয়া, বানারি কত বলি ? ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম ফাদারের সাথে। ওঃ, আগে জানতাম না কত বড় সমাজ আমার।

কর কি তুমি ?

কথা বলি। সাহেব দেখে, বাবু দেখে বহোত ভারি ডর খায় কামিয়ারা—মালিক কি বলবে তা ভেবে ডরায়। আমি কথা বলি সাহেব লিখে। তাছাড়া জল আনি, রান্না করি।

এতে কি হবে

কামিয়েৌতি উঠায়ে দিবে গোরমেন।

তা কি হয় ?

কি হয়, দেখি। একথা তো আমি বলছি সাহেবকে। সাহেব! গোরমেন কামিয়েৌতি উঠালে বা কি হবে ? জমি নাই, খাবার নাই, পেটের লেগে আবার কামিয়া বনে যাবে সমাজের মানুষরা। সাহেব মাথা নাড়ে, বলে ঠিক কথা। এই তো চলছে, দেখা যাক ;

কামিয়েৌতি উঠে যাবে যেদিন, সেদিন সুরজ উঠবে পছিমে, আর নদী বইবে উল্টা সোঁতে।

তোদের কথাও বলেছি।

কি বলেছ, অ বনো চাচা ?

কামিয়া রেণ্ডি বেওসার কথা।

বলে কি লাভ হল ?

দৌলতি কৌতুকের সুরেই বলল। ও তো বুঝেছে, বনো চাচা একটা নতুন খেয়ালে মেতেছে আর ও তালে তাল দিচ্ছে বই তো নয়। চেনা মানুষ দেখে বুকের নিচে ঝড় বইছে, তা কি বনো চাচা জানে ? ধানো সব শুনেছে। ধানোর সঙ্গে দৌলতির বিয়ে হবার কথা ছিল না ? সেতরাতে থাকলে ঠিকই বিয়ে হত। বনো চাচা হল আপন খেয়ালের মানুষ। কামিয়া ও কিন্তু মুনাবরকে বোকা বানিয়ে চলে তো গিয়েছিল মুক্ত জীবনে।

গনোরি তা পারে নি। মুনাবরের হুকুমে বলদের জোয়াল কাঁধে নিয়ে গাড়ি টানতে গিয়ে পড়েছিল মুখ থুবড়ে। শরীর ভেঙেচুরে নাম হল টেড়া। আর টেড়ার কামিয়ৌতির জোয়াল কাঁধে নিয়েছে দৌলতি। এখন লাটিয়া ওর গাহক, শরীরে বাঁধুনি আছে। তারপর নামতে নামতে দৌলতি সোমনীদের মতই কঙ্কালসার হবে। ভিখমাঙনি হয়ে কামিয়ৌতি ধার শুধবে।

কিন্তু বনো চাচা কি বলছে ?

তোদের সুরাহা হবে।

কি হবে ?

খালাস পাবি।

দৌলতি মাথা নাড়ল। বলল, বনো চাচা। কামিয়া মেয়ে রেণ্ডি বনলে মালিকের কত লাভ থাকে। কাপড় দেয় না, তেলসাবান দেয় না, ওষুধ দেয় না। সব কিছুর জন্যে ধার নিতে হয় আর সব ধার সেই পহেলা বারের সঙ্গে জুড়ে দেয় মালিক। জীবনেও সে ধার শোধ করতে পারে না কোনো রেণ্ডি।

কামাইয়ের সময় ফুরালে ?

লাথ মেরে বের করে দেয়। ভিক্ষা করে সুদের টাকা দাও। এমন লাভের ব্যবসা কে ছাড়ে?

এ বন্ধ করতে হবে।

কে বন্ধ করবে? বড় ঠিকাদার, সরকারী অফসর, সবাই আসে। সবাই মদত দেয় দেওতাকে।

তবু এ বেআইনী।

যারা আইন করে, তারা আসে কেন তবে?

সোম্‌নী ওকে ডাকল। দৌলতি বলল, আমি যাই চাচা। সেওয়াতে তো তুমি যাও না। তোহুরিতে দেখা হলে বাবাকে আমার কথা বোল। নিশ্চয় বোল।

মোহন শ্রীবাস্তব বলল, বহিনজী, শোন।

আমাকে বললেন, হুজৌর?

"হুজৌর" বোল না। তোমাকেই বলছি। এবানে থাক কোথায়? বাড়িটা কোথায় তোমাদের?

রামপিয়ারীর হাবেলি। আমি যাই চাচা। আবার এলে যেন দেখা পাই।

ও মেয়েটা কে? ও বাচ্চাগুলো?

ও সোম্‌নী, আমার মতই কামিয়া রেণ্ডি, ওগুলো ওরই বাচ্চা, নিয়ে থাকতে তো দেয় না, তাই বেরিয়ে এসে দেখা করে ওদের সঙ্গে। খুব দুঃখ গো, খুব দুঃখ। আমি যাই ধানো। শিবরাত্রির মেলায় এসো, বউকে এনো।

দৌলতি চলে গেল। মোহন শ্রীবাস্তব বলল, তোমার গ্রামের মেয়ে বনো?

হাঁ মোহনজী।

গ্রামে থাকলে মালিকেরা কামিয়া, এখনো রেণ্ডি কাজ করে মালিককে পয়সা দেবে?

তার চেয়েও খারাপ।

বনো চোখ মুছল। চোখ লাল হয়ে উঠেছে ওর। বলল, বাবু

লোক আপনি ভাল লোক, তবু বুঝবেন কি ? আমাদের মেয়েদের ইজ্জত মালিক দু:বেলা কেড়ে নিতে পারে, কুমারী কি বউ কি মা, কিছু পরোয়া করে না। তাদের বাচ্চা পেটে ধরতে হয়। আর কামিয়া মেয়ে এনে রেণ্ডি করে রেখেছে। কে রেখেছে ? এক ব্রাহ্মণ। রেণ্ডির ছেলে হলে সে ছেলে পথে ঘুরবে। আর রেণ্ডি পয়সা দিয়ে চলবে মালিককে।

কামিয়ৌতি খতম হলে সব খতম হবে।

খতম হবে কামিয়ৌতি ?

চেষ্টা চালাতে হবে।

ধানো গভীর বিশ্বাসে বলল, কেমন করে তা হবে বাবুজী ? কামিয়া রাখে মালিক মহাজন মানুষ। গোরমেন মালিক মহাজনকে চটাবে ? কক্ষনো চটাবে না। জমি কেড়ে নিয়ে, জোর করে এমন অবস্থা করে, ধার করতে হয় আর কামিয়া বনে যাই। সে সব জমি মালিক নিজের নামে লিখায়। আর গোরমেনের কেরানী-আমলা মালিক-মহাজনকে সে কাজে মদত তো দেয়। এ যতদিন চলবে ততদিন কামিয়ৌতি কেমন করে খতম হবে ?

ধানো বলল, মোহনজী ! চাষের জমি পেটে খেতে দানা মিলে না, মানুষ তো কামিয়া ভুখের জন্যে হয়।

না না ধানো, আমরা তো এই কাজ করছি। বিয়ের জন্যে, শ্রাদ্ধের জন্যে পালপরবের জন্যে ধার নিয়ে সব কামিয়া হয়ে যায়। খাতায় লেখা আছে।

বনো বলল, ও কথা সত্যি বটে, ঝুটাও বটে। হাঁ, তুমি দেখছ বাবু, বিয়ের জন্যে ভিখারী সুদাস আশি টাকা ধার নিয়ে লালচাঁদ বানিয়ার কামিয়া বনল। কিন্তু বিয়ে আর পালপরব তো জীবনে থাকেই। সে জন্যে কে ধার করে ? যার জমি নেই, কোন সহায়-সম্বল নেই, সে ধার করে। জমি নেই কেন ? কেন থাকে না ফুটো পয়সা ঘরে ?

দাঁড়াও, কি বললে ?

জমি যার নেই, ঘরে নেই ফুটো পয়সা, সেই একটা সমাজের কাজ পড়লে ধার নেয়। আরে আমি জানি না? আমার বাবার ছিল না পাঁচ বিঘা জমি? সে জমি নিয়ে নিল মুনাবর তবে না বাবা কামিয়া বনেছিল আর আমার ঘাড়ে মরার সময় রেখে গেল কামিয়ৌতি। আমরা যখন ধার নিই, তখন একশো টাকা এক পুরুষে দশ হাজার টাকা হয়ে দাঁড়ায়। গোরমেন জানে না? তুমি বলছ জানে না।

জানতে হবে।

দেখ, কি করতে পার। তোমরা বুঝ অঙ্কের হিসাব, অঙ্কের হিসাব লেখ আর আমি দেখছি আমার সমাজের মেয়ে দৌলতি রেণ্ডি হয়ে ব্রাহ্মণকে টাকা দিচ্ছে। ওকে বের করে আনা যায় না?

না বনো। সে জন্য অনেক দিন ধরে অনেক কাজ করা দরকার। সবার আগে কামিয়ৌতি বন্ধ করা দরকার।

ধানো বলল, কামিয়ৌতি এরকম করে বন্ধ করা যাবে না। ধনী লোকরা কামিয়া রাখে আর গোরমেন তো ধনী লোকের। আমাদের কথা কে ভাবে?

না ধানো, গরমেন সকলের।

ও সব কথা আমি তোমার কাছে বহোত শুনি বাবু, কিন্তু ও কথা সত্যি নয়।

বনো বলল, তোহ্‌রিতে যাই যদি হরিজন সেবা সংঘের প্রসাদ মাহাতোকেও বলব।

প্রসাদ মাহাতো! ও তো সোসালিস্ট।

সে আমি জানি? ও নিজে হরিজন, আর ওদের সংঘ থেকে অনেক কাজ করে।

ধানো বলল, প্রসাদ মাহাতো বা কি করবে বাবা? তোহ্‌রিতে তো আছে রেণ্ডিহাবেলি।

রেণ্ডিপট্টি কোথায় নেই? কিন্তু কামিয়া ধরে এনে রেণ্ডি বানিয়ে রাখা আর কোথায় চলছে?

মোহন শ্রীবাস্তব সহিষ্ণু হেসে বলল, দেরাদুনে, উত্তরকাশীতে।

দেরাদুনে কেল্‌তা আদিবাসী মেয়েদের নিয়েও চলছে ব্যবসা। মেয়েদের উদ্ধার করতে হবে, এদের জন্যে এমন জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে খেয়েপরে বাঁচে। অনেক দিন ধরে অনেক কাজ করা বাকি।

অন্য দেশেও চলে কামিয়ৌতি?

নিশ্চয়। একেক অঞ্চলে একেক নাম।

বনো বলল, তাতেই তো আর একলা লাগে না। উঃ, কামিয়াদের সমাজটা কত বড় রে।

অনেক বড়। 'সমাজ যদি বল, সে সমাজে কত যে মানুষ আছে, তার সীমাসংখ্যা নেই।

॥ ৬ ॥

দৌলতি ভাঙা মেলা দেখতে গিয়েছিল বলে তাকে ভীষণ মেরেছিল লাটিয়া। লাটিয়া যাকে একচেটিয়া করে রেখেছে, সে ঘরে থাকবে। তাকে দেখবে না কেউ।

পরমানন্দও ভয়ানক তর্জনগর্জন করে ছিল। মাধ্‌পুরা কি শহর? এ তো গঞ্জ জায়গা। এখানে যারা রেণ্ডি টোলিতে আসে, তারা ক'পয়সা দেয়? লাটিয়া মুঠো মুঠো টাকা ঢালে। রাগের বশে পরমানন্দ বলে ফেলেছিল, টাটকা আনকোরা হরিজন ছুঁড়ি চেয়েছিল, তাতেই ছ মাসে দেড় হাজার টাকা দিয়েছে। বেচাল-বজ্জাতি করে ওকে ভাগাবি?

দেড় হাজার টাকা?

দৌলতি চমকে উঠেছিল। দেড় হাজার টাকা কত টাকা? সোম্‌নী বলেছিল তিনশো টাকা পাঁচবার শোধ হয়ে গেছে ও টাকায়। এক হাজার টাকায় দশবার একশো টাকা থাকে।

দৌলতি পরমানন্দের পায়ের কাছে শুয়ে পড়েছিল, দেওতা।

তোমার সে তিনশো টাকা তো পাঁচবার উসুল হয়ে গেছে। তুমি আমাকে খালাস করে দাও তবে ?

পরমানন্দ হেসেছিল। বলেছিল হাঁ হাঁ আসলটা দেখেছিস। কিন্তু সুদ ? তোর জামাকাপড় কিনেছিলাম, সে বাহান্ন টাকা ? দয়ার শরীর আমার সুদে বেড়ে তোর টাকা এখন আড়াই হাজার হয়েছে। আর হিসাব আমার লেখা থাকে। সুদে-আসলে শোধ হলেই তুই খালাস পাবি।

দেওতা, আমি কি জানি, কি হিসাব করছ ? কামিয়ৌতি ধার তো কখনো মিটে না।

আরে, সময় হলে খালাস পাবি, সোম্‌নীকে তো ছুটি করে দিব এবার। ওর ঋণকরজ থেকেই গেল, তা থাকুক।

সোম্‌নী ছুটি পেয়ে যায় খুব হঠাৎ। পেয়ে যায় নয়, নিজেকে ও নিজেই ছুটি দেয় একদিন। দুরন্ত জ্বরে বড় বড় ক্রিমি বমি করে সাত বছরের বড় ছেলেটি মরে যাবার পর পাঁচ বছরের মেজ ছেলে ও সাড়ে তিন বছরের ছোট ছেলে বাজারে দোকানের ছাউনির নিচে সেই যে বসল, আর তারা ওঠে না। বড়জনই ওদের নিয়ে পথে পথে ঘুরত, দোকানে চেয়ে মেগে খাওয়াত। আর ভাতের হোটেলে ফ্যানটুকু তো পেতই। সোমনীকে ওরা অনেক কম চেনে। বড়জনকেই চিনত।

সোম্‌নী তারপরেও বাসন মাজল, রাঁধল, রামপিয়ারীর জামা-কাপড় কাচল। তারপর নিজের ভাগের রুটি আর ঢ্যাঁড়স ভাজা পেটকাপড়ে বেঁধে নিল। শুকনো চোখে।

কি করছিস, কোথায় যাচ্ছিস ?

একটা কথারও জবাব দিল না সোম্‌নী, একবারও তাকাল না পেছন ফিরে। যে হাবেলিতে জীবনের যৌবনকাল লাটিয়া থেকে শুরু করে সকল কাঁইয়া-লালা-ঠিকাদারকে ভাড়া দিয়েছে, সেদিকে চেয়ে দেখল না। মাথা নাড়ল, বেরিয়ে চলে গেল।

বেরিয়ে গেল সোম্‌নী, ছেলেদের নিয়ে পথে বসে রইল যে কোন

ভিখমাংনীর মত। চলে গেল ভিখিরিদের সমাজে, বাসপথের পাশে কাশের ঝোপড়িতে। যে কোন ভিখমাংনির মত একদিন রামপিয়ারীর হাবেলিতে এল ভিক্ষা করতে। বিড়বিড় করে বলতে বলতে এল, আকাল আসে না কেন, আকাল? কেউ পাত্তা দিতে পারে না আকাল কবে আসবে?

দৌলতির মনে পড়ল, আকালে ও ছেলেদের মিশনে দিতে চেয়েছিল।

খুবই তাজ্জব, পরমানন্দ আর সোম্নীকে কিছু বলল না। বলতে পারত, ভিক্ষের পয়সা দে। বলল না। কেন বলল না কে জানে? কামিয়ৌতি তো কখনো ফুরায় না। আর ঝালো বলল, ভালো হয়েছে। পথ দেখিয়ে দিয়েছে সোম্নী।

লাটিয়ার কাছে দৌলতি তারপরেও প্রয়োজনীয় থাকল কিছুকাল। কিন্তু একদিন সকালে উলঙ্গ লাটিয়া চেঁচাতে শুরু করল, রামপিয়ারী! এ রামপিয়ারী! বোলা মিশরকে। ঔর এক নতুন হরিজন মেয়ে দেখাতে বল্। দৌলতিতে মজা হচ্ছে না আর। এ মাল ভোস্কা হয়ে গেছে।

দেওকি হুসাদিন্ এল। আর দৌলতি চালান হল ছোট ঘরে। ঝালো বলল, কোন ভাল গাহক জুটে তো বেঁচে গেলি নইলে দশ-বিশ গাহক একেক দিন, আমাদের হাল হবে।

এত গাহক কেথা থেকে আসে ঝালো?

মাধ্পুরার আশেপাশে নতুন নতুন রাস্তা হচ্ছে, আর ওই যে নদীর কাছে সিমেন্ট কারখানা হচ্ছে? তাতেই তো ঠিকাদারকুলি হাজারটা লোক।

সবাই কেন এখানে আসে?

বউ নিয়ে আসে না, জংলা জায়গা তো। মদ গেলে রাতদিন আর মেয়েমানুষ খোঁজে।

গোহ্মনি বলল, মৌসির কাছে ওষুধ চেয়ে নিস। এখন তো

তোর লাটিয়াজী নেই। দশ-বিশটা গাহক সামলাতে শরীরে খুব কষ্ট হয়

কিসের কষ্ট?—ঝালো বলল।

তুই বুঝবি না।

আমি কষ্টও বুঝি না, ব্যাথাও বুঝি না। মোদো মাতাল সব চেয়ে ভাল। বেশি জ্বালায় না।

দৌলতির কপাল বোধহয় ভাল। পরমানন্দই নিয়ে এল আরেক ঠিকাদার সিংজীকে বলল, ভাল মেয়েমানুষ চান তো তোহরি যাবেন কেন? কিষণের হাবেলিতে? আমার এখানে কি সব ভুষো মাল? দেহাতের টাটকা মেয়ে দেব।

সিংজী বলল, হাতফেরতা মেয়েছেলে তো?

কেন হজৌর? আপনি আসুন, আপনার জন্যে থাকবে। এই দেখুন। এই দেখুন না, দেখুন?

সিংজী লাটিয়ার মত দুর্দান্ত জানোয়ার নয়। ভালো জামা পরে আসত সিংজী। দৌলতিকে ও জীপে চড়িয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই দৌলতিকে আংটি কিনে দিয়েছিল।

পর না কেন আংটিটা?

পরলে পরে দেখতে পাবে মৌসি কেড়ে নেবে।

শাড়ি দিয়েছিল, সুগন্ধি সাবান। রামপিয়ারীর হাতে দশ টাকার নোট দিয়ে ঘরে ঢুকত. দৌলতিকেও দিত এক টাকা, দু টাকা। ভয়ানক মদ খেত, এই যা।

দৌলতিদের জীবনে এই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। ভাইপোর বিয়েতে জৌখান গিয়ে পরমানন্দ আর এল না।

এল না যে এল না, আর সে ফিরলই না মাধপুরা। কলেরা হয়ে মরে গেল।

তখন ভরা সন্ধ্যা। রামপিয়ারীর হাবেলিতে মেয়েরা সাজগোজ শেষ করছে। এমন সময়ে এল কিষণ। সঙ্গে নেড়া মাথা এক যুবক। কিষণ বলল, রামপিয়ারী!

হাঁ কিষণবাবু।

এদিকে এস, কথা আছে।

রামপিয়ারীকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিষণ বলল, পরমানন্দ মিশির মরে গেল রামপিয়ারী। এ তার ছেলে, বৈজনাথ মিশির। বাপের জমিজমা তো তিনছেলে পেয়েছে কিন্তু এ কারবার একা বৈজনাথ পেয়েছে।

মরে গেল লোকটা ?

হ্যাঁ। আর বৈজনাথ যা পিশাচ বাপের কাঁধে হাগে। ওর সঙ্গে কথা বল! পরে আমি কথা বলব, কথা আছে।

বৈজনাথকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল রামপিয়ারী বলল, এখানে বোস দেওতা। এখন গাহক আসার সময়।

কাল আসব, দিনেমানে।

মশমশ করে চলে গেল বৈজনাথ, কিষণ বলল, তুমি যাও, আমি পরে আসছি। রামপিয়ারি পুরানো চিনাজানা মানুষ এর কাছে এলে একটু চা আমি খাই।

রামপিয়ারী নিজেই চা করে দিল। তারপর বলল, দেওতা তো গেল আমার নথনি করে দেবে বলেছিল, বলেছিল এই হাবেলি আমাকে দিয়ে দেবে।

মিছে বলেছিল।

এ খুব খচড়াই ছেলে ?

পিশাচ, মমতাহীন।

কি বলবে বলেছিলে ?

দেওকী আর মোতিকে আমি যদি...খুব নিচু গলায় কথা কইতে থাকল কিষণ আর রামপিয়ারী বা কি করে। টাকা ও নিশ্চয়ই চায়। কিষণ চায় দেওকী আর মোতিকে ? যাক্ নিয়ে যাক,। কামিনী রেণ্ডি করে রাখবে ? কিনে নেবে ? লেন দেন কিন্তু গোপনে সারবে কিষণবাবু, আর এরপর মাস ছয়েক এমুখো হয়ো না। জানি তোমার কাছে ওরা ভালই থাকবে। নিয়ে কি করবে ? চালান

দিয়ে দেবে বাইরে যা ভাল বোঝ কর। না না, কাকপক্ষী জানবে না। কোথায় চালান দেবে? ও বাবা! অত দূর দূর শহরে দেহাতী মেয়ে চালান যায় জানি না তো?

বিশাল নিশ্বাস ফেলল। রামপিয়ারী আর কিছুদিন বাদে, বৈশাখী পুর্ণিমার মেলার ডামাডোলে দেওকা দুসাদিন আর মোতি পারহাইয়া নিখোঁজ হল, খুব খোঁজাখুজি চলল। লাটিয়া বলল আরে ওই ছুঁচোটা ওই কিষণ ঘোরাঘুরি করছিল না, ও এর মধ্যে আছে।

মোতি ও দেওকীর খোঁজ মিলল না, বৈজনাথ নিশ্চয় কিছু আঁচ করে থাকবে কেন না দুদিন বাদে এসে বসল টুল নিয়ে। বলল, আমার বাবা ছিল বোকা তার ছিল দয়ার শরীর। দয়া করে করে বাবা টাকা পয়সা গোছাতে পারে নি। আর আদত সহবত নিয়েও কথা বলে নি কোন, কিন্তু আমি বাবা নই। মালিক মালিকই থাকে, নৌকর থাকে নৌকর।

তা তো বটেই।—রামপিয়ারী।

এখন শিখাব আমি। আমার সামনে কোনোদিন বসবে না, দাঁড়িয়ে থাকবে। দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে কথা বল। মনে রেখো কথাটা।

রামপিয়ারী খুবই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মেয়ে মানুষ। বিশাল দেহটি নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আবেগে ওর চর্বির স্তূপ কাঁপতে লাগল। এত বড় অপমান ওকে পবমানন্দও করে নি। মেয়েগুলি তটস্থ হল। রামপিয়ারীকে যে অপমান করতে পারে, সে ওদের মাথা হয়তো হাতে কাটবে।

এদের নাম বল, কে কত গাহক নেয় তা বল। গাহক বাড়ে না কেন? অ্যাঁ? বাড়ে না কেন?

রামপিয়ারীর মনে হল, এখন ও মেয়েদেরই দলে। আর ও মালিকের লোক নয়।

বৈজনাথজী, ভাল গাহক মিলে না।

কেন?

খাওয়াদাওয়া যা দাও তোমরা, শরীর শুকিয়ে যায়। গাহক টানতে পারে না।

খাইখরচ আরো কমবে, গাহক আরো বাড়বে। শরীর! কামিয়া ঔরতের শরীর! শরীর শুকালে বিদায় হবে। আকাল আসছে, এখন কি হরিজন কামিয়া ঔরতের অভাব আছে কিছু? আর হিসাব রাখব আমি। তোমার কাজ গাহক আনা, ঘরের কাজ-কাম করা। তোতাকে পোষা তো বেফয়দা। হাতির মত শরীর, খাইখরচ উঠানো বহোত মুশকিল।

এক মাসের মধ্যে বৈজনাথ এনে ফেলল নতুন মেয়ে। চারপাশে নানারকম প্রকল্প, আদিবাসী-হরিজন অঞ্চলে ঠিকাদার, ফড়ে, দালাল, ওভারসিয়ার, অফিসার, কেরানীর ভিড়। অত্যন্ত শস্তা লেবার, অত্যন্ত শস্তায় ভাঁওতা মেরে উধাও করা যায় গরিব মেয়েদের।

রামপিয়ারীর হাবেলির মেয়েদের তাই, ঘড়ির কাঁটা ধরে বিশ থেকে ত্রিশজন গাহক নেবার ব্যবস্থা হল। ঝপাঝপ টাকা তুলে নাও। শরীর ফুরালে?

গোহুমনি ও রেওতীকে বৈজনাথ নিয়ে গেল জৌখান। বলল গঞ্জ জায়গা মাধপুরা। এখানে গাহক এসব বুড়ি গাইকে পয়সা দিবে না। গ্রামে হাটতলায়, ভাটিখানার পাশে ওদের ঘর তুলে দিলাম। বারো আনা, আট আনায় গাহক টানুক। ভাইরা দেখবে কারবার।

ঝালো বলল, জৌখানে ওদের স্বামী আছে, ছেলে আছে, তাদের সামনে!

দৌলাত বলল, ওদের ছেলেমেয়ে?

বৈজনাথজী কি ব্যবস্থা করেছে।

রামপিয়ারী বলল, কি ব্যবস্থা করবে? বেচে দেবে। এখন তো ছেলেমেয়ে কিনেও নেয় শুনেছি।

ঝালো বলল, গ্রামে গিয়ে রেণ্ডি হও, নয় সোমনীর মত ভিখমাঙা হও, এই তো? মৌসি এখন বল তো বাঁচি কি করে?

দৌলতি বলল, কে বাঁচবে?

আমার কথা বলছি। তুই তো বেঁচে আছিস। কপাল জোর তোর। সিংজী আসে। লাটিয়া বহোত জানোয়ার। তবু দৌলতি একজন গাহক থাকলে তবু শরীর থাকে।

কতদিন থাকবে?

তোকে তোর দেশের মানুষ কত কথা না বলে গিয়েছিল? কামিয়ৌতি বন্ধ হয়ে যাবে?

বনো চাচা তো ছোটবেলা আমাদের গল্প বলার লোক ছিল। গল্পই বলল ও।

গল্প? কাহানী? কিসসা?

দৌলতি, এক কামিয়া বেণ্ডি, দেয়ালে হেলান দিল, চোখ বুজল ক্লান্তিতে। ঘুমঘুম গলায় বলল, গল্পই তো।

সে কি রে?

ওই যে বলল, কামিয়ৌতি খতম করবে? সে গল্প নয়। খুব সুন্দর কহানী। কামিয়ৌতি খতম।

বাবু লোক, মাস্টার মানুষ, সেও গল্প করল?

হাঁ হাঁ। কেন করবে না? সেও গল্প বলল।

তোর চাচার ছেলে?

ধানো? না না, ধানো গল্প বলে নি। বনো চাচা বুঢ়া মানুষ, গল্প করল খানিক। বাবু লোক কিতাব বুঝে, মানুয বুঝে না, সেও গল্প করল খানিক। ধানো তো আমাকে দেখছিল।

বনো নাগেসিয়া পালিয়ে যায়, তাই না?

হাঁ হাঁ।

তাহলে?

ঝালো, এ কি সব কথা বলিস? বনো চাচা কামিয়ৌতি থেকে ভেগে গেল, কামিয়ৌতি কি বন্ধ হল?

রামপিয়ারী বলল, বন্ধ হবে কি করে? পরমানন্দ্জী আমাকে বলছে, রামায়ণ ঔর মহাভারতে লিখা আছে যে কমিয়ৌতি খতম করা অধর্ম।

ঝালো বলল, বন্ধ হবে না কেন ? না জমিন্, না মুট্‌ঠি ভর্ গম, কামিয়া না হলে মানুষ খাবে কি ?

ধানো তো তাই বলেছিল।

আর দেখা হয় নি ?

ঝালো ! তুই কত কথা বলিস ? আর দেখা হবে কি করে ? ঘুরতে ঘুরতে মেলায় এসেছিল বই তো নয়। আর আসে ? দেশে দেশে ঘোরে চাচা, আমার কথা ভুলেই গেছে।

ঝালো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সোম্‌নী ঢুকে পড়ল লাঠি হাতে। লাঠির উপর ভর করে হাঁটে ও এখন। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, এ মায়ী ! ভুখ লেগেছে, কিছু দে।

ঝালো বলল, এ আবার কি, সোম্‌নী ? আমাদের "মায়ী" বলছিস কেন ?

সোম্‌নী ওদের দিকে চেয়েই বলল, কিছু দে মায়ী ! ভুখ লেগেছে বড়।

রামপিয়ারী বিরস মুখে এক বাটি চাল এনে ঢেলে দিল ওর বাটিতে। সোম্‌নী বলল, বেঁচে থাকো মায়ী—তারপর বলল, আকাল কি এসে গেল ? এক বাটি চাল দিলে ? আকাল ?

ঝালো বলল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর।

রামপিয়ারী বলল, তাই না তাই ? মাথা খুব সাফাই আছে। "আকাল আকাল" করে ও আকাল ডেকে আনবেই। বেঁচে বা আছে কি করে ?

পারো নামের মেয়েটি বড় মুখরা। সে বলল, তোমরা যা খেতে দাও তার চেয়ে ভালোই খায় হয়তো।

রামপিয়ারী বলল, মালিককে বলিস এ কথা।

দৌলতির কপালে সিংজী বেশিদিন থাকে নি। দু বছর বাদেই সিংজী ঠিকাদাবি কাজ নিয়ে চলে গিয়েছিল অন্যত্র। যাবার সময়ে দৌলতিকে টাকা দিয়েছিল দশটা আর বলে ছিল অনেক কথা।

এ কাজ আচ্ছা কাজ নয় দৌলতি, তুই আচ্ছা লড়কী, দেহাতী লড়কী, তুই দেশে ফিরে যা। আমার কাছে বেশি টাকা নেই।

আপনি তো মাঝে মাঝে টাকা দিয়েছেন আমাকে, আব টাকা দিয়ে কি হবে?

এ কথা বলিস কেন তুই? তাই তো বলি তুই বহোত আচ্ছা লড়কী আছিস। রেণ্ডিলোক তো পয়সার লালসের জন্যে এ কাজ করে। তুই কখনো পয়সার লালস করলি না।

হুজৌব, বাজারিয়া রেণ্ডিদের যদি কিছু আজাদী থাকে, কামিয়া-রেণ্ডিব তা নেই। টাকা তো মালিক নিয়ে নেয়।

তুই বহোত আচ্ছা লড়কী।

হুজৌব, একটা কথা বলি?

বল্।

আপনি ঘুবতে ফিরতে যদি বনো নাগেসিয়াকে দেখেন, এক সাহেবের সঙ্গে ঘুবে সে বুড্‌ঢা—আমার গাঁওলাগী চাচা বনো। তাকে একেবার আসতে বলবেন?

বলব।

সিংজী ওকে নতুন কাপড়, সাবান, কত কি দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, বহোত শান্তি দিয়েছিস তুই।

লাটিয়া চাইত মজা, সিংজী পেয়েছিল শান্তি।

সিংজী যখন চলে যায়, তখন দৌলতির বয়েস কুড়ি হয়ে গেছে। তখনো ওর শরীরের লাবণ্য, গাল ভাঙেনি।

রামপিয়ারী বলেছিল, দৌলতির জন্যে কোন মালদার ভালো গাহক খুঁজি। তুমি টাকা পাবে, সেও খুশি থাকবে।

বৈজনাথ বলেছিল, কত পাব?

মাসে তিনশো তো পাবে বেকসুর।

আর দিন দশ টাকার গাহক ও এক বছর টানবে, দিন দশজন। দিন একশো টাকা মানে মাসে তিন হাজার টাকা, নাফা কোথায় বেশি?

দশ টাকা দেবার গাহক দিনে দশজন এই মাধ্পুরায় ? তা মিলে না জী। তাতেই দেওতা মাসে মোটা টাকার ভালো গাহক খুঁজত।

যা মিলবে তাতে বেশিই নাফা থাকবে আর, পিতাজীর নিয়মে চললে, আমার চলবে না।

দৌলতি তাহলে সোম্নী বনে যাবে।

আরে ভোসকি ? সোম্নী দশ বছরে ভিখমাংনী হয়েছে পিতাজীর নিয়মে। আমার নিয়মে দৌলতি পাঁচ বছরে ভিখমাংনি হবে। তাতে আমার কি ?

তাই হোক।

রামপিয়ারী নিশ্বাস ফেলে বলল, গাইগরু হলে তাকে খাওয়ালে তবে দুধ দেয়। মানুষের মেয়ে কামিয়া হলে না দানা, না পানি, সওয়ারী চাপাও আর পয়সা কামাও।

তোর মুখ খুব বেড়েছে।

হাঁ বৈজনাথজী, আমি আর পারছি না। আমাকে ছুটি করে দাও। আমি তো তোমার কামিয়া নই।

চলে যা। তুই চলে গেলে আমি কানা হয়ে যাব ? হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যা।

হিসাব তুমি বুঝাবে আমাকে।

কেন ?

এ কারবারে আমার দুশো টাকা আছে, জান না ?

কোথায় লিখা আছে ?

দেখাব। সাক্ষী রেখে দেখাব।

বাসের হিসাব রক্ষক নন্দলাল কাগজটি পড়ে শোনাল। হ্যাঁ, পরমানন্দ রামপিয়ারীর কাছে দুশো টাকা নিচ্ছে। রামপিয়ারী লাভের অংশ পাবে একশো টাকায় এক টাকা।

বৈজনাথ দুশো টাকা দিল কিন্তু লাভের ভাগ দিল না। বলল, বাবা ছিল আকাট বোকা। এমন কথা কেউ লিখে রাখে ? লাভের

হিসাব না করে বিদায় হয়ে যা। বেশি কথা কইলে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেব। বলব, চুরি করে ভাগছিস।

রামপিয়ারী গালাগাল দিতে থাকল বৈজনাথকে। গাল দিতে দিতেই বের করে দিল ওকে। তারপর মেয়েদের বলল, চললাম আমি। এক মাস যাবে না, নাহারায় হাবেলি নেব আমি। কারবার খুলব। টাকা ও দেবে না তা আমি জানতাম। নাক্কার টাকা সেই কবে থেকে সরিয়েছি?

চলে যাচ্ছ মৌসি?

কি করি বল্ তোরা?

রামপিয়ারীব চলে যাওয়া একটা অধ্যায়ের শেষ। বৈজনাথ তারপরেই এসে বসবাস শুরু করে এ বাড়িতে।

আর দৌলতির ঘরে গাহকের সংখ্যা বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে। খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে শুরু করে দৌলতি। ঝালো এবার চালান হয় গ্রামে। বৈজনাথ খুব তাড়াতাড়ি সুদের টাকা তুলে নিতে চেষ্টা করে।

যত চেষ্টা করুক যত গাহক বাড়াক, কামিয়ৌতি ঋণের সুদ বেড়ে চলে, বেড়েই চলে।

আর একদিন সকলকে অত্যন্ত বিস্মিত করে চলে আসে বনো নাগেসিয়া। তার সঙ্গে মোহন শ্রীবাস্তব, প্রসাদ মাহাতো, ফাদার বমফুলার, গান্ধী মিশনের পুরণচাঁদ।

বৈজনাথ মিশ্র বলে, কে আপনাদের ঢুকতে হুকুম দিয়েছে? এ আমার হাবেলি।

পুরনচাঁদ বলে, আপনার নাম?

আরে আপনারা কে?

হরিজন সংঘের প্রসাদ মাহাতো অত্যন্ত চালু ছেলে। সে ঝপ করে ইংরিজীতে ছাপা হরিজন সংঘের কতকগুলো কাগজ বের করে বলে, আমরা সরকারী লোক।

এখানে কি চান?

বনফুলার হিন্দীতে ধমক মেরে বলে, প্রশ্নগুলো আমরা করব, আর এই মেয়েদের প্রশ্ন করব। তুমি চলে যাও।

এ তো আমার বাড়ি।

সরকারী কাজে বাধা দিলে পুলিস আসবে।

কি কাণ্ড! বেশ্যাবাড়ি সরকারের কি কাজ?

এটা তো শুধু রেণ্ডিবাড়ি নয়, কামিয়া মেয়েদের এনে তুমি রেণ্ডি করে রেখেছ।

কামিয়া যে হয়, মালিক তাকে দিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারে। পারে কিনা বলুন?

কামিয়ৌতি বন্ধ করবে সরকার।

পলামু জিলায় বড় বড় সরকারী অফসর কামিয়া-সেওকিয়া রাখে।

কামিয়ৌতি বন্ধ করবে কে?

আরে বড়া সরকার। দিল্লী সরকার।

তা হতেই পারে না। কামিয়ৌতি হল এক প্রাচীন নিয়ম। ধর্মের বইয়ে লিখা আছে সে কথা।

কোন কিতাবে?

আমি শুনেছি।

প্রসাদ গর্জে উঠল যথেষ্ট হয়েছে, কেটে পড়।

বনফুলার বলল, লোকটা বদমাশ বলে মনে হচ্ছে। ওকে জীপে বসিয়ে থানায় নিয়ে যাও।

না না, আমি যাচ্ছি।

মোহন শ্রীবাস্তব এতক্ষণ চোখ দিয়ে খুঁজছিল চেনা মুখ। কিন্তু দৌলতি নিজের নাম না বলা পর্যন্ত বনোও তাকে চেনে নি। দৌলতির চেহারা এত পালটে গেছে।

বল, নাম বল।

দৌলতি।

বাবার নাম?

গনোরি নাগেসিয়া।

আমি শুনেছি তোমার কথা। তিনশো টাকার কারণে তোমাকে কামিয়া করে রেখেছ ?

কামিয়া নয়, কামিয়া রেণ্ডি।

তিনশো টাকা ?

তিনশো বাহান্ন টাকা। বাহান্ন টাকার জামাকাপড় কিনেছিল দেওতা, সে হিসাবও জুড়ে নিয়েছে।

আর কোন ধার ছিল ?

পয়সা মাঝে মাঝে পেয়েছি গাহকদের কাছে, তা পেটে খেয়ে নিয়েছি সাহেব। বড় কম খেতে দেয়, খিদে যায় না। আর কাপড় কিনতে দশ টাকা ধার নিয়েছিলাম একবার। অসুখ হলে একবার··· তেল সাবানে···তা আরো চল্লিশ টাকা ধার হয়ে গেল।

সব ধারই আদি ঋণের সঙ্গে যোগ হয়েছে ?

তাই তো নিয়ম।

এ টাকা শোধ হয় নি ?

কামিয়ৌতি ধার সাহেব।

তুমি কি রোজগার করেছ ?

দৌলতি হিসেব দিতে লাগল।

লাটিয়াজী মাসে তিনশো টাকা দিত, আর তিন বছর ধরে দিয়েছে, হাঁ তিন বছর দিয়েছে।

দশ হাজার আটশো টাকা।

সিংজী দিত আড়াইশো টাকা মাসে।

কতদিন দিয়েছ।

সেও তিন বছর।

ন হাজার টাকা।

আর তারপর থেকে...তা কোনদিন পাঁচজন, কোনদিন দশজন, মেলার সময়ে বিশজন গাহক—দশ দশ টাকা

এরকম কতদিন চলছে ?

ছ বছর তো হল।

দেখ প্রসাদ, মোহন দেখ হিসেবটা। গড়ে মাসে একশোজন যদি হয়, মাসে হাজার টাকা বছরে বারো হাজার দু বছরে চব্বিশ হাজার? বেঁচে আছে কি করে?

তিনশো টাকা ১৯৬২ সালে লগ্নী করে—১৯৭০ সালের মধ্যে ও কত টাকা তুলেছে? চল্লিশ হাজারের ওপর?

প্রসাদ বলল, কি করা যায়?

ফাদার বমফুলারের আঙুল কাঁপছিল। সে বলল, একই ইতিহাস দেরাছনের আদিবাসী কোল্‌তা মেয়েদের সমাজে। তারা দিল্লী বা মীরাট বা পাহাড়পুরে এই কাজ করে।

কি করা যায়?

উত্তেজিত হয়ো না প্রসাদ। অন্য মেয়েদের জবানবন্দী লিখে নিই? উত্তেজিত হয়ো না।

মোহন প্রসাদ মাহাতোকে খোঁচা দিল, তোমার রাজনীতির বন্ধুরা বিহারে কি করছে?

তারা ভোজপুরে হরিজন মেয়েদের ইজ্জত রাখার জন্যে বন্দুক চালাচ্ছে। তোমার মত স্কুলের আঙিনা নিকিয়ে চকের গুঁড়োয় ভারতের ম্যাপ এঁকে সেখানে ঝাণ্ডা পুঁতে "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা" গাইছে না।

পলামু কি বিহারে নয়?

আগুন কি এক জায়গায় থাকবে?

তোমরা একটু থামবে?

কি করা যায়? এমনি সব কথা ওই মেয়েরাও বলবে। সব শুনে চলে যাব?

ফাদার বম্‌ফুলার বলল, আমি কেন্দ্রীয় এক সংস্থা থেকে পলামু জেলায় "ইনসিডেন্‌স অফ বনডেড লেবার" বিষয়ে সয়েজমিন সমীক্ষা করতে বেরিয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে ওকে আমি মনে করি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবার মত অপরাধী। কিন্তু তাতে কাজ হবে না। পলামু জেলায় সরকারী অফিসারও কামিয়া সেওকিয়া রাখে। তারা হয়তো

কমিয়া মেয়েদের বেশ্যা বানায় না। কিন্তু আমার কাজের উদ্দেশ্য হল, "বনডেড লেবার" প্রথা আইনের মাধ্যমে উচ্ছেদ করার জন্তে কেস তৈরি করা। অঞ্চল ভিত্তিতে। সে কথা ভুলে গেলে হবে না।

হাঁ, উচ্ছেদ।

বনো বলল, সাহেব? আইন করে বা কী করবে? আইন কাজে লাগাবে কে?

প্রসাদ বলল, যারা সরকারী অফিসার।

সেই ব্রাহ্মণ, সেই কায়স্থ, সেই রাজপুত। না প্রসাদজী, আইন হলেও মালিক-মহাজনের পিছনে থাকবে। এই তো গোলমাল না?

মোহন বলল, আইন হোক। আইন না মানলে পুলিস আছে। পুলিস দেখবে।

বনো বলল, এ কথাও মোহনবাবু তুমি ভদ্রলোকের মতো বললে। পুলিস কখনো মালিক মহাজনের দিকে বন্দুক উঠায় না। পুলিস মারে আমাদের।

প্রসাদ বলল, আইন চাই! আর চাই সংগঠন। হরিজন সংঘ বা গান্ধী মিশনের মতো সংগঠন নয়।

পুরণচাঁদ এতক্ষণে মুখ খুলল, শান্তির পথে ভাবতে চেষ্টা করুন প্রসাদজী। ভোজপুরের কথা বললেন। কিন্তু হরিজন মেয়েদের ইজ্জত রাখার জন্তে হাতিয়ার ধরা কি একটা সমাধানের পথ হল?

বনো বলল, পুরণচাঁদজী? আমাদের মেয়েদের ইজ্জত বুঝি ইজ্জত নয়? আমার বউ-মেয়েকে উঠায় মালিক, তাই আপনি "শান্তি শান্তি" বলছেন। আপনার ঘরের মেয়ে বউকে কেউ উঠিয়ে নিলে আপনি তখন কি "শান্তি" বলেন?

এরকম আমাদের ঘরে হয় না।

তাই বলুন। হলে "শান্তি শান্তি" বলতেন না।

অন্যায়কারীকে বুঝাতাম। অধর্ম করলে কত বড় পাপ করা হয়, তা বুঝাতাম।

আরে, আপনারা তো তাজ্জব চিড়িয়া! অধর্ম বুঝাচ্ছেন,

ততক্ষণে সে মেয়েছেলের ধরমনাশ করে ফেলবে যে? না না, এ খুব তাজ্জব বাত।

প্রসাদ বলল, সংগঠন চাই। হরিজন সংঘ নিয়ে কাজ করি, আর হরিজনদের, আদিবাসীদের শুধু মার খেতে দেখি। এখন শুধু মনে হচ্ছে সংগঠন চাই। আমার সংঘ তো হরিজনদের কোনো দুঃখদুর্দশা দূর করতে পারছে না।

ফাদার বম্‌ফুলার বলল, প্রথম কাজ আইন করে এ-প্রথার উচ্ছেদ। তারপর জনমতের চাপে আইন কার্যকর করা। জনমত গঠন করতে সংগঠন চাই। তারপর এইসব মুক্তিপ্রাপ্ত কামিয়াদের জীবিকার সংস্থা চাই। আর, এইসব মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক আর অর্থনীতিক পুনর্বাসন দরকার।

মোহন বলল, আইন হলে!

পুরণচাঁদ বলল, আইন হলে!

প্রসাদ বলল, আগুন জ্বলে যাবে।

বনো বলল, তোমরা সব শুনে চলে যাবে? কিছু ব্যবস্থা করবে না এদের? আইন হতে হতে কতদিন? ততদিনে এদের কী হাল হবে?

বম্‌ফুলার বলল, বহু বছরে এদের এমন অবস্থা হয়েছে বনো। দীর্ঘদিনের পাপ কি একদিনে যায়?

দৌলতি চা আনল থালায় সাজিয়ে। বলল, মালিক বলছে চা খেতে।

আরেকটি মেয়ের জবানবন্দী নেওয়া শুরু হল। দৌলতি বনোর কাছে বসে বসে বনোর পায়ে হাত বুলোতে লাগল। আস্তে আস্তে গভীর মমতায়। একা বনো চাচা জানছে দৌলতিদের জীবনে অন্ধকার কত সর্বগ্রাসী। একা বনো চাচার বুকটা ফেটে যাচ্ছে সমবেদনায়।

দৌলতির আঙুলগুলো বলতে থাকল, তুমি দুঃখ করে কী করবে বনো চাচা? কামিয়৷ৌতি ঋণ যে মেটে না। তিনশো টাকার ঋণ

আট বছরে এত হয় যে তার শেষ নেই। চল্লিশ হাজার টাকার বেশি আমার এই শরীর নিংড়ে নিংড়ে উঠিয়ে নিয়েছে মালিক।

তবু ঋণ আছে। যতদিন আমার শরীর ভোগ্য থাকবে ততদিন ঋণ থাকবে। তারপর ভিখমাংনি হয়ে বেরিয়ে যাব। সোমনী তো ভিখমাংনী হয়ে গেছে আর সবসময়ে বলে, আকাল কি এসে গেল? আকাল?

দুঃখ কোরো না বনো চাচা। তার চেয়ে, আমি যেমন নীরবে কথা বলছি তেমনি নীরবে আমাকে বলো না কেন সেইসব কথা? এসব কচকচি বাবুরা করুক। তোমার সে কথা অনেক মূল্যবান হবে।

সেই যে সেওরা গ্রামের বটগাছটা? তার কথা বলো। তার ঝুরি ধরে দোল খেতাম ছাগল চরাতে গিয়ে। ছট্ পরবের মেলাতে আমাকে নিল না বাবা। পায়ে আমার ঘা হয়েছিল। তুমি ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে।

নাগেসিয়া টোলিতে যখন শীত নামত আমরা বসতাম আগুন পোহাতে আর মা আটার লেটিগুলো পুরে দিত আংরার আগুনে। আটা সেঁকার গন্ধ কী মিঠা লাগত আমার। রাতে তোমরা হইহই করে টিন পিটিয়ে বাঘ তাড়াতে।

তখন জানতাম না বনো চাচা, পৃথিবীতে এত মদ আছে, বৈজনাথ আছে, এত গাহক আছে। সেইসব দিন তো আমি হারিয়ে ফেলেছি কবে। তোমার দেখা পেলে সেই সব কিছু আমি ফিরে পাই। তুমি আমাকে কত কি দিয়ে যাও তা নিজেও জানতে পার না।

বনো বলল, তোর হাত এমন গরম?

গরম তো থাকেই।

জ্বর হয়?

তা হবে।

দৌলতি এবার আঁচলের গেরো খুলে একটা টাকা বের করল। বলল, বনো চাচা? এই টাকাটা দিয়ে তুমি কিছু কিনে খেও, কেমন?

টাকা ? তুই দিলি ?

হাঁ চাচা।

তুই আমায় টাকা দিলি মা ? টাকা দিলি ?—বনো নাগেসিয়া হো হো করে কেঁদে উঠল, টাকা দিলি তুই !

দৌলতি মায়ের মতো সস্নেহে বলল, কাঁদে না চাচা, কাঁদছ কেন ? কেঁদো না। কাঁদে কি ?

প্রসাদ মাথা ঝেঁকে বলল, আগুন জ্বলে যাবে।

বনো মাথা নাড়তে লাগল, কে জ্বালাবে সে আগুন প্রসাদজী ? আগুন জ্বালাবার লোক নেই। লোক থাকলে পলামুতে কামিয়া সমাজটা এত বড় হয় ? আইন করার লোক আছে, জীপ চড়ার লোক আছে, আগুন জ্বালাবার লোক নেই। কামিয়া সমাজটা বাড়ছে যে দেখতে পাচ্ছ না ?

৭ ॥

বনো নাগেসিয়া ভেবেছিল একদিন মোহন শ্রীবাস্তব আর কাদার বম্‌ফুলার তার সেই আগুন জ্বালাবার লোক।

কিন্তু মোহন শ্রীবাস্তব, হরিজন ও আদিবাসী কামিয়া-সেওকিয়ার প্রতি সকল দরদ নিয়েও থেকে গেল তোহ্‌রি ব্লকের বিরা গ্রামের বুনিয়াদী স্কুলের মাস্টার। আইনে, অফিসারে, পুলিসে তার বিশ্বাস রয়ে গেল অবিচল। কিন্তু প্রসাদ মাহাতোর বিষয়ে থেকে গেল বিশ্বস্ত।

তাই প্রসাদ যখন "পলামু ভূমিদাস মুক্তিদল" গঠন করে ১৯৭১-এ গা-ঢাকা দিয়ে কাজ শুরু করে, মোহন তার কথা কোনোদিন জানাল না পুলিসকে। জানালে বখশিস পেত।

প্রসাদের দ্রুত রূপান্তর এ কাহিনীর উপজীব্য নয়। যেমন

উপজীব্য নয় বনো নাগেসিয়ার প্রসাদের দলে যোগদান। বনো আগে প্রসাদকে তেমন দাম দেয় নি। কিন্তু হরিজনের ছেলে প্রসাদ গান্ধীমিশন আর হরিজন সংঘ ছেড়ে যেদিন মুক্তি দলে সামিল হল, বনোই ওকে খুঁজে খুঁজে গিয়ে ভিড়েছিল। বলেছিল ধানোটা পান-দোকান করে, তার মাকে মহিষ কিনে দিল! আমি কী করি? তাই তোমার কাছে চলে এলাম বুঝেছ?

আইনটা হবে না প্রসাদজী, কিন্তু কামিয়া সেওকিয়াকে বুঝাতে হবে।

কী?

এ নিয়ম গোলামী নিয়ম।

সাহেবের কী হল?

সাহেব দিল্লি চলে গেল। হে—ই ভুশ করে।

বম্‌ফুলারের সরেজমিন সমীক্ষা দিল্লীতে পৌছয় আর ফাইলবন্দী হয়ে চাপা পড়ে।

বনো বলেছিল, খেতমজুরদের মজুরির জন্যে দাবি তো রাখছি, কেন রাখছি?

প্রসাদের চোখ স্মৃতিতে ধূসর হয়েছিল। সে বলেছিল যার জমি কম সেও সেওকিয়া-কামিয়া। আবার খেতমজুরও কামিয়া। সরকারের খেতমজুরি আইন আছে। কিন্তু রাজ্যসরকারের শ্রমদপ্তর কোনোদিন সে আইন কাজে লাগাল না। এর মানে কী দাঁড়াল, বলো তো?

সরকারী রেটে খেতমজুরি দিলে হয়তো কামিয়া বনতে হত না। তাই না? বলো?

ঠিক বলেছ।

আইন হলেও দেখো সুরাহা নেই।

আইন এই দিচ্ছে, অতএব এটা তোমার হক। এই কথা বলে যেমন খেতমজুরদের মধ্যে যেতে পারছি, ওই আইনটা হলে বলতে পারব বেঠবেগারী বেআইনী, আর দিও না। আইন করে কি

গরিবের ভাল করবে? কখনো নয়। আইন দেখিয়ে আমরা লড়াই করতে পারব।

বুড়ো হয়ে গেলাম।

বুড়োই ভালো। তোমার মত বুড়ো।

আইনের জন্যে লড়াই, তাতেও পুলিস।

এটা তো একাত্তর সাল। পুলিস সর্বত্র।

সর্বত্র ছিল পুলিস, মিলিটারি, প্যারামিলিটারি। খেতমজুর লোক! সরকারী মজুরি চেয়ে জোট বাঁধো। নয়তো কামিয়া বনে যাবে। খেতমজুররা সরকারী মজুরি চাইলে গুলি খাচ্ছিল, জোতদারের লাশও পড়ছিল।

দৌলতিরা সে কথা জানত না।

এমনি করেই, গাহক নিতে নিতে একদিন দৌলতি দেখল তার দর দিন এক টাকায় নেমেছে।

এক টাকাতেই গাহক মেলে। কিন্তু দৌলতির ঘরে আর যেতে চায় না কেউ।

বৈজনাথ বলল, কী হল তোর?

কি জানি মালিক

মুখে কী মেখেছিস? লাল রং?

না মালিক। লাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে সব জায়গায়। গাহক নিতে পারি না। খুব জ্বালা করে। নালীর ভিতরে আগুনের গরম। পিসাব ফিরতে জ্বলে যায়।

বৈজনাথের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বলল, উঠোনের ও পাশের ঘরটায় চলে যা। মলম দিলাম লাগাবি। তাতে না কমলে হাসপাতালে যাবি।

এখানে হাসপাতাল কোথায় মালিক?

তোহ্‌রি যাবি।

কেমন করে? হাঁটতে পারি না যে।

বাসে যাবি। যেমন করে পারিস যাবি।

তাই যাব।

সেরে গেলে ফিরে আসবি। কাসছিস কেন?

কাসি তো হচ্ছেই মালিক।

যা, ওই ঘরে চলে যা।

হররামিরাকে ডেকে বৈজনাথ বলল, ওকে মাটির পাতিলে খেতে দিস, আলতো করে ফেলে দিস।

কেন মালিক?

ওব খারাপ রোগ হয়েছে।

উঠোনেব ওপাশের ঘরের এক পাশে ঘুঁটে কয়লা থাকে। এক পাশে জায়গা করে শুল দৌলতি। হররামিয়া মাটির পাতিলে খাবার বেখে গেল, মাটির ভাঁড়ে জল। দৌলতি বলল, এই টাকাটা নে।

কী হবে?

দৌলতি চোখ বুজে বলল, একটা মোমবাতি আব দেশালাই কনে আনিস। একটা ডবলরুটি আব একটু চিনি। রুটি আব ডাল খেতে ইচ্ছে করছে না।

সব খরচ করবি?

কী আব আছে! পয়সা ঘুরিয়ে আনলে আমাকে দিতে হবে না। কাল ডবলরুটি কিনে দিস।

টাকা জমাস নি কিছু?

দৌলতি ক্ষীণ হেসে জ্বরতপ্ত পেট দেখাল। বলল, এই বেইমান সব খেয়েছে রে।

ডবলরুটি বা পাঁউরুটিও খেতে পারল না দৌলতি। এর পরেও গাহক নিতে হবে না, সেই নিশ্চিন্ততায় যেন শরীর ঝেঁপে জ্বর এল।

সোমনীর মতো ভিখমাংনি হয়ে নয়, ঝালোর মতো গ্রামবেশ্যা হবার জন্যে নয়, একেবারে অন্যভাবে নিঃস্ব হয়ে হাবেলি ছেড়ে বেরোল দৌলতি। বাজারে গিয়ে শেষ সম্বল সিংজীর দেয়া আংটিটা বেচল সোনারকে। সোনা দিয়ে গড়া আংটি, দাম পেল পনের টাকা।

তারপর কোনোমতে তোহ্রির বাসে চেপে বসল ও। শ্রাবণ মাস। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। জল এবার হয় নি। পোঁটলাটি কোলে নিয়ে ও মাথা হেলিয়ে জানালায় রাখল।

ওঃ, বাস কী জোরে চলে। সেওরার মতো গ্রাম দু পাশে মাঝে মাঝে পিছনপানে ছুটে যাচ্ছে। ওর পাশে বসে দুজন দোকানী সমানে কথা বলছে।

ভৈয়া, পুলিসের জ্বালায় তো মরলাম।

যা বলেছ, নাও সুপুরি নাও।

পুলিস সমানে টাকা চায়।

আরে এমার্জেন্সী, এমার্জেন্সী, হাটে-বাজারে পুলিসচৌকি বসাল তো এমর্জেন্সীতে।

তাই তো বলছি। আমার কি ছেলে আছে? সে কি বন্দুক ছিনাচ্ছে? তবে এমার্জেন্সীর পুলিসের জন্যে আমি কেন রোজ তিন টাকা চার টাকা দিব?

আমরা ছোট দোকানদার বই তো নয়।

পুঁজি নেই ভৈয়া, মাসে একশো-দেড়শো টাকা দিতে হলে মরে যাব।

এ এমার্জেন্সী কোথায় ছিল?

কে জানে। পুলিস পারে না কোনো হাংগামা রুখতে। পুলিস জানে গরিব দোকানী, গাঁয়ের হাটুরে, এদের ভয় দেখাতে আর টাকা নিতে।

পলামুর গ্রামে-হাটে এত পুলিস দেখি নি।

আরে আমরা তো থানা জানি না। কোনো অশান্তিও নেই, পুলিসের কাছে যাবার দরকারও হয় না।

যেতে তো হচ্ছে না। পুলিসই তো আসছে।

দৌলতি কিছু বুঝল কিছু বুঝল না।

বাঁকাতে সবাই নেমে গিয়ে চা খেল দোকানে। দৌলতি চোখ বুজল।

তোহ্রিতে নেমে, কাঁপতে কাঁপতে ও হাসপাতাল চলল।

হাসপাতালের বারান্দায় বিকেলের আলোয় কয়েকটি কুকুর ঘুরছে। এখানে পৌঁছতেই ওর শরীর আর বইল না। শুয়ে পড়ল ও পুঁটলিটি মাথায় দিয়ে।

হাসপাতালের বারান্দা থেকে ওকে মেথরানীরা ঘরে নেয়। রেণ্ডি যে ও তা ওরা দেখেই বুঝেছিল।

বিছানায় ঠিক করে শুইয়ে দিয়ে মেথরানীরা এ-ওর দিকে চাইল। একজন দরজার দিকে নজর রাখল। আরেকজন অভ্যস্ত নৈপুণ্যে দৌলতির জামার মধ্যে হাত চালিয়ে রুমালে-বাঁধা টাকাগুলি বের করে নিল। তারপর ডাক্তারকে ডাকতে গেল।

জ্বরে অচৈতন্য দৌলতি হাসপাতালে রইল দিন চারেক। ডাক্তার বললেন, মাধ্‌পুবা থেকে তোহ্‌রি এসেছে? এল কি করে? তাজ্জব।

নার্সও ঠোঁট উলটাল। যক্ষ্মায় শরীর ঝাঁঝরা, যৌন ব্যাধির ক্ষত সর্বাঙ্গে, শ্রাবে বিকট দুর্গন্ধ, রেণ্ডিগুলো মরতেই আসে হাসপাতালে?

তবু হাসপাতালের নিয়ম। দিন চায়েক বাদে জ্ঞান ফিরতে দৌলতি বুঝল ও হাসপাতালে।

ডাক্তার বলল, নাম কী তোমার?

দৌলতি নাগেসিয়া।

বয়েস কত তোমার?

জানি না হুজুর।

ডাক্তার বলল, এই এক আপদ, বয়েস জানে না।

আজাদী হবার পরের সালে হয়েছিলাম।

দৌলতি যে কোনো দেহাতী মেয়ের মতো ভিতু-ভিতু হাসল। অপরিচিত কঙ্কালের মুখে মানুষী হাসিটিতে শস্যক্ষেত্রের নিষ্পাপতা। ডাক্তার বিস্মিত হল।

সাতাশ? মাত্র সাতাশ? আমি ভেবেছিলাম...

তাই হবে হজোর।

কী কর?

কামিয়ারেণ্ডি হুজোর। বৈজনাথ মিশিরের।

ও! তা শোনো বাছা, তোমার চিকিৎসা এখানে হবে না। তোমাকে মাণ্ডার হাসপাতাল যেতে হবে।

ইলাজ হবে না?

না, এখানে এত ব্যবস্থা নেই।

সে কোথায় হুজোর?

বাসে যেতে হবে। লিখে দেব, কাগজ নিয়ে যেও।

বাসে যাব? টাকা তো নেই হুজোর?

বাস ভাড়াও নেই?

ছিল···কে নিয়ে নিয়েছে।

এখানে থেকে কী করবে? দেখো বাসে যদি মেঝেতে বসে বিনা টিকিটে যেতে দেয়।

হুজোর।

কী?

আমি তো বাঁচব না, তাই না?

দেখো, মাণ্ডার গিয়ে দেখো।

দৌলতি চোখ বুজল। বলল, কাল চলে যাব।

পরদিন দৌলতি কাঁপতে কাঁপতে হাসপাতালের গেট থেকে বেরোল। একটু তাগদ থাকতে থাকতে যদি ছাড়ত বৈজনাথজী! তাহলে তো বেণ্ডি-কাজ করেই ও বাসের ভাড়া উঠাতে পারত। দৌলতি যে আগে ছুটি পায় নি। আর এখন! শরীর শেষ করে কি যেন নেমে যাচ্ছে। আচ্ছা মাধপুরাতে ক' দিন আগেও ও উঠেছে, গাহক নিয়েছে কি করে?

বৈজনাথজীর ভয়ে।

সারাদিন ও বসে রইল গাছের নিচে, ছায়ায়। না। মাণ্ডার গিয়ে আর লাভ নেই। তার চেয়ে সেওরা যাওয়া ভালো। বাবা আছে, মা আছে। সেওরা তোহ্‌রি থেকে এমন দূরেও নয়। সেওরাতেই যাবে ও। রাতে সব বেশ ঠাণ্ডা থাকে। আস্তে হাঁটলে

ক্লান্তিও আসবে না। পথ তো আছেই। গরুর গাড়ি যাওয়ার চওড়া কাঁচা রাস্তা।

বিকেলে খাবারের দোকান থেকে জল চেয়ে খেল দৌলতি। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে চলল। জীবনেও ভাবে নি, আরেকবার সেওরা যেতে পাবে।

পথের দু-পাশে কাশফুলের গন্ধ, গরুর গলায় ঘরে ফেরার ঘণ্টা বাজছে। ক্রমে জোনাকি উড়ল আঁধারে, আকাশে ফুটল তারা! কারা আগুন জ্বেলেছে ঘরে, ধোঁয়া উঠেছে।

চলতে চলতে, পা টেনে টেনে চলতে চলতে, একটা চালাঘরের সামনে পৌঁছেছিল দৌলতি। মস্ত চালাঘর, তোহ্‌রির কাছেই। চালাঘরের সামনে আঙিনায় পা দিতে বুঝেছিল, খুব নিকোনো আঙিনা। আর হাতড়ে হাতড়ে মাঝআঙিনায় পৌঁছে দৌলতি এও বুঝেছিল, সেওরা অবধি ওর যাওয়া হল না আর। সমস্ত বুক ঠেলে ব্যথা উঠছে, ওপরপানে, ওপর-পানে।

দৌলতি শুয়ে পড়ল। ব্যাথাটা হয়ে গেল কাসি, কাসিটা হয়ে গেল রক্ত, দৌলতি চোখ বুজল।

সকাল ছটার সময়ে, তোহ্‌রি ব্লকের বিরা গ্রামের বুনিয়াদী স্কুলের মাস্টার মোহন শ্রীবাস্তব, বাঁশের ওপর তেরঙা নিশান লাগাতে লাগাতে বাইরে হইচই শুনেছিল।

বেরিয়ে এসেছিল ও ঝাণ্ডা হাতে।

আঙিনায় গত বিকেলের সযত্নে প্রথমে লাইন কেটে, তারপর চকগোলা ঢেলে যে ভারতের ম্যাপ আঁকা হয়েছিল—সেটা ঘিরে বেশ কিছু লোকের ভিড়। স্বাধীনতা দিবস আজ, পয়লা ভাদ্র। ঝাণ্ডা উঠাতে ছেলেমেয়েরা আসে এবং তামাশা দেখতে বয়স্করা। তারাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আঙুল দেখাচ্ছে, সভয়ে কি বলছে থেমে-থেমে।

মোহন শ্রীবাস্তব নেমে এল ঘর থেকে, তারপর সামনে চেয়ে

দেখে ও চোখ বুজল। কেঁপে উঠল বারবার, যেন ওর হাত-পা বেঁধে ওর ওপর মেশিনগান খালি করা হচ্ছে।

আসমুদ্র হিমাচল ভারত-উপদ্বীপের সবটুক্ জুড়ে হাত-পা চিতিয়ে পড়ে আছে বনডেড লেবার, কামিয়া-রেণ্ডি দৌলতি নাগেসিয়ার নির্যাতিত, যৌনব্যাধিগলিত শব ঝাঁঝরা ফুসফুসের সবটুকু রক্ত বমি করে।

আজ, পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা পতাকাদণ্ড প্রোথিত করার একটু জায়গাও দৌলতি মোহনদের ভারতবর্ষে রাখে নি। মোহন এখন কী করবে? ভারত জোড়া হয়ে দৌলতি।

পা লা মৌ

॥ ১ ॥

বাসমোতি ভুঁইন গনু ভুইয়ার মেয়ে। চৈনপুর থানার কোঠিবাড়িতে ওদের বাড়ি। মূলগ্রাম খারহা। সেটি, পালামৌয়ে যেমন হয়, তেমনি উচ্চবর্ণের গ্রাম। ব্রাহ্মণ ও রাজপুত বসতি গ্রাম। বাসপথের ধারেই গ্রামটি। ব্রাহ্মণদের ঘর কম করে সত্তরটি, রাজপুতদেরও বাহান্নটি।

দুই জাতির বসতি মাঝে রাস্তার ব্যবধান রেখে! খারহার যথেষ্ট নামডাক আছে। কিন্তু একটি ক্ষেত, বোর নদীর খাত ও বাঁজা পাহাড়ী জমি পেরিয়ে কোঠিবাড়ি ও বোর টোলি দুটির কথা না বললে খারহার কথা বলা যায় না।

কোঠিবাড়িতে ভুঁইয়ারা থাকে। বোর হল খারোয়ার আদিবাসীদের বসতি। কোঠিবাড়ি ও বোর এ-ওর সঙ্গে লাগাও। কোঠিবাড়ির শেষ যেখানে, বোরের শুরু সেখানে। এই টোলি দুটি খারহার মধ্যেই।

কিন্তু ভুঁইয়ারা অন্ত্যজ, খারোয়াররা আদিবাসী। ওদের সঙ্গে তো উচ্চবর্ণ বাস করতে পারে না। তাই নিরাপদ দূরত্বে ওদের টোলি।

পালামৌ জেলাতে এই রীতি খুবই প্রচলিত ও স্বীকৃত। গ্রামের নাম যাই হোক, নামধারী গ্রামে থাকে উচ্চবর্ণ। অন্ত্যজ আদিবাসী ও মুসলিমরা থাকে দূরের টোলিতে। মানুষ নামকরণে বিশ্বাসী, তাই টোলিগুলিরও নামকরণ হয়। নাম দিলে টোলির বাসিন্দা হতভাগ্য মানুষগুলির মনে হয়তো খানিক শান্তি হয়।

কেন এরা আলাদা গ্রামে থাকে না, উচ্চবর্ণের লোকরা এদের যখন কাছে থাকতে দেয় না ? এ কথার উত্তরে খারহার বিশ্বম্ভর পাঁড়ে বড়ই ব্যথা পায়, ও তার ছেলে সুচেতের দিকে চেয়ে থাকে। এ রকম একটা গাধা তার ছেলে হয়ে জন্মায় কেমন করে, তা সে ভেবে পায় না। সে বলে—আলাদা থাকবে কেন ?

—আলাদাই তো আছে।

—আরে মূর্খ! আলাদা টোলিতে আছে, আলাদা গ্রামে কেন থাকতে যাবে ?

অচ্ছুত তো ওরা।

—ওরে মূর্খ! এখন তো সত্যযুগ নেই, ধর্মযুগও নেই। এখন বিশ দফার যুগ। কর্মযুগ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ দফা কর্মসূচী।

—সে কর্মসূচীতে অচ্ছুত আর আদিবাসীর নামে অনেক টাকা মঞ্জুর থাকছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো জানি।

—তো আমার গ্রামে ওরা আছে বলে না ওদের উন্নয়নের জন্যে টাকা আসছে।

—তাই তো আসছে।

—তবে ? টাকা আসছে বলে না আমরা পাচ্ছি।

—তাই তো পাচ্ছি।

—খারহাতে যত সিচাই কুয়া, ডি. টি. বসেছে, যত সার-বীজ আসছে, সব তো ওদের নামে। ওরা না থাকলে কি তা আসত রে উজবক!

সুচেত খুবই অল্পবুদ্ধি এবং মাথার ভিতরে সম্ভবত কিছুই নেই। দেহটি ওর বিশাল এবং শক্তিও যথেষ্ট। বাপের কাছে বারবার 'উজবক-মূর্খ-বোকা' শুনতে শুনতে ও ক্ষেপে যায়।

—দেখো বাবা! এত গাল দিও না আমাকে। আমি বোকা!

মূর্খ! উজবক! আমি পাটনার ইস্কুলে পড়েছি, তা জান? তুমি তো পাটনা টাউনই দেখ নি।

—বেশ বাবা বেশ!

বিশ্বম্ভর সুচেতকে ঠাণ্ডা করে। গজদেহ, গজমূর্খ ছেলে তার। রাগ চাপলে সর্বনাশ। তখন মারধোর খুনজখম করতে পারে।

—আমি বলছি, আমাদের তো সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন ওরা থাকলেই কি আর গেলেই কি?

বিশ্বম্ভব বলে, বাবা সুচেত! ওরা বিশ দফার কলিজা। ওরা যতদিন থাকবে ততদিন সরপঞ্চ দুধে স্নান করবে, ঘিয়ে সাঁতার দেবে। ওরা আমাদের লছমী।

এত জটিল কথা বোঝা সুচেতের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে। জন্ম থেকে তার মাথা ওইরকম। এ জন্যে সুচেতের মাকেই দায়ী করে বিশ্বম্ভর। সন্তান অপরিণত বুদ্ধি কেন হয়? নিশ্চয় মায়ের দোষে।

সুচেতের মা পাটনা টাউনের মেয়ে। সে ডাক্তারবদ্যি অনেক দেখেছে। সুচেতকে ডাক্তারী চিকিৎসা করাবে বলে সপুত্র সে পাটনায় ছিলও বছর তিনেক। ভাইরা সুচেতকে স্কুলেও ভর্তি করেছিল।

তবে লেখাপড়া ওকে করানো যায়নি। আর ডাক্তার বলেছিল, মস্তিষ্কই অপরিণত ওর।

এ কথা সুচেতের মা মানবে কি করে? তার ছেলে জন্ম হতে খাঁটি দুধ ঘি খাচ্ছে। দুধ-ঘি খেলে মগজ বাড়ে, জানে।

ছেলের বিষয়ে ডাক্তারের রায়কে ও বিশ্বাস করে নি। ওর মনে হয়েছিল, এটি ওর ভাই ও ভৌজিদের চক্রান্ত। হিংসেতে মরে যাচ্ছে সব। সুচেত বাপের এক ছেলেই শুধু নয় বংশের একমাত্র বেটাছেলে। জেঠা, কাকা, সবার নয়নের মণি। প্রত্যেকেই সুচেতকে দেবে থোবে। কে না চায় যে বংশের ছেলের হাতে ভূসম্পত্তি থাকুক?

হিংসে, হিংসে! সুচেতের রং ধপধপে ফর্সা, দেহ অতখানি, ভাইপোদের মতো সুঁটকো না কি? তার ছেলে বুদ্ধিতে খাটো? দেশে ফিরে এসে ও স্বামীকে বলেছিল, বয়স হয়েছে ছেলের। বিয়ে দাও, বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুচেতের বিয়ে হয়েছিল। খুব ধুমধাম করে। মেয়ে তখন ছোট, সুচেতের মহিমা বোঝেনি। ঘর করতে এল বড়সড় হয়ে। এসে থাকল মাত্র দশ দিন। তারপর সে যে কি কলকাঠি ঘোরাল কে জানে। বাপ এসে নিয়ে গেল মেয়েকে। আর ফেরত পাঠাল না। বিয়ে দেবার কালে অতটা বুঝি নি। এখন দেখছি ছেলে তোমাদের একেবারে মানুষেব বাইরে। মেয়ে আমি নিয়ে চললাম। ছেলেকে মানুষ করো, তারপর দেখা যাবে।

এ সবই যুগের হাওয়া। নইলে তুমি স্ত্রী, তোমার উচিত ছিল না স্বামীকে মেনে নেওয়া? বিশ্বম্ভর বউকে বলেছিল, আরে, জিত আমাদেরই।

—কেমন করে?

—আমার ছেলের আবার বিয়ে হবে। তোদের মেয়ে তো লোহা-দাগ গরু হয়ে থাকল।

—তাই দেখো, বিয়ের ব্যবস্থা দেখো।

কিন্তু কার্যকারণ যাই হোক, সুচেতের আরেকটা বিয়ের কথা কেউ বলছে না। সংসারের অবিচারে সুচেতের মা খুবই মর্মাহত। ভাসুর, দেওর কেউ বলে না একটা কথা?

হয়তো ওরা সম্পত্তির অন্য ব্যবস্থা করবে। দত্তক নেবে?

যে যার জামাই, নাতি, এদের দিয়ে যাবে? সুচেতের মা ভাবে, ভাবে, আর ছেলেকে আগলে চলে।

সুচেতের বয়স পঁচিশ হল। সে নিজে অবশ্য অতীব নিরুদ্বিগ্ন। খুব খায়দায়, খুব হেঁটে হেঁটে বেড়ায়। খুব যায় কোঠিবাড়ি ও বোর গ্রামে। যায় যখন তখন। ভুঁইয়া ও খারোয়ার মেয়েগুলিকে তার সবিশেষ পছন্দ। খারোয়ারদের চেয়েও ভুইয়া মেয়েরা ভালো।

মা বলে, যাক্ আহা যাক! কী করবে বলো? এত খায়দায়, তার গরম আছে। বয়স হয়েছে, বয়সের গরম আছে।

বিশ্বম্ভর পাঁড়ে অঞ্চল-সরপঞ্চ। তার ছেলে বলে যে সুচেতের সাত খুন মাপ, তা নয়। হৃতগরিব জেলা পালামৌয়ে এটাই নিয়ম। অন্ত্যজ ও আদিবাসী বলে নয়, গরীবের মেয়ে-বউ বড়লোকের ভোগ্য। এরকম না হলে, অন্যরকম হলে ভুঁইন-দুসাদিন-ধোবিন-খারোয়ার, পারহাইয়া মেয়েরা ভয়ানক অবাক হত। হয়তো হাসত।

হাঁ, ওরা হাসেও। ভোট নেবার সময়ে এসব ব্রাহ্মণ আর রাজপুতরা যখন হাতজোড় করে বলে প্রিয় মা! বোন! বেটি!

ওরা ময়লা আঁচলে মুখ ঢেকে হেসে বাঁচে না। ঘেন্না, ঘেন্না, থুতু দাও মুখে। জারজ সন্তানে কোল ভরে দিচ্ছ। এখন মা-বোন বলা হচ্ছে।

খারহায় ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণে-রাজপুতে, রাজপুতে-রাজপুতে প্রচুর বিবাদ আছে। তবুও ব্রাহ্মণদের অবস্থা খানিক ভালো। কেননা তাদের অধিকার পূজাপাটে। গণেশ, মহাবীর, অম্বিকা বা কৃষ্ণ, এসব মহাবিশ্বশক্তি ও মর্ত্য-মানবদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই রাষ্ট্রদূত।

'ব্রাহ্মণ' যদি নিজের ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়ে অন্য চালে চলে, তাহলে তার পরিণাম ভালো হয় না। বাঘ যদি ছাগলের চালে চলতে থাকে, কে তাকে মানবে?

কিছুকাল ধরে খুব 'বন্ধুয়া বন্ধুয়া' শোনা যাচ্ছিল। তা খারহার সবচেয়ে গরিব ব্রাহ্মণ দরপচাঁদ পাঁড়ে খুব উঠে পড়ে লেগেছিল।

দরপচাঁদ খানিকটা বেখাপ্পা খারহায়। ও স্বাস্থ্যকর্মী হতে গিয়েছিল, যেটা ঠিক কাজ হয় না ব্রাহ্মণের পক্ষে। কেননা স্বাস্থ্যকর্মী হলে তাকে যে কোনো জাতের মানুষকে ছোঁয়াছুঁয়ি করতে হয়। আজকাল ব্রাহ্মণও স্বাস্থ্যকর্মী হয়তো হচ্ছে। দশ বছর আগে এলাকায় কেউ ও কাজে যেত না ব্রাহ্মণ বসতি থেকে।

দরপচাঁদ জয়প্রকাশজীর আন্দোলনেও মেতেছিল। সে সময়েই

ও আরেকটি অসম্ভব কাজ করে বসে। বোর গ্রামে পাঠশালা খুলে বসে। অবশ্যই সেটি চলতে দেয়া হয়নি। তবু যে এমন কাজ করতে পারে তাকে কে বিশ্বাস করবে আর?

তারপর কয়েক বছর ধরে বন্ধুয়াদের জন্যে অনেক কিছু করা হবে বলে যখন শোনা যাচ্ছে, দরপচাঁদ উঠে পড়ে লাগল। কোঠি-বাড়ি বা বোরে ওদের জন্যে একটি ইস্কুল হোক। এখন তো আপত্তি করার কোনো কারণ আর থাকতে পারে না।

এটি নিয়ে সে বেদম তোড়জোড় শুরু করে। এ কাজে তো সরপঞ্চের সম্মতি চাই। গ্রামে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা সবাই বিশ্বম্ভরকে বলে, পারলে ওকে থামাও। নইলে এর পরিণাম খুব খারাপ হবে।

বিশ্বম্ভর যেহেতু সরপঞ্চ সেহেতু তাকে বলতেই হয় যে, আগে ভালো কথায় মানাতে চেষ্টা করি। তোমরা যা বলছ তা তো বুঝছি।

— দরপচাঁদজীকে পিটাতে হবে।

—ভাই সব! আমরা বাস করি ভারতভূমে আর ভারতের নীতি হল অহিংসা।

—হাঁ হাঁ! শিক্ষা দেবার জন্যে টেংরি ভেঙে দিলে সে কি হিংসা হল? কবে বলে বসবে যে বন্ধুয়াকে মারপিট করলেও হিংসা করছি। আমরা খুব জানি যে হিংসা খুব খারাপ।

—কথা তো বলতে দাও।

—বলো। তারপর অহিংসাতেই মারব।

বিশ্বম্ভর সমবেত মানুষগুলির দিকে চায়। কত সরল এরা। কত সহজ করে নিয়েছে হিংসা ও অহিংসার ব্যাখ্যা। মনে মনে স্নেহ আসে তার। সে বলে, আগে কথা বলি।

দরপচাঁদকে অনেক করে বোঝায় ও। তোমার বাবাকে দাদা বলতাম। তোমার মা আর আমার মা একই জায়গায় মেয়ে।

—হাঁ হাঁ বলুন না।

—কেন এমন কাজ করতে চাইছ?

—আরে। বন্ধুয়া তো এখন বেআইনী।

—বন্ধুয়াদের মুক্তি দেবার কথা বলছ?

—সে তো দিতেই হবে কাকা।

—মুক্তি দেবার আইন হয়েছে বটে। কিন্তু দরপচাঁদ! বেটা! ওই সর্বোদয় করে মাথা তোমার বিগড়ে গেছে। তুমি যখন জেলে তখন কি কম কাঁদত তোমার মা? আহা একটা ছেলে বিগড়ে গেলে মায়ের মন কি শান্ত থাকে, না থাকতে পারে?

—এখন কাজের কথা বলুন।

—আঃ, তোমরা বড় তড়বড় কর। কাজের কথাই তো বলছি। যদি খারহা থেকে সদরে যেতে চাও, তাহলে খানিক হাঁটছ, খানিক বাসে যাচ্ছ, তারপর কোনো লবি পেলে চেপে বসছ, এই যে পথ চলা এও তো সদরেই যাওয়া, না কি?

—হাঁ হাঁ কাকা! আপনাদের পাকা মাথা, আপনারা যেমন ধীরে আস্তে কাজের কথা বলতে পারেন, আমরা তা পারব কোথা থেকে?

—এই তো বুঝেছ। পাকা মাথা আর বয়োজ্যেষ্ঠের উপর যে শ্রদ্ধা রেখে চলে তার কখনো কষ্ট হয় না। আর দেবদ্বিজে, ভক্তি রাখতে হয়। ঘরে কি পূজাপাট রেখেছ?

—আর কে করে ও সব। মা নেই, বউটা মরে গেল, মেয়েরা পিসির কাছে—আমি দুটো ফুল মহাবীরজীকে ফেলে দিই সকালে। মা তো খুব মানত ও সব।

—একাদশী, পূর্ণিমা?

—ও সব করি না।

—খুব দুঃখ হলে শুনে। যাক গে! জেল হাজত ঘুরলে মতিগতি বিগড়ে যায়। যে কথা বলছিলাম! দরপচাঁদ! ভারত সরকার তো আইন করে দিল। কিন্তু ভারত সরকার কি জানবে বন্ধুয়ার দুঃখ? আমরা ওদের মুক্ত করে দিলে ওরা খাবে কী?

—কাজ করবে।

—কাজ মানে তো ক্ষেতিবাড়ি। কে ওদের কাজ দেবে?

সকালে যে লুকমা দিই জলপান, তাও তো পাবে না। সে কথা ভেবেছ?

—কাকা! সরকার ওদের জমি-মোষ-বীজ-সার সব দেবে।

—বেটা! ও সব কথা শোনা যায়।

—এই ইস্কুলটা হলে ওরা লেখাপড়া শিখবে। আর কোঠিবাড়িতে তো বোর্ডিংও করা যায়।

—বেটা! ওরা লেখাপড়া শিখে করবে কী? যদি বিদ্যা ওদের কপালে থাকত তাহলে উঁচু জাতে জন্মাত। এ তো বিধাতার বিধান!

—না কাকা! বিধাতার এটা বিধান নয়। বন্ধুয়া ওদের তো আমরাই বানিয়েছি তাই নয়?

—সরকার ইস্কুল মঞ্জুর করবে না।

—কেন?

—খারহাতে দুটো প্রাথমিক আর একটা মিডল স্কুল তো দিয়েছে।

—কাকা! ইস্কুল কোথায় চলে? স্কুল ঘর কোথা? পোড়ো কোথায়? হাঁ হাঁ, শিক্ষক অনেক আছে। তারা মাইনে নিচ্ছে। কেউ এ গ্রামে বসে আছে, কেউ চৈনপুরে দোকান চালাচ্ছে, কেউ রাঁকায় ব্যবসা করছে। এ সব খুব খারাপ কাজ কাকা!

—তাহলে স্কুল তুমি করবেই?

—ভারত সরকার হুকুমত দিচ্ছে, রাজ্য সরকার সব করে দেবে··· আপনি কি চান না যে ইলাকায় উন্নতি আসুক?

অনেক উন্নতি তো এসেছে। হাঁ, তুমি যদি বলো তো তোমার নামটাও ঢুকিয়ে দেব। ব্লকে কাজ পাবে।

—না কাকা! আমার জন্যে চাই না কিছু। দরপচাঁদ চলে গিয়েছিল। ওর কথার মর্মার্থ বিশ্বম্ভর তখন বোঝে নি। বোঝেনি বলে পরে যথেষ্ট হাত কামড়েছে।

তখন কিন্তু দরপচাঁদকে জব্দ করার ব্যাপারটাই মনে মুখ্য

হয়ে উঠেছিল। খুব রাগও হয়েছিল। কেন দরপচাঁদ তাকে মানবে না।

মূর্খ দরপচাঁদ এ ব্যাপার নিয়ে সদরে দৌড়াতে থাকে। কোঠি-বাড়ির গনু ভুঁইয়া বলত, মাস্টারজী! মালিক লোক আপনার কোনো ক্ষতি করবে।

—কেন? আমি কী অন্যায় করছি?

—আপনি কী করবেন? বন্ধুয়াদের সব খালাস করাবেন? তারা জমি-মোষ-বীজ আর খাদ পাবে?

—আমি কে গনু? আমি কিছু করছি না। এ সব তো আইন পাশ হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, সে কথা তো চন্দা সিং খারোয়ারও বলেছিল। কিন্তু কাজে তো হবে না কিছু।

চন্দা সিং খারোয়ার। আদিবাসী জাতি থেকে মাধ্যমিক পাশ যুবক, সংরক্ষিত এক এলাকায় সে উপগ্রামমুখিয়াও বটে। সেও বলল, সাবধানে থাকবেন মাস্টারজী।

ওদের কথাই সত্যি হল। বন্ধুয়াদের ভালাই করতে যাওয়া এবং স্বশ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে যাওয়া, এমন দ্বৈত অপরাধে গ্রামে ওকে সবাই পিটাল। অহিংসা ও হিংসা! দরপচাঁদকে মারা তো হিংসার মধ্যে পড়ে না। মেরে মেরে ওরা পা ভেঙে দেয় সবাই।

আজও দরপচাঁদ আছে। চন্দা সিং তাকে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে পারহি গ্রামের বাজারতলায় বসে। লোকের আর্জি, দরখাস্ত, চিঠি লেখে, একটি দোকানের হিসেব লেখে।

ডান পা ঠিক হয়নি ওর। খুঁড়িয়ে চলে লাঠি নিয়ে। যে সব রাজপুতরা ওকে মেরেছিল, তারা কিন্তু ওকে প্রণাম করে যায় পূজা-পার্বণে। দরপচাঁদ ওদের সঙ্গে কথা বলে না, আশীর্বাদও করে না। প্রণাম নিরত হাতে লাথি মারতেই ইচ্ছে হয় ওর। তা করতেও পারে না। মনে হয় সে কত নিরুপায়। পালিয়ে যাবে, তেমন

জায়গা নেই। যা করতে ইচ্ছে যায়, বাস্তব বিচারে তা করতে পারে না।

গন্নু বলে কোঠিবাড়ি চলে এসে থাকো। তোমার সেবা করব।

—তোদের বিপদ হবে।

—মেয়েরা যেখানে আছে, সেখানে যেতে পার না?

দরপচাঁদ মাথা নাড়ে। মা মরতে ছয় বছর আর আট বছরের মেয়ে দুটোকে ওদের পিসি নিয়ে যায়। পিসি, অর্থাৎ দরপের বোন নিজের ননদের সঙ্গেই দরপের বিয়ে দিয়েছিল। দরপচাঁদের হাতে পড়ে বউটির কোনো সাধই মেটেনি। দরপের বোন নিজে মানুষটা ভালো। স্বামী যখন বলল, তোমার ভাইয়ের কাছে থাকলে ওদের খাওয়া জুটবে না, ও বিয়েও দিতে পারবে না। ওদের নিয়ে এসো।

সে রাজী হয়েছিল। মেয়ে দুটো পিসির বড় নেওটা। সংসারে তার গম-চাল-দুধ-সবজি, কিসের অভাব? দুটো ছেলে থাকে বোর্ডিঙে। মেয়ে দুটো থাকলে তার ভালোও লাগবে, সাহায্যও হবে। মেয়েরা ইস্কুলে পড়লেও টুকটাক কাজ খুব করে। ঘরে ঘরে তো দেখছে। ছেলে ছেলে সবাই করে। কাজকর্মে সাহায্য তো মেয়েরাই করে।

দরপচাঁদ বলেছিল, ওরা বড়লোক পিসির কাছে থাকে। জামা-কাপড়, খাওয়াদাওয়া, সাধআহ্লাদ, সবই অন্যরকম। আমাকে দেখলে লজ্জা পায়।

সেবার বড় মেয়ে বলেছিল, তুমি ভালো জামাকাপড়ও পর না বাবা, আমাদের জন্যে কিছু আনো না, আমার বন্ধুদের বাবারা তো এমন নয়?

দরপচাঁদ সেই থেকে মেয়েদের দেখতে যায় না পারতপক্ষে। বোনকে বলেছিল, ওদের একটু পড়াস। খুব ছোট বয়সে বিয়ে দিস না।

—তুমি তো শুধু এক কথা বলো। মেয়েদের দিয়ে দিয়েছ, আর ভাবো কেন? ভালো ছেলে পেলেই বিয়ে দিয়ে দেব।

—ভালো ছেলে!

—আরে, আমি কি পাশ করা ছেলে খুঁজব? তাতে এখন অনে—ক টাকা লাগে দাদা। আমাকে যেমন দিয়েছিলে, আমি কি সুখে নেই?

দরপচাঁদ নিশ্বাস ফেলেছিল। খুব সুখ! অনেক মকাই, অনেক ধান, অনেক দুধ। বাড়ির বাইরের দেয়ালে সাদা চুনকামের ওপর ঘন নীল রঙে মহাবীরজীর ছবি। ঘরের জানলা ছোট, বাড়িতে খাটা পায়খানা। ছেলেরা বোর্ডিঙে থেকে পড়ছে, পাশ করলে অনেক টাকা দহেজ পাবে।

দরপচাঁদের বোনের চেহারা ফোলা ফোলা, হলদেটে। সম্ভবত রক্তাল্পতা। কিন্তু সর্বাঙ্গে অনেক গয়না, কোমরে গোট, পায়ে রূপোর চওড়া বিছে। রান্নাঘরেই ওর জীবনটা কেটে গেল। তবু ও নিজেই বলছে যে ও সুখী।

ভগ্নীপতি একটি চমৎকার আধুনিক একতলা বাড়ি করেছে। সেটি ভাড়া দেয়া হয়েছে। অত আলোবাতাসযুক্ত, জল ও শৌচাগারের আধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত বাড়িতে বসবাস করার কথা ও নাকি ভাবতে পারে না। যেমন ভাবতে পারে না একটি সংবাদপত্র রেখে পয়সা খরচের কথা। বাপের নাম রাখতে ভগ্নীপতি স্থানীয় শিবমন্দিরে চাতাল বাঁধিয়ে দিচ্ছে। দরপচাঁদ বলেছিল, হাসপাতালে বেড করে দিতে।—রাজী হয়নি।

দরপচাঁদের জীবনে গন্নু ভূঁইয়া একটি সান্ত্বনা। দুজনের কাছে দুজনে খুব দরকারী; কেউই কাউকে সাহায্য করতে অক্ষম। তবু পরস্পর পরস্পরকে খুবই ভালোবাসে। বাসমোতি ওদের দুজনের মধ্যে একটি সেতু।

॥ ২ ॥

বাসমোতি গন্নু ভুঁইয়ার মেয়ে। কোঠিবাড়িতে ওদের বাড়ি। ওরা সবাই জমিদারের জমিতে বাস করে। বাসভূমিতে স্বত্ব ওদের প্রায়শ নেই। 'জমিদার' শব্দটি ভারতের সংবিধানে নেই, জমিদারী প্রথাই উঠে গেছে, এ সব কথা পালামৌয়ে চলে না। পালামৌ আটকে আছে সুদূর অতীতে।

বোর গ্রামের খারোয়ার আর কোঠিবাড়ির ভুঁইয়া, এদের অবস্থা একইরকম। মালিকরাই ওদের কাছে জমিদার। খারহার ব্রাহ্মণ আর রাজপুতরা এই ভুঁইয়া ও খারোয়ারদের মালিক। এরা ওদের বন্ধুয়া। এদের বন্ধুয়া হবার ইতিহাস এতই পুরনো এবং প্রচলিত ব্যাপার, যে 'আকাশ নীল, হাওয়া বয়, সূর্য ওঠে', এ সব সত্যের মতোই সত্য।

তবে চন্দা সিং খারোয়ারের কাছে কিছু পুরনো কথা শোনা যায়। চন্দা সিং-য়ের কাছ থেকে বোর গ্রামের মাধো সিং খারোয়ারও সে সব কথা জেনেছিল। ফল ভালো হয়নি। মাধোকে ঘর ছেড়ে টোলি ছেড়ে চলে যেতেও হয়েছিল একদিন। তার জন্মে অবশ্যই বাসমোতি দায়ী।

বাসমোতির বয়স যখন ছয়, তখনি তার বিয়ে হয়ে যায়। দেশ জুড়ে বিয়ের মৌসুম পড়ে। পাঁজি বিচারে দেখা গেল এই দুই মাসে ভুঁইয়াদের, দুসাদদের, গঞ্জুদের বিয়ে হতে পারে। অবশ্যই উচ্চবর্ণের বিয়ের মৌসুম পড়বে অন্য মাসে। একই সঙ্গে তো উঁচু-নিচু দুই জাতের বিয়ের মরশুম পড়তে পারে না। এ সব ব্যবস্থা স্বয়ং বিধাতার। বস্তুত, বিশ্বম্ভর ভেবে পায় না, যে দরপচাঁদ কোন্ যুক্তিতে বলে, জাতিভেদ চলবে না।

নিশ্চয় চলবে। ভগবান চান, তাই চলুক। ভগবান কে, সেই এক ও একমাত্র ঈশ্বর, তাও জানা কঠিন। বিশ্বম্ভর ভগবান বলতে ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি মহাবীর, শিব, অম্বিকা, এঁদের বোঝে। গৌণ প্রতিনিধি পঞ্জিকাকারকরা। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিচ্ছা মেনে তবে মানুষকে 'কবে কী করণীয়' তা জানায়। ভগবান জাতেবর্ণে ভেদ চান বলেই সাদিয়ার মরশুম করেছেন।

হাটতলায় পঞ্জিকাকারকের প্রতিনিধি ডেকে হেঁকে বিয়ের মরশুমের খবর দেয়। হুম্ করে বিয়ে ঠিক করতে হল। বারাহি গ্রামের ননকু ভুঁইয়ার সঙ্গে। দশ বছরের বর এবং ছয় বছরের কনে। ননকুর বাপ ও বাসমোতির বাপ, দুজনেই বন্ধুয়া। কবেকার ঋণ কত হয়েছে কেউই জানত না। আবার নতুন করে মালিকের কাছেই ঋণ নিতে হল।

কি আর করা যায়? নতুন কাপড়, কিছু লাড্‌ডু কচৌরি, বরাতকে দাওয়াত, এ সব ব্যাপার তো থাকবেই। তা তখন তেমন বিয়ে করতে তিনটি বর কোঠিবাড়ি গ্রামে আসে।

মালিকেব কাছে একটি মোষ চেয়ে নেওয়া হয়। মোষের কোনো কষ্ট হবে না, তাকে খড়বিচালি খাওয়ানো হবে, এমন অনেক শর্ত ছিল। মোষটিকে সসম্মানে হাঁটিয়ে কোঠিবাড়ির কাছে এনে তবে তার পিঠে তিনটি বালক বরকে বসানো হয়, এবং হঠাৎ শিঙা ও কাঁসর বেজে ওঠে। সে শব্দে চমকে উঠে মোষটি দৌড় লাগায় ও দৌড়ে দৌড়েই কোঠিবাড়ি প্রবেশ করে।

বিয়ের কথা বাসমোতির মনে পড়ে না। ঘর করতে যাবার তখনো কয়েক বছর দেরি ছিল। গমু বাসমোতিকে একটি হেঁসো ও একগাছা দড়ি ধরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, চল্ আমার সঙ্গে। ঘাস কাটবি, বাজারে নিবি। পাহাড়-পাহাড় চলে যাবি। মালিক লোক দেখলে ছিনিয়ে নেবে।

বোর নদী গরমে শুকায়, বর্ষায় ভাসে। তবু প্রখর গ্রীষ্ম না পড়া অবধি বোরের বুকটি সরস থাকে, ঘাস জন্মায়। নদীর বুকে

ঘাস, সে তো মালিকদের জমিতে নয়। তবু মালিকরা ওদেরকে বাজারে নিতে দেয় না ঘাস।

এরকম তো হয়েই থাকে। এটাই পালামৌয়ের নিয়ম। কয়েক শত বছর ধরে এমনিই চলছে। চেরো বা খারোয়াররাও ছিল বহিরাগত। কিন্তু তাদের সময়ে এমন করে পালামৌয়ের মাটিতে গরিবির বীজ রোপিত হয়নি, আসেনি ঘৃণ্য কামিয়ৌতি প্রথা, যা মানুষকে দাস বানায় জন্ম জন্ম ধরে।

এ সব কথা মাধোর জানতে অনেকদিন লেগেছিল। মাধোই বলেছিল বাসমোতিকে। মাধো বাসমোতির চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ই হবে। ওরা কয়েকজন একই সঙ্গে বোর নদীর খাত থেকে ঘাস তুলত, দড়িতে বাঁধত। তারপর খানিক পাহাড়ী পথ, খানিক নদীর খাত ধরে চলে যেত হাটতলা।

দরপচাঁদের কাছে জমা করে দিত বোঝাগুলো। মাস্টারজী, দেখে নাও, গুনে নাও, দশ পয়সায় একেক বোঝা বেচবে।

বাসমোতির পরনে কোনোদিন এক টুকরো লুঙ্গি, কখনো চেয়ে মেগে নেয়া একটা শার্ট ও ইজের, প্রায়ই কোমরে লম্বা একটি নেকড়া আঁটসাট কাছা দিয়ে পরা। তামাটে চুলগুলো কপালে নাচত।

দরপচাঁদ গন্নুকে বলত, এইটুকু বয়স থেকে ও যা কামাই করছে, তা খরচ কোরো না।

—না না, জমিয়ে রাখুন না আপনি। আপনি বাসমোতির ব্যাঙ্ক বনে যান না কেন। গওনার সময়ে যখন টাকা লাগবে, ওর টাকা থেকে কোনো বাসনবর্তন হতে পারে।

—ভৈয়া! এও খুব চিন্তা করবার কথা। তোমরা গরিবির কারণে দশ-বিশ-একশো টাকা করজ নিয়ে ছেলে-নাতি-নাতির ছেলে, সকলকে বন্ধুয়া বানিয়ে দাও।

—হাঁ হাঁ মহারাজ, তাই তো হয়।

—নিজেও দাস বনে যাও, আর বংশে যারা জন্মায়নি তাদেরকেও দাস বানিয়ে জনম দাও।

—বড়ই হতভাগা আমরা।

—ভুখার কারণে করজ নাও, অসুখবিসুখে নাও, তা বুঝি। কিন্তু বিয়ে-সাদী-গওনাতে-শ্রাদ্ধশান্তিতে—ধারকরজ করে বন্ধুয়া বনে এ সব কাজে খরচ কর কেন?

—খুব ঠিক কথা মাস্টারজী মহারাজ! এ সব কথা খুবই ভালো কথা। তা শালা বন্ধুয়া লোকরা বুঝবে? সবাই খুবই খচড়াই।

গনুর কথা বলার ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর। যেন ও নিজে বন্ধুয়া নয়, এবং বিয়ে-সৎকার-শ্রাদ্ধ, এ সব কাজে সে কর্জ করে চলে না।

গনু সরাসরি বিশ্বম্ভরেব বন্ধুয়া। ও ভালোই জানে যে, যতদিন বাঁচবে, ওর মুক্তি পাবার কোনো আশাই নেই। অন্য-দের চেয়ে ওর অবস্থা এই জন্যে ভালো, যে ওর ছেলে কখনো বন্ধুয়া হবে না। আট বছর বয়সেই ও শহরে এক ভকিলবাবুর বাড়ি চাকরের কাজ করতে যায়। ভকিলবাবু ওকে খানিক লেখাপড়া শিখিয়েছেন, এক বন্ধুর ছাপাখানায় কাজ শিখতে দিয়েছেন।

মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি। রইল ও আর তেতরি, স্বামী-স্ত্রী। তা গনুব ঠাকুর্দা বিশ্বম্ভরের ঠাকুর্দার কাছে এক শ্মশানসদৃশ খরা-আকালে বিশ টাকা নিয়েছিল। ফলে কোঠিবাড়িতে এক টুকরো পালহাতু জমি আর বাস্তু পেয়েছিল। পালহাতু জমি সাধারণত মালিক লোক তাদের বন্ধুয়া লোকদের বন্ধুয়া থাকাকালীন মেয়াদী স্বত্বে দেয়। পালহাতু জমি কখনো সরস সজীব হয় না।

বানঝারা টাড় জমি, যাতে জল দাঁড়ায় না। পাথর ও কাঁকরে যা রুক্ষ, তাই পালহাতু হিসেবে দেয়া হয়। পালহাতু বা বাস্তু কোনোটাই বন্ধুয়ার হয় না। বাস্তুর জন্যে তাকে খাজনা দিতে হয়। পালহাতুর ফসল বন্ধুয়ার প্রাপ্য। তবু মালিক মাঝে মাঝে সে ফসলের খানিক আশা করে। গনুকে একবার বিশ্বম্ভর চেপে ধরেছিল, পালহাতুতে কি ফলাস তা দেখতে পেলাম না।

তেতরি সন্ধ্যেবেলা একটি টুকরি বোঝাই করে কিছু চোরকাঁটা ও কিছু পাথর নিয়ে সরপঞ্চের বাড়ি গিয়েছিল। সুচেতের মাকে

বলেছিল, পালহাতু জমিনে অনেক ফসল হচ্ছে, আমরা খুব খাচ্ছি, মালিকের চিন্তা উঠে গিয়েছে।

—তাই এনেছিস?

—তাই এনেছি।

—দেখি, দেখি। দেখে সুচেতের মায়ের গালে হাত। নেহাৎ তেতরির ঘরে বিশ্বম্ভর একদিন যেত। আর এখনো তেতরি তেলপড়া-জলপড়া জানে, ওষুধ করে নানারকম—তাতেই সুচেতের মা ওকে লাথি মারেনি।

বাসমোতিকে ওদের বন্ধুয়া করে নেবার জন্যে বিশ্বম্ভর ও ওর বউ খুব চেষ্টা করেছিল। গনু রাজী হয়নি। বিয়ে দিয়েছি, চলে যাবে!

মালিক বলছে, বন্ধুয়া করে দে মেয়েকে। বন্ধুয়া সে কথা এড়িয়ে যাচ্ছে, এমনটি আগে ভাবা যেত না। কিন্তু নানা কারণে হাওয়া পালটেছে। এ সব কারণে দরপচাঁদ ও চন্দা সিং খারোয়ারের ওপর বিশ্বম্ভরের খুবই রাগ। চন্দা সিং শহরে যায়, ম্যাট্রিক পাশ আদিবাসী ছেলে, সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে উপমুখ্য হয়েছে। সে বলেছে, আইন নেই। কোনো করজ শুধবার দরকার নেই। বন্ধুয়া হয়ে তো পেটে খাবার, পরনে কাপড়, বাস্তুতে স্বত্ব পাও নি। উপোস কর, বউ-মেয়ে-বোনের ইজ্জতও রাখতে পার না। টাউনে যাও, ট্রেনে চেপে বাইরে যাও। পেটে খেতে পাবে। আর এটাও দেখে এসো যে পালমৌ ছাড়া ভারতভূমে আরো জায়গা আছে।

খারহা এখন টাউনের হাওয়া পাচ্ছে। ওরা চলে গেলে বন্ধুয়া মিলতে পারে, না মেলে যদি?

বাসমোতিকে নেবার কথা আর বলেনি সরপঞ্চ। তবে এ কথা বলেছে, মেয়ের বিয়ে হয়েছে, সে বড় হচ্ছে। কেন মাধো সিং খারোয়ারের সঙ্গে ঘুরে ফিরে? হারামি ছেলে, দরপচাঁদের কাছে পড়তে শিখছে।

—ছোটবেলা থেকে তো একসঙ্গে দুই টোলির ছেলেমেয়ে মিলে-মিশে মালিক!

বিশ্বম্ভর সরপঞ্চ, স্বরূপ সিং মুখিয়া। ব্রাহ্মণ-রাজপুত লড়াইটা খুব চলে এখানে। স্বরূপ বলে, বাসমোতির জন্যে কি আপনার লালচ, না সুচেতের?

—ছি ছি এ কী কথা?

—ব্রাহ্মণ আপনি। যা করবেন তাই মানিয়ে যাবে। আর আমার ভাই কি করল, বিচার বসালেন।

—সে মেয়েটা ধোবিন্ ছিল ভৈয়া।

—আলো নিভালে সবাই সমান।

এ কথা বলে স্বরূপ হাসে ও বিশ্বম্ভরের লালিত বিশ্বাসে আঘাত হানে। ব্রাহ্মণ যখন জমিমালিক, সে বন্ধুয়া রাখবেই। বন্ধুয়া না রাখলে জমির কাজ কে করবে? উচ্চবর্ণের লোক তো হাতে লাঙল ধরবে না। মজুর লাগানো খুবই ব্যয়সাধ্য। বলতে গেলে এক মুঠো খোরাকি দিয়ে কাজ উঠাবার ব্যবস্থা বন্ধুয়া প্রথা।

বন্ধুয়া রাখলে উচ্চবর্ণের লোক অনেকভাবে নিজেকে বলীয়ান ভাবতে পারে। সে বন্ধুয়া একজনকে রাখল, গোটা পরিবারকে দাস খাটাতে পারে। ওদের বোন-বউ-মেয়েকে ভোগ করতে পারে। কারো নিজস্ব রায়তী জমি থাকলে তার ফসল কেটে নিতে পারে। ঘর জ্বালাতে পারে, মেরে ফেলতে পারে।

এ ভাবে বহুজনের কোতকচ্ছলের কর্তা হয়ে থাকলে রক্তে মদ-মত্ততা লালন করা যায়। পালামৌয়ে এ সব করার হাজার সুবিধা। এখানে কোনো আন্দোলন নেই। এ জেলায় সরকার থেকে সমাজ, কেউ ভাবে না গরিবের কথা।

বন্ধুয়ার পরিবারের মেয়েদের ব্রাহ্মণ বা রাজপুত মালিক অবশ্যই ভোগ করবে। নিখরচায় ভোজ। রেণ্ডিবাড়ি গেলেও পয়সা দিতে হয়। এখানে সবই বিনামূল্যে।

আর অন্ত্যজ মেয়েদের ধর্ষণকর্তা যদি ব্রাহ্মণ হও, তাহলে নিয়ম একটাই।

ঘরে বাতি থাকবে না। আলোতে অন্ত্যজকে দেখলে ব্রাহ্মণের জাত থাকে না। স্বরূপ সিং সে কথাটাই ঠেস দিয়ে বলে গেল।

গনুরও মনে হল, বাসমোতি বড় হচ্ছে। যে কোনো দিন গওনা হতে পারে। ও মেয়েকে বলল, মৈয়া! তুই তো শ্বশুরাল যাবি। এখন মাধোর সঙ্গে মেলামেশাটা ভালো দেখায় না।

কোঠিবাড়ি ও বোর-এর নামে যেহেতু খাতায় কলমে চারটি পঞ্চায়েতি কুয়া মঞ্জুর হয়েছে, সেহেতু দুটি টোলিতে একটি কুয়োও নেই। দুটি টোলির লোকজনের ভরসা একটি কুয়ো। সেটি বহু প্রাচীন।

স্বরূপ সিংয়ের ঠাকুর্দা এই কোঠিবাড়ি টোলিতে এক কোঠিবাড়ি করেছিল। সেটি দীর্ঘকাল আগেই ভেঙে পড়েছে। সে যে কুয়া কাটায়, সেই আধমজা কুয়ার বিস্বাদ জলই ভূঁইয়া ও খারোয়ারদের স্নান-পান-রান্না-গরুর তৃষ্ণানিবারণ, সকল কাজে লাগে।

বাপের কথা শুনে বাসমোতি কিছু বলল না, কথাটাকে গুরুত্বও দিল না। বালতি-দড়ি-কলসি নিয়ে জল আনতে গেল। বাবা এখনি মালিকের জমিতে চলে যাবে। মা গেছে নিড়ান দিতে। ভাই তো টাউনে থাকে, কখনো আসে না। বাসমোতির গওনার সময়ে আসতে পারে। বাবা ভাইয়ের বিয়ে দেবে কি না তাও বোঝে না বাসমোতি।

এখনো তার জীবন এই কোঠিবাড়ি, বাপ-মার সংসার, বোরের বুকে ঘাস কাটা, শাকপাতা কুড়ানো, হাটতলায় দরপচাঁদজীর কাছে যাওয়া, আর মাধোর সঙ্গে কেবলই দেখা হয়ে যায়, কেবলই। কুয়োতলায় মাধো বলল, তোকে জল তুলে দিই? জল কত নিচে চলে গেছে।

—না। তুই জল দিবি না।

—কেন, রাগ হল?

—না!

—তবে?

—আমি শ্বশুরাল যাব…আর, আর আমি বড় হয়েছি। এখন তোর সঙ্গে কথা বলা ঠিক নয়।

—তুই শ্বশুরাল যাবি?

—যাব না?

—ননকুটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

—কী করেছে? বাসমোতির হাসি পেল।

—টাউনে যাচ্ছে। সনাতন সিংয়ের টাউট হয়েছে। সনাতন সিং বহোত দাগাবাজ দাঙ্গাবাজ লোক। কাউকে ভয় পায় না।

—সে রাজপুত?

—নিশ্চয়।

—তবেই তো বোঝা গেছে যে তুই ঠিক কথা শুনিস নি। ভূঁইয়া কেমন করে রাজপুতের টাউট হতে পারে? কখনো হয়েছে?

—আরে! চেনপুর থানায় এখন সরকারী খাদানও চলছে আর সেখানে সনাতন সিং, বাপ্ রে! দশ-বিশটা চুলাই-ঠেক খুলেছে। ননকু তো সেখানে টাকা তোলে এখন। সিনেমার মতো চুল কেটেছে, তেমনি জামা পরে, ঘরে থাকেই না।

—অনেক টাকা হয়েছে?

—হলে তার হয়েছে। বাপ, ভাই, মা ভৌজি, সব তো মুনাবর সিংয়ের বন্ধুয়া।

—কী, গ্রাম ছেড়ে দিয়েছে?

—সেই রকমই।

—গেলে পরে জানা যাবে।

—তুই যাবি না।

—বাঃ! বেশ কথা। কী করব?

মাধো সিং খারোয়ার মাথায় লম্বা, দীঘল দেহ তরুণ। নাকটা চাপা, চোখটা হাসি হাসি। মাধোরা ছিয়াত্তর সালেই বন্ধুয়া থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তারপর তো অনেক কথা। মুক্ত দাসদের জন্যে

সরকার নাকি অনেক কিছু দিয়েছিল। সে খুবই তামাশার কথা। সরপঞ্চ সব মেরে দেয়।

আর কাজও মিলছিল না সেখানে। ওরা এখানে চলে আসে। খারোয়ারদের মধ্যে এমন পরিবার ওই মাধোরা। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্ধুয়ার বাঁচার উপায় এখনো, অন্য কোনো মালিকের হাতে করজ নিয়ে নতুন করে দাস হওয়া। তবে মাধোর বাপ আর চন্দা সিং কেমন যেন জ্ঞাতি হয়। চন্দা সিং খারোয়ার সমাজে, অন্তত এ অঞ্চলে, কহায়বলায় লোক। তার জ্ঞাতি মাধোর বাপকে খারহার কোনো ব্রাহ্মণ বা রাজপুত বন্ধুয়া করে নি। কোমরে নেংটিসর্বস্ব যে লোককে ভারত সরকার মুক্ত করে দেয়, তাকে আবার ঋণশর্তে বাঁধা বোকামি।

মাধোর বাপকে বিশ্বম্ভর কিন্তু ফেলে নি। বাপ ও ছেলে মিলে খারহার মালিকদের ছাগল ভেড়া হাটে নেয় ও বেচে। প্রতি জানোয়ার পিছু তাদেব প্রাপ্য এক সিকা। মাধো খানিক পড়তে জানে, হিসাব বোঝে, এটা ফেলনা নয়। তা ছাড়া জঙ্গল আছে। পারমিট নাও, কাঠ বেচ।

কিন্তু মাধো বলল, তুই যাবি না শ্বশুরাল।

একথা শুনে বাসমোতি আর নেই। বাঃ, তবে সে কী করবে ?

—আমি তোকে নিয়ে পালাব।

—পালাবি ?

বাসমোতি নাকের পেতলের ফুলটি খুঁটতে শুরু করেছিল। এ কথাটা অন্যরকম। মাধো হাল্‌কা আর আল্‌গা কথা বলার ছেলে নয়। মাধোর সঙ্গে ও অনেকদিন ঘাস কেটেছে, হাটে গিয়েছে। অন্যরাও সঙ্গে থাকত। তবু মাধো যে ওকে একটু বিশেষ চোখে দেখে তা তো বাসমোতি বুঝছিল। বন্ধুয়া মেয়ে দশ বছর থেকেই শরীর-সচেতন হয়ে যায়। মালিকরা দশ বছরের মেয়ে দেখলেই ঠোঁটে দাঁতে শব্দ করে। বলে, এ ছোকরিকে হম্ লে লিয়া করবেই গা।

এ সব মন্তব্য শুনতে শুনতে বন্ধুয়া মেয়েরা শরীর বিষয়ে সচেতন হয় রজস্বলা হবার আগেই। ওদের তো শৈশব বলে কিছু থাকে না।

বাসমোতি বসে পড়েছিল কাপড় কাচার পাটা যে পাথরটা, যেটা দেখলে আবছা আঁধারে মনে হয় ঠিক একটা বড়সড় শুওর ঘুমোচ্ছে, সেটার ওপরে। কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে ও ভেবেছিল কি যেন। না। ননকুর বিষয়ে ওর কোনো অনুভূতি নেই। 'ননকু' একটি নাম, যে নামের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল একদা। কিন্তু ধর্মাধর্ম নেই? মা-বাপের কথা ভাবতে হবে না?

বাসমোতি বলেছিল, ও কথা তুই ভুলে যা মাধো। এমন করলে কোঠিবাড়ি আর বোব এ-ওর দুশমন হয়ে যাবে। মালিকরা বিচার বসাবে।

—মালিক! ওহি 'মালিক' নামটার ওপর আমি থুক ফেলি বাসমোতি। এ কথা বলে মাধো চলে গিয়েছিল। বাসমোতিকে সে যথেষ্ট উদাস ও আনমনা করে রেখে যায়।

সম্ভবত মাধো আরো কিছু জেনেছিল, যা সে বলেনি। বাসমোতি জানেনি, গনু জানেনি, তেতরি জানেনি, কিন্তু অনেকে জেনেছিল।

যেমন স্বরূপ সিংয়ের ছেলে দামোদর। কোঠিবাড়িতে যারা সরপঞ্চের বন্ধুয়া নয়, তারা স্বরূপের বন্ধুয়া। বোব টোলিতে খারোয়াররা খারহা গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের বন্ধুয়া।

মালিকদের জমিও এক জায়গায় নয়, বন্ধুয়ারাও ছড়ানো ছিটোনো।

দামোদর সিং খারহা গ্রামের পক্ষে বড় বেশি ঝামেলার হয়ে উঠেছিল। কেন না গর্ভিনী স্ত্রীকে লাথি মেরে মেরে ফেলার পর শ্বশুর তার নামে কেস করে দেয়। শালীকে বিয়ে করে তবে সে কেস মেটায়, এবং কি আশ্চর্য, তারপরেই বিয়েতে প্রাপ্ত দহেজের টাকা নিয়ে সে হরিয়ানা চলে যায়।

হঠাৎই যায় এবং হঠাৎই ফেরে সনাতন সিংয়ের চামচা হয়ে। সনাতনের দুটি ঠিকাদারি দামোদরের নামে মঞ্জুর। শোনা

যায় সে এখন জীপে চেপে বন্দুক হাতে ঘোরে সনাতনকে পাহারা দিয়ে।

সনাতন বলেছে, লোকাল ভাটিউটি কম পয়সার কারবার। কিন্তু সেখানে দখল রাখা খুব দরকার। ওটা তুমি দেখো। লোকাল লোক দিয়েই চালাও।

দামোদর জানে, যে সনাতন তাকে নামে ঠিকাদারি দিয়েছে, নাফা সনাতনের, বাট্টা দামোদরের। হরিয়ানাতে সনাতন খানিক ফেঁসে গিয়েছিল, দামোদর সে সময়ে হাজার দুই টাকা দেয়। দেশের মস্তান, তার স্বজাতি, সে যদি বিদেশে এসে ফাঁপরে পড়ে, তাকে দেখাটা রাজপুতের কর্তব্য হয়। এ কারণেই সে সনাতনের চামচা হয়ে ফিরতে পেরেছে। সনাতন বলে, এটা তোমার কত বড় ইজ্জত তা তুমি ভাবতে পারবে না। দেখো! বর্মাশেল কোম্পানি বিলাতের, আবার ভারতেও ছিল। কিন্তু আমার কাকার শালা বিলাতে বর্মাশেলের চাকরি পেয়ে ভারতে এসেছিল। তাতে তার ইজ্জত বেড়ে গেল।

—তা তো বাড়বেই।

—সনাতন সিং খোদ এম পি-র ছেলে, যে এম. পি যে কোনো দিন মন্ত্রী হবে। তার চামচা হবার জন্যে টাউনের আর জেলার বড় বড় লোকের ছেলেরা লাইন লাগাচ্ছে। কিন্তু বিধাতার তামাশা! আমি ফেঁসে গেলাম হরিয়ানায়, আর সনাতনের জুতো ঝাড়লে যে টাকা বেরোয় সেই দু হাজার টাকা দিয়ে তুমি বনে গেলে চামচা।

—এই তো নসিব!

—তা ঠিক আছে দামোদর। তুমি স্বজাতি, তোমাকেও আমি দেহাতের দখল দিলাম। তুমি লাইন করে নাও, আমি দেখতে যাব না।

—দেহাতে কী আছে?

—আরে! লাইন কি আমি বলে দেব? দেখো, চোখ খোলা

রাখো। আর তোমারও কিছু চামচা ওখানে বানিয়ে নাও। ঝামেলা পাকাবার লোক সর্বত্র আছে।

দামোদর খুব তাড়াতাড়ি লাইন করে নিল। সব চেয়ে ভালো পুরনো ব্যবসা, যা সমাজে চালু আছে। সেই ব্যাপারেই ও ননকুকে পেয়ে যায়। ননকু বর্তমানে দামোদরের কল্যাণে ভালোই লাইন পেয়েছে।

অবশ্যই বাসমোতি এত কথা জানত না। বাসমোতির মন বড়ই উদাস ও আনমনা থাকছিল। নইলে সে বুঝতে পারত, তাকে গওনা সেরে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার জন্যে বাপ এত ব্যস্ত কেন।

ভীষণ, ভীষণ ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল গনু। ছেলেকে খবর পাঠিয়েছিল। দরপচাঁদজীর কাছে সতের টাকা জমেছে বাসমোতির। রাম কিছু আনুক। বাকিটা না হয় গনু আবার কর্জ করবে। চেনাজানা খাতিরের লোক একমাত্র দরপচাঁদজী। সে যে কিছু ধার দিয়েও সাহায্য করবে, এমন সঙ্গতি তার কই ?

দরপচাঁদ অবশ্য ওকে অতীব অভিভুত করে একশোটি টাকা দিল। বলল, নিজের মেয়েদের কাছে পাই না। ওই আমার কথা একবার শুধাত, কখনো উঠান গোবরমাটি করে দিত, কাঠ কুড়িয়ে রেখে যেত। এ টাকাটা ওকে দিলাম।

তারপর বলল, গওনা হয়ে যাক। তারপর গনু! তোমাদের হিসাবটা নিয়ে বসতে হবে।

—বন্ধুয়াদের হিসাব!

—হাঁ গনু। আর এবারে তশীলদার, সরপঞ্চ, সকলকে নিয়ে ব্লক অফিসার যখন আসবে, তখন ভয় করলে চলবে না। বলতে হবে যে আমরা সব বন্ধুয়া, আর আমাদের মালিকের মধ্যে ওই সরপঞ্চও আছে। না বললে তো মুক্তি পাবে না।

—করজ ?

—কিসের করজ ? ঝাবিলালের ঠাকুর্দা স্বরূপের ঠাকুর্দার কাছে

পনেরো টাকা করজ নিয়েছিল। তাতে সে খাটল বিশ বছর। তার ছেলে পনেরো বছর খাটল, মরেও গেল। এখন ঝাবিলাল পঁচিশ বছর খাটছে। পনেরো টাকার করজ ষাট বছরে শোধ হয় না? মাধোকে আমি সব লিখিয়ে দিয়েছি।

—তারপর?

—সরকার তো দেবে।

দেওতা! তুমি তো বালকের মতো কথা বল। যত সরপঞ্চ, মুখিয়া, সব তো বন্ধুয়া রাখে। কে বন্ধুয়া সে খবর সরকার ওদের কাছেই নেয়। হাঁ হাঁ, কানুন দেখাবার জন্যে অফিসারও আসে। তা মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে কে বলবে, যে আমি বন্ধুয়া, ও আমার মালিক?

জানি, জানি।

—আর কানুন তো উঁচাজাতের তামাশা, দেখো, ফুলোহারে কী হল তখন! তিন-চারশো বন্ধুয়া, তা মুক্ত করল একশজনকে। তখন কী হল আপনি তো সব জানেন।

—হাঁ হাঁ সরকার যত মদত পাঠাল, সব ওই সরপঞ্চের হাত দিয়ে। আর সবই মেরে দিল সরপঞ্চ।

—ওরা না পেল মদত, না দিল ওদের কেউ কাজ। ওরা চলে গেল ঠিকাদারের সঙ্গে কোথায় কয়লাখাদানে কাজ করতে আর তো ফেরেনি।

—কিন্তু গনু! ওই ভয়ে যদি বন্ধুয়া মুক্তি না নেয়, তাহলে এই দাসপ্রথা চলতেই থাকবে।

—কী করব আমরা, বলো?

গনু নিশ্বাস ফেলে। বলে, তাতে তো মাধোর বাপও কাজ পায়নি।

—সে কি না খেয়ে আছে?

—না, তা নেই।

—তোমরা কি খেতে পাও?

—না মহারাজ। বন্ধুয়া পায় শুধু লুকমা। জানি। কিন্তু কী করব তাও তো জানি না।

—পলামু জেলাটা গলে পচে গেছে বুঝলে? শহরে চলছে দাগাবাজি দাঙ্গাবাজি, খুন, চোলাওতি, রেণ্ডি-কারবার, সনাতন সিং কিনে নিয়েছে শহরটা।

—কি করা যাবে মহারাজ।

—না সেচের জল, না খাবার জল, না পথঘাট, না কোনো কলকারখানা। কতকগুলো আদমখোর জমিদার আর অমানুষ নেতার হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ফেলে রেখেছে বিহার সরকার।

—অত ভেবো না।

—গনু যে লেখাপড়া শেখেনি সে ভালো আছে। আমি তো পড়ি এখন খুব ··

--সব জানতে পারেন?

—সব কি জানা যায় গনু?

—কী পড়ছেন? বন্ধুয়া রীতি কি চলতেই থাকবে? এই রকমই?

মাধো এসে ঢুকল। সে বলল, তোমরা চালাচ্ছ বলে চলছে। তোমরা না করলে চলবে না।

—মাধো! তুই বড় ছেলেমানুষ।

—কাকা! তোমার জামাই কী করছে তা জানো? দেহাতি মেয়েদের রেণ্ডি করে দিচ্ছে, তাদের কাছে বাট্টা নিচ্ছে, দামোদরের এই কারবারে সেও আছে।

—সব জানি মাধো। শুনেছি যে সে খারাপ হয়ে গেছে। আগে অত জানতাম না। নিশ্বাস ফেলে গনু। মাথা নাড়ে। গওনার সময়ে বুঝাব তাকে। এখন তো দুনো বিপদ আমার। মালিকের ছেলে ওই বাসমোতিকে লালচ করছে।

—সে তো বুড়ি ভৈঁসি খোঁজে।

—না না, আমি ভাবে বুঝেছি।

—বাসমোতিকে পাঠিও না।

—মালিকরা ইজ্জত নেবে। গনু কাতর উদ্বেগে বলে, মাধো গনু ভুঁয়ার তো কোনো উপায় নেই।

—পালিয়ে যেতে পার না কাকা?

—কোথায় পালাব? গনু ভুঁইয়ার জন্যে তো জীবন খুবই ছোট। মালিক যদি জানে মেরে দেয়, তাহলেও তো করার নেই কিছু? ধানপুরের কথা কি ভুলে গেলি তুই? সে তো সেদিনের কথা।

—ভুলব কেন? আমি ছিলাম, তোমার ছেলে ছিল, আমরাই তো বাঁচাই।

তরুণ মাধোর মুখে তিক্ত হাসি জেগে ওঠে। বলে সরকার! কানুন! ধানপুরের কৌয়ার শাহী সিং তো সদরে মস্ত মকান বানিয়ে বসে আছে। পার্টিও করে, তাতে উপপ্রধানও আছে। কত সভাসমিতি করে মন্ত্রীদের সঙ্গে ফোটো তোলায়।

—খুব নাম ডাক।

—তার দুই বন্ধুয়াকে সে কী করেছিল?

বন্ধুয়ারা লেখাপড়া প্রায়শ জানে না। পূর্বপুরুষ বা নিজে ধারকর্জ নিলে মালিক ওদেরকে দিয়ে খাতায় টিপসহি নিয়ে নেয়, তারপর বংশানুক্রমিক ভাবে ওদের দাস বানিয়ে রাখে, কেননা ঋণ মালিকদের খাতায় কখনো শোধ হয় না। "বন্ধুয়া" সবাই।

বন্ধুয়াদের হাজার নাম চলে। সওকিয়া, কামিয়া, হরোয়াহা, চরোয়াহা। এদের ক্ষেত্রে ঋণ থাকে প্রথা হিসেবে।

সবচেয়ে হতভাগ্য ধরমারু পর্যায়ের দাসরা। পালামৌ এমন এক জায়গা, যেখানে সবই চলে। পালামৌ এক অণু-ভারতবর্ষ।

কোনো ঋণ না দিয়ে এমন কোনো বলদর্পী মদমত্ত জমিমালিক ধরেমেরে যাদের দাস বানায়, তারাই ধরমারু।

ধানপুরের কৌয়ার শাহী সিং যাদের ধরমারু করে রেখেছিল তাদের দুজন পালাচ্ছিল। দুই পলাতককে ধরে ধানপুরে ও

মৌথাবনির মাঝামাঝি পাহাড়ের ঢালে জঙ্গলে গাছের সঙ্গে বেঁধে কেরোসিন ঢেলে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল শাহী সিং।

গন্নুর ছেলে রাম, মাধো ও আরো কয়েকজন খবর পেয়ে দৌড়ে যায় বলে তারা উদ্ধার পায়। থানায়, সদরে, কেস করে কোনো লাভ হয়নি। নিরক্ষর বন্ধুয়াসমাজ ও বলদর্পী মালিকসমাজ ঘটনাটির কথা ভালোই জানে। শাহী সিংয়ের ইজ্জত এতটুকু খোয়া যায়নি। সে এখনো শহরের সব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়, শিবাজী ময়দানে স্বাধীনতাদিবসে জাতীয় পতাকা তোলার সময়ে তার ছবি ওঠে। এমন হওয়াই এ জেলায় স্বাভাবিক।

গন্নু নিশ্বাস ফেলে বলল, ওরা ছিল ধরমারু। ধরমারু লোক আমাদের চেয়েও দুঃখী। গারোয়া থানায় কাশী সিং পাঞ্জাবী শতখানেক পাহাড়িয়াকে ধরমারু করে রেখেছে। খুব অত্যাচার! চন্দা সিং বলছিল সেদিন।

—জানি।

মাধো কেন রেগে কথা বলছে তা ভেবে পায় না গন্নু। বিস্মিত হয়ে বলে, এমন তো হয়েই থাকে মাধো। শাহী সিং রাজপুত ...রাজা লোক...

—না! ওরা লুঠেরা ডাকু! পলামুতে ওরা থোড়াই রাজা ছিল। ওরা তো মোগলদের পরে ইংরেজদের পিট্‌ঠু হয়ে পলামুতে ঢুকেছে।

—এ সব কথা বলা খুব বিপদের রে মাধো! এ সব কথা হয়তো সত্যি। কিন্তু সত্যি কথা বললে, পলামুতে চলে না।

গন্নু ঠিক করল, ও ননকুর বাড়ি যাবে।

॥ ৩ ॥

বারাহিতে ননকুদের বাড়িতে ও পৌঁছল সন্ধে নাগাদ। বেয়াই-বেয়ানও বন্ধুয়া। ঘরে তো ফিরবে সন্ধের আগে। আর একটু সময় না হলে কি কাজের কথা বলা যায়?

পৌঁছে ও চমকে গেল। কেন না বেয়াই ও বেয়ান বলল, ননকুর সঙ্গে কথা বলো।

—সে ঘরে আসবে না?

—সে আসবে এই ভাঙা ঘরে। এই কুরথি-মকাই খাবে? তোমার জামাই এখন দামী লোক গন্নু!

—আমি তো কিছুই বুঝেছি না।

এ কথায় ননকুর মা বিনবিন করে কাঁদতে থাকে। তার তোবড়ানো গাল দিয়ে জল ঝরে। গভীর সহানুভূতিতে ননকুর বাপ বউকে একটি বিড়ি দেয় ও বলে, যা! চুলা ধরা! গন্নু তো খাবেদাবে! ও কিছুই জানে না। ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি বল্?

—কেউ বলে না ননকুর মা, সবাই বলে দামোদরের পিটঠুর মা, গুণ্ডার মা, গরিবের রক্তচোষার মা!

—যা যা, চুলা ধরা। আটা আছে?

—ধার করি।

গন্নু বারণ করে, কিন্তু ননকুর বাপ চোখ টিপে বাধা দেয়। বলে যাক্। কাজেকামে ভালো থাকবে।

দুজনে বিড়ি টানে। বারাহি বড় গ্রাম, চায়ের দোকান আছে। ননকুর মা লোটায় চা কিনে আনে, দুজনকে দেয়। তারপর চুলা ধরায়।

ননকুর বাপ বলে, ছেলে তো আসে না। টর্চ কিনছে, রেডিও কিনছে, নওয়াডিতে মাংস পরোটা খাচ্ছে, জামাকাপড় নিত্য নতুন।

—কোত্থেকে হচ্ছে এ সব ?

—অনেক কথা কানে আসে।

—তোমাদের দেয় না ?

—না গন্নু।

—তা হলে ?

—নিজের ছেলেকে মন্দ বলতে নেই। দেখি, বউ ঘরে এলে স্বভাব শুধরায় কি না। মালিক ছুটি দিলে তবে তো যাব ননকুর কাছে।

—আসে না কেন ?

—আমাকে আর মাকে দেখলে ও লজ্জা পায়! ওর তো চলাফেরা...

—ভৈয়া! রাজপুত দামোদর সিং কেমন করে ননকু ভূঁইয়ার সঙ্গে চলছে ?

—ননকু এখন পিট্‌ঠু কে পিট্‌ঠু। দামোদর সনাতনের পিট্‌ঠু। ননকু দামোদরের পিট্‌ঠু। বারাহিতেও আসে ননকু, ঘরে আসে না।

—কেন আসে ?

—আসে দামোদরের ট্রাক নিয়ে। ট্রাক রুখবে, মস্তানি দেখাবে, মেয়েদের বলবে, একদিন আসব। তোদের জন্যে ভালো কাপড়লত্তা আনব, চুড়ি, তেল ফিতা। সাজিয়ে তোদের টাউনে নিয়ে যাব সিনেমা দেখাতে।

—নিয়ে গেছে কাউকে ?

—বারাহি থেকে তো নেয়নি।

ননকুর মা আটার লেট্টি, বুড়ো ঢেঁড়স-লঙ্কা ও তেঁতুলের তরকারি এবং কেরোসিনগন্ধী গুড় সাজিয়ে দিয়ে বলে, কত বড় শয়তান! মালিককে বলেছে, এখন বন্ধুয়া বেআইনি। আমার কামিয়ৌতি ছাড়িয়ে দিন। তখন মালিক বলেছে, দেড়শো টাকা দিলে তবে খালাস পাবি।

—এ তো এখন মালিকরা বলছেই।

—দেড়শো পয়সা কেমন' তা জানি না এখনো। ননকু এনে, দিল দেড়শো টাকা। খালাস হয়ে গেল। কত করে বললাম বেটা! আমার আর বাপের ঋণটাও মিটিয়ে দে। তা হতভাগা বলে, আমার জওয়ানী পড়ে আছে, বন্ধুয়া ছাড়াব, ভোগ করব। তোমরা কী করবে? জওয়ান ঘোড়া ছুটে। বুড়ো ঘোড়া আর বুড়ী ভৈঁসি কি ছুটবে?

গন্নু শুকনো গলায় বলে, কোন্ ভরসায় বাসমোতিকে পাঠাব?

—সেই তো কথা।

—কিন্তু গ্রামে বা রাখি কি করে?

—দেখো, ভেবে দেখো!

ননকুর মা জিভে চুকচুক শব্দ করে। তারপর, হঠাৎ ছেলের মায়ের ভূমিকাটি বেছে নেয় সে। গন্নুকে প্রস্তুত হবার কোনো সময় না দিয়েই বলে, গওনায় বাসনবর্তন দিতে হবে কিন্তু, আর নতুন কাপড়।

—হাঁ হাঁ, দিতেই হবে।

—লাড্ডু, মিঠাই।

ননকুর বাপ বলে, হবে হবে। ছেলের খোঁজ নেই, গওনা নিয়ে কথা!

ননকুর মা বলে, বিয়ে হয়েছে যখন, মেয়েও আসবে। নইলে ইজ্জত থাকবে না বাসমোতির।

—ইজ্জত!

বাসমোতির বাপ ও শ্বশুর পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। দুজনেই পুরুষমানুষ। কিন্তু দুজনেই জানে যে বাসমোতির ইজ্জত কি কোঠিবাড়ি, কি বারাহি, দুই জায়গাতেই সমান বিপন্ন।

—যা হবার হবে! গন্নু গভীর যন্ত্রণায় বলে।

যা হবার তাই হয়। ফিরে এসে গন্নু তোড়জোড় করে গওনার।

বিশ্বম্ভরের কাছেই যেতে হয়। বিশ্বম্ভর বলে, তোকে বারবার করজ দিচ্ছি, ধারও তোর বেড়ে যাচ্ছে।

—উপায় করে দিন মালিক।

—আরে গন্নু! তোর বয়স হয়েছে, তেতরিও বুড়ি হল। তোদের দিয়ে কাজই বা কতদিন উঠবে, আর কতদিন বাঁচবি তোরা?

—তা কি বলা যায় মালিক!

—জমিজমা নেই তোর।

—না মালিক।

—ঠিক আছে। তোরা না বাঁচলে বাসমোতি এসে খাটবে তো?

—বাসমোতিকে কামিয়া করবেন?

—তোর তো আর কিছু নেই।

বাপের নেয়া করজ শোধ করতে বিবাহিতা মেয়ের মালিকের ঘরে শ্রমদান, এও চলে বন্ধুয়াজগতে। সবই চলে, সবই চলতে পারে। গন্নু আর ভাবতে পারে না। যা হয় হবে। ননকুকে বলবে, অসৎ পথ ছেড়ে দে। বউকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যা। সে বলে, যা করেন!

বিশ্বম্ভর দিয়ে দেয় পঞ্চাশটি টাকা। হাট থেকে সস্তার যে আল্‌মুনি হয়, তার বাসনবর্তন কেনা যাবে। রামকে খবর দেয় চন্দা সিং। সে যদি কিছু টাকা আনে, তাহলে ভালো! ননকুর জন্যে ধুতি কিনতে হবে, হলুদে ছোপাতে হবে। বাসমোতির শাড়িটিও হলুদ হলেই ভালো।

এ সব তোড়জোড় বাসমোতিরও ভালো লাগে। তেতরি বলে তোকে দিয়ে পূজা-উজা করিয়ে দেব। আর পূজার ফুল ননকুর বালিশের মধ্যে রাখবি। তাহলে আর মাথা ওর বিগড়াবে না।

বাসমোতি নিশ্বাস ফেলে। বলে, কাটারি দাও, দড়ি দাও।

গওনার কথা জেনে থেকে বাসমোতি সমানে লাকড়ি আনছে, শুকনো পাতা। জ্বালানী পাঁজা করে রেখে যাই, মার খানিক

আরাম হবে। ননকু নিজের কামিয়ৌতি ছাড়িয়েছে। দাদা যদি শহর থেকে টাকা আনে, হয় তো মা আর বাবার কামিয়ৌতিও ছুটে যাবে। অনেকদিন দাদা শহরে। আসে না, এলেই তো মালিক বলবে, তুইও খাটতে থাক। আজকাল বন্ধুয়া বাপ মা আর চায় না যে ছেলেও কামিয়া হয়ে জন্মভোর খাটুক।

বাসমোতি লাকড়ি আনতে গিয়েছিল। খারুহা থেকে কোঠিবাড়ি কতটুকু বা। বোর নদীটির খাত খানিক বয়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে নিচু টিলায়। সেই টিলা থেকেই বনের সীমানা। কাটা পড়তে পড়তে ঘন বন তো নেই আর। কিছু সিধা কেওনঝি, আসান, করম ও চিলবি গাছ। একদিনের গভীর ও নিবিড় অরণ্যের কঙ্কাল মাত্র। শ্বশুরাল গিয়ে বাসমোতি যদি একটা ছাগল পালতে পারে তাকে গাছের পাতা খাইয়ে তাজা করবে।

কাঠকুঠো কুড়িয়ে দড়িতে বাঁধে।

তারপর নিয়ে চলে নিচে।

পাঁজা করে রাখলে পরে বাবাকে সঙ্গে এনে দুজনে বহে ঘরে নেবে।

কাঠগুলি দুবার টেনে এনেই ক্লান্ত লাগল বাসমোতির। নদীর খাতে বসল পাথরে হেলান দিয়ে। একটু বসি একটু জিরাই, গা থেকে আঁচল খুলে বাতাস খাই।

চোখটা ওর বুজে এসেছিল। ভেতরটাও ছিল রোদে গরম। গরমে ঝিমঝিমে। দূরে বাবারা মাঠে কাজ করছে। ওদের কথাবার্তা ক্ষীণ শোনা যাচ্ছিল। তারপর সব ছায়া ছায়া। আকাশে মেঘ করল না কি? আধঘুমে বাসমোতি ভাবল করম গাছের কাছে যখন যাই, তখন তো করম দেবতার কাছে বলি, জল দাও ঠাকুর! তাই কি মেঘ করছে?

এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সে চোখ খুলে তাকিয়েছিল। সুচেত সিং। মস্ত ছায়া ফেলে বাসমোতিকে ঢেকে সুচেত হাত বাড়াল। উত্তেজনায় তার ঠোঁটের পাশে থুতু ও লালা।

—না!

—বাসমোতি ছিটকে উঠতে যায়। ঝটাপটি চলে কিছুক্ষণ। বাসমোতি মরিয়া ও বিপন্ন। সুচেতের গায়ে অসম্ভব শক্তি। রোজকার মতো আজও সুচেত বাসমোতিকে খুঁজছিল, আজ পেয়ে গেছে।

—না!

বাসমোতির গলা ক্ষীণ হয়ে যায়। সুচেতের শক্তি ভীষণ। তার সব প্রবৃত্তিই দুর্বার ও বন্য। বাসমোতির কোনো বাধাই খাটে না। এমন এখানে আগেও হয়েছে, এখনো হয়। এসব দেখে দেখে পালামৌয়ের ভূপ্রকৃতি, পাহাড়-নদী-গাছপালা, সবাই বড় ক্লান্ত, বড় নিরুৎসাহ। এক সময়ে বাসমোতি বোঝে যে সুচেত চলে যাচ্ছে। চোখ খুলে সে ঘাসগুলিকে তেমনই ঝলমল করতে দেখে এবং ধীরে ধীরে উঠে বসে। তারপর ও চমকে ওঠে।

সুচেত, সুচেত ফিরে আসছে। ফিরছে কেন? সুচেত কাছে এসে দাঁত বের করে হাসে ও পরক্ষণেই নিচু হয়

কী জন্যে নিচু হচ্ছে? ও, খৈনির রূপোর ডিবেটি পড়ে গেছে। সুচেতের হাতটি খুবই কাছে এখন। বাসমোতি ভেবেও দেখে না কী করছে। নিমেষের আগুনে এক নিমেষ জ্বলে উঠে ও কাটারি দিয়ে সুচেতের হাতে মারে। কবজি থেকে রক্ত ছিটকায়। বাসমোতি কাটারিটি তুলে নিয়ে আঁচল টানতে টানতে পালায়। সুচেত বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি চেপে ধরে ছুটতে থাকে।

বাসমোতি ঘরের ছামুতে গিয়ে কাপড় গুছিয়ে পরে কাটারিটি চালের ছনে গোঁজে। তারপর দৌড়য় বোর গ্রামের দিকে। মাধো যদি ঘরে না থাকবে, তাহলে এমন বিপদে তাকে কে বাঁচাবে?

মাধো ঘরেই ছিল। উঠানের সিধা গাছটির নিচে খাটিয়ায় শুয়েছিল সে। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় গাছপাতার মতো আছড়ে পড়ে বাসমোতি। আমাকে নিয়ে চল মাধো, আমাকে লুকিয়ে রাখ, আমি ছোট মালিকের হাতে কাটারি মেরেছি।

সব শুনতে থাকে মাধো। আর বাসমোতি ঢকঢক করে জল খায় আগে, কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ থেমে যায়। তারপর অবাক হয়ে বলে, কেমন করে এমন কাজ করলাম?

ওরা এ-ওর দিকে তাকায়. তারপর তাকায় খারহার দিকে।

অপরাহ্ণের রোদে গ্রামটি ঝিমোচ্ছে, মহাবীরজী মন্দিরের ধ্বজা উড়ছে। আপাতশান্ত এ দৃশ্য তো সত্যি নয়?

মাধো বলে কোথায় যাবি? কোথায় এদের লোকজন নেই? —তাও সত্যি।

বাসমোতি ও মাধো বসেই থাকে। তারপর মাধো বলে আমার কী ক্ষমতা যে তোকে বাঁচাব? একটু ভাবে মাধো। তারপর বিষণ্ণ ও তিক্ত হেসে বলে, তোকে বাঁচাতে পারে ননকু।

—কেমন করে?

ননকু দামোদরের চামচা। দামোদর সনাতনের চামচা। এত কথার তুই কী বুঝবি। তোকে কী বুঝাব? সনাতনকে সবাই ভয় পায়। দামোদরকে এরা ডরায়।

—তার কাছে আমাকে নিয়ে চল।

—সরপঞ্চ গ্রামে নেই, টাউনে গেছে। তোর বাবা, গ্রামের অন্য লোকরা আসুক।

—আমি কী করব?

—এখানে বসে থাক্।—মাধো তিক্ত হাসে। সদুঃখে বলে, এই জন্যে বলেছিলাম যে তোকে নিয়ে ভেগে যাব।

—এই জন্যে?

—নয় তো কী?

—আমি তা বুঝি নি।

—স্বজাতের লোকরা তো তোকেই দোষ দেবে। বলবে যে সুচেত যা করল তা করল। এটা প্রথম নয়, শেষও নয়। পালামৌয়ে এ রকমই হয়। কিন্তু তুই তাকে মারতে গেলি কেন?

—জানি না জানি না…

—আমি অবশ্য বলব যে ঠিক কাজই করেছিস। আর হাতে না মেরে গলায় বসালে আরোই ভাল কাজ করতিস। খুব সাহস দেখিয়েছিস! এমন সাহস যদি সব মেয়ে দেখাত, তাহলে মালিক-দের অত্যাচারও কমে যেত।

—সাহস! সাহস দেখিয়েছি? কী জানি কিছুই ভাবিনি। চুনাতামাকের ডিব্বা নিতে এসেছিল···কিছু না ভেবেই···মালিক লোক তো এখন···

তুজনেই চুপ করে যায়। মালিকরা এমন অপরাধে কী করতে পারে তা ভেবে বের করা কঠিন। পালামৌয়ের বন্ধুয়া জগতে লেখাপড়া নেই, আদানপ্রদান নেই। তবু গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি হাটতলা, বাজার, লোকমুখ, এমন সব মাধ্যমে ঠিকই প্রচার হয়ে যায়। ধানপুরের কৌয়ার যে তার ধরমারুদের পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিল তা যেমন সবাই জানে, তেমনি জানে হতভাগ্য মুচিরাম তুসাদের কথা। ধান বোঝাই গরুর গাড়িতে জোয়াল থেকে বলদ ছাড়িয়ে তাকেই জুতে দিয়েছিল মালিক, আর জোয়াল উঠাতে গিয়ে সে রক্তবমি হয়ে মরেও যায়।

সবই কোনো-না--কোনো দিন জানাজানি হয়ে যায়। না, কোনো ভুঁইন গরিব মেয়ে ব্রাহ্মণ মালিকের হাতে কাটারি মেরেছে, এমন কথা জানাশোনার মধ্যে নেই।

মাধো বলে, এমন তো হয়নি কখনো। তাই এমন হলে পরে মালিকরা কী করে তা জানা নেই। সরপঞ্চ গ্রামে নেই। যা হবে সে ফিরলে হবে।

অপরাহ্ন ঢলে পড়ে। ছায়াগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। মাধো বলে তোদের ঘরে চল্। সবাই এসে খোঁজতালাস করবে।

একে একে মানুষগুলি ঘরে ফেরে! তারপর সব শুনে সকলে এ-ওর দিকে তাকায়। এ কাজ বাসমোতি ঠিক করেছে না অন্যায় করেছে তা নিয়েও মতবিরোধ দেখা দেয়। মাঙ্গারাম ভুঁইয়া উদিত

পাঁড়ের কামিয়া। সে একটু বলায়-কহায় লোক। সে ধমক দিয়ে বলে যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন কী হবে?

মাঙ্গারামের বউ বলে, মালিক লোক কি ছেড়ে দেবে? মেরে ফেলবে বাসমোতিকে।

তেতরি বলে তবে তো আমি মেয়েকে নিয়ে চলে যাই।

মাঙ্গারাম বলে, খারহা এখনো চুপচাপ কেন? ওরা কি জানেনি কিছু?

গনু গলা পরিষ্কার করে বলে বন্ধুয়াদের ব্যাপারে কোনো হুকুমত আছে বলে মনে হয়। সরপঞ্চ, মুখিয়া, আরো কিছু লোক ব্লক আপিসে গেল।

ঝালি ভূঁইন্ বয়সে প্রৌঢ়া, কোঠিবাড়িতে সে একমাত্র লোক যার চোখ অপারেশন হয়েছে, যার চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা আছে। চোখ অপারেশন করাবার কারণে সে টাউনে থেকেছে। ফলে তাকে বেশ মান্যগণ্য ও জ্ঞানী বলে মনে করা হয়। ঝালি বলে, আমরা কী করব? ওরা যখন আসবে, তখন দেখিয়ে দেব যে বাসমোতি ঘরে নেই।

—কোথায় যাবে ও?

—গনু ওকে নিয়ে চলে যাক মৌথাবনি। চন্দা সিংয়ের ঘরও পাকা, সে নামকারী লোকও আছে। ওর মনে দয়াধরমও আছে। দুঃখীকে ফিরাবে না।

গনু মাথা নাড়ে। বলে, যে পথে যাব ঝালি, সে পথে তো মালিকরা ফিরবে। পথ তো একটাই।

—তবে ঘরে থাকুক এখন। হামলা এলে তো বোঝা যাবে। দূর থেকেই জানা যাবে। তখন পালাবে জঙ্গলে। জঙ্গলের ওপারে খাদ আছে, লুকাবে।

ধীরে ধীরে চুপ করে যায় সবাই। মাঙ্গারাম বলে মালিক লোক ব্লক আপিসে গেল? কেন গেল?

—আমি জানি।

—কা রে! মাধো কথা বলিস?

—আর কে?

—কী জানিস?

মাঙ্গারাম সকলের দিকে তাকায়। ওর চোখে বেশ একটা ইংগিত থাকে, যাতে কোনো রঙ্গমজা নেই, উদ্বেগ আছে। অর্থাৎ মাধো এবং বাসমোতি যে খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। এখন সে নিয়ে কোনো কথা বলে না কেউ। মাঙ্গারাম আবারও বলে, বাসমোতি আমাদের কোলেপিঠে মানুষ, মেয়ের মতো!

মাধো বলে, রাম যাঁর কাছে ছিল সেই ভকিলসাব আর রাম যাঁর কাছে আছে সেই পত্রকারসাব, দুজনে জেনে এসেছেন যে বন্ধুয়া বলে স্বীকার করাতে হবে। তাহলে সেমরার মতো মাথা পিছু চার হাজার করে টাকা মিলবে। তাই জানতে গেছে মালিকরা।

—বুঝেছি।

তেতরি বলে, চা-র-হা-জা-র!

গন্নু বলে, বাসমোতি কী মা! তুই কতকাল এমন উজবক থাকবি তাই ভাবি। বন্ধুয়াকে চার হাজার টাকা দিবে বলে মালিকরা ছুটেছে? মাঙ্গারাম কী বল?

—এখন কেউ বলবে আমার সাতটা কামিয়া, কেউ বলবে দশটা।

—আর কামিয়ার জন্যে টাকা তো সরপঞ্চের হাত দিয়েই আসবে।

—তাহলে ওরা আবার টাকা পাবে।

—তবু আমাদের দিয়ে কবুল করাতে হবে। তাই আমাদের খানিক হাতে রাখবে।

—গন্নু! তাহলে তো ওতেই আসনি মিলবে আমাদের। যখন সবটাই সাজানো ব্যাপার হবে, তখন কেমন হবে? মালিক

সঙ্গে থাকবে, তশীলদার আর ব্লক সাহেব আসবে। মালিক বলবে ভয় কী? বলে দে তোরা কে কে আমার বন্ধুয়া আছিস। আমরা বলব, নাম লিখা হবে। তারপর সরকারী দপ্তরে কাগজ ঘুরতে থাকবে। তারপর বলে দেবে তোরা খালাস।

—শিবিল্ হবে না? সেমরার মতন?

—আর হয়? সেখানে ছিয়াত্তর সালে শিবিল্ হল। খুব ধুমধাম, তেতাল্লিশজন মুক্ত হল। কিন্তু শিবিলের পর মদত তো পৌছায় নি। তাতে একাশি সালে যখন তেইশজন মুক্ত হল, কোনো ধুমধাম নেই, সব চুপচাপ।

এ ভাবেই ওরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রচারধন্য বন্ধুয়া মুক্তি শিবিরের, বা ওদের ভাষায় 'শিবিলের' কথাটি বলে।

মাঙ্গারাম ঘন ঘন থুতু ফেলে এবং কাগজকলমে ওরা মুক্ত হতে পারে, কাগজেকলমে মদত পেতে পারে, এ সব সম্ভাবনা ওকে বড়ই সাহস জোগায়। ও বলে, যাই হোক না কেন, বোঝা যাচ্ছে যে কামিয়াদের পুরো চটালে মালিকদের টাকা পেতে অসুবিধা হবে।

—কৈসে?

—ভৈয়া গনু! যাই হোক না কেন, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন সেমরাতে ওরা লড়েছিল বলে এতকাল বাদে থোড়াবহোত মদত আসছে। মালিকরা ভাববে, বন্ধুয়ারা খড়চাই উঠালে হয় তো আমাদের পকেটে টাকাটা আসবে না।

—তাহলে?

—বাসমোতি কোনো অন্যায় করেনি। এত রাতে যুবতী মেয়েকে গনু কোথায় লুকাবে? আমরা যে যার ঘরে থাকি। গোলমাল বুঝলে দেখা যাবে।

ওদিকে সুচেত যখন হাতে চোট খায়, (কাটারি ঠিক মতো পড়লে কবজি থেকে হাত নেমে যেত)—অত্যন্ত আতঙ্কে ও ঘরে দৌড়ায়। মাকে ও বলে নি কী হয়েছে। তারপর মা ওকে নিয়ে ডাক্তারের

কাছে যায়। খারহার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার কখনোই থাকে না, কম্পাউণ্ডারও নয়। ড্রেসারই কেন্দ্র চালায় ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে। সে বেঁধে দেয় সুঁই-ইলাজ করে। তারপর টাউনে নিয়ে দেখাতে পরামর্শ দেয়।

মা বলে, টাউনে ওকে দেখাব, চুরাইলটার নামে কেসও করব, আর আসুক ওর বাপ। কোঠিবাড়ির ভূঁইয়াটোলি জ্বালিয়ে দেবে।

—হাম্ হি যাই করব। সুচেত বলে।

মা বলে, দুঃখের কথা তো ওটাই। যে কোঠিবাড়ির ভূঁইয়ারা আজ খারহার ব্রাহ্মণের উপর কাটারি উঠায়। অথচ ব্রাহ্মণরা একজোট হয়ে এ অপমানের প্রতিকাব করে না।

ঘরে ফিরে সে এ সব কথা চেঁচিয়ে বলে হাওয়া গরম করে। যে পরিস্থিতিতে ঘটনাটি ঘটেছে, তা শুনে উদিত পাঁড়ের বউ সময়োচিত ভালো ভালো মন্তব্য করে এবং উদিতের মা বিরস মুখে বউকে বলে, ঘরে যাও বাছা!

সে সুচেতের মাকে বলে, বিয়ে দাও, নয় তো সেই বউকে আনো। এখন কামিয়া লোকের পিছনেও উসকানি দেবার লোক আছে। তোমার ছেলে দিন মানে না, দুপুর মানে না, আমার কামিয়া মেয়েটাকে তো এমন হাল কবেছে যে সে একটা বস্তা কাচতে পারে না।

—আমার ছেলে? সুচেত?

—আর কে? ভূইন মেয়েরাও খচড়ী। গা দেখিয়ে ক্ষেতে কাজ করে। কিন্তু দিনমানে ছি ছি!…মুখ দেখলে জাত থাকে ব্রাহ্মণের?

এভাবেই ঘটনাটি যথোচিত গুরুত্ব পায় না। সুচেতের মা বলে, সরপঞ্চ আসুক।

—সে কি আমার মাথাটা কেটে নেবে?

—বিচার করবে।

—যার ছেলে ভূঁইয়া অছুতের ঘরে গিয়ে লটরপটর করে আর থালা থেকে চুরন তুলে খায়, সে কার বিচার করবে ?

—এগুলো মিছে কথা !

—মিছে কি সত্যি, তা হোলির সময়ে টের পাবে। যখন ভাঙ্গি লোক গান বাঁধবে। ভালো হয়েছে যে আজ কথা উঠেছে। তোমার ঘরের ব্রতপূজার প্রসাদ আমার ঘরে আর পাঠিও না।

উদিত আগে সরপঞ্চ ছিল। বর্তমানে বিশ্বম্ভর সরপঞ্চ। উদিতের মা এভাবে শোধটি তুলে নিল। উদিতকে হটাবার জন্যে বিশ্বম্ভর কানাঘুষা করে অপবাদ ছড়িয়েছিল যে উদিত টাউনে গেলে হোটেলে বেজাতের রান্না মাংস খায়।

গ্রামের বড় বড় মাথারা যখন ফেরে তখন সবই জানাজানি হয়। বিশ্বম্ভরের ঘরে গণ্ডগোল, তাই স্বরূপ সিং জাতভাইদের বলে, এ নিয়ে তোমরা জল ঘোলা কোরো না।

সুচেতকে ডেকে সে 'বেটা! বাছা!' এমন সব মিঠা মিঠা কথা বলে সবই জেনে নেয়। তারপর বিশ্বম্ভরকে বলে, আপনাদের নিয়ম রীতিও আপনার ছেলে মানে না। দিনেমানে যেখানে সেখানে আমাদের সকলের কমিয়া মেয়েদের লালচ্ করে। এর তো কোনো ব্যবস্থা আপনি করছেন না। যে জওয়ান ছেলে, তার জন্যে দশটা জওয়ান কামিয়া মেয়ে ব্যবস্থা করেন। না সেই বউকে আনতে পারছেন, না আরেকটা বিয়ে দিচ্ছেন।

বিশ্বম্ভর সদুঃখে বলে ভৈয়া! বিপাকে পেয়েছ, যা খুশি তা বলে নিচ্ছ। এখন রাজপুতদের দিনকাল। ব্রাহ্মণকেই নাগরা জুতা মারো।

—ছি ছি, সরপঞ্চজী! এ আপনি কী বললেন? আমি কেন, কোনো রাজপুত কোনো ব্রাহ্মণকে অপমান করতে পারে না। এ কথা ঠিক বললেন না।

—এখন কী কর্তব্য তাই বলো। সুচেত যা করেছে সে তো কোনো বুদ্ধিমান ছেলে করে না। ওর গরম খুব বেড়েছে। দিন-মানে চলে যাচ্ছে কোঠিবাড়ি।

—তাদের ঘরে চুরন—আচারও খাচ্ছে।

—হাঁ হাঁ, তাই না কি? দেখো! ভূঁইয়া কামিয়াদের খচড়াই দেখো। সুচেত চাইল তো তোরাও দিনেমানে কুত্তীর মতো শুয়ে যাচ্ছিস। তোদের মুখ দেখলে ব্রাহ্মণের জাত থাকে? তাকে বললেই হয় যে, দেওতা! রাতে এসো। আরো দেখো! সুচেত চাইছে তো তোরাও চুরন-আচার ওকে নিতে দিচ্ছিস।

—কেন বলুন তো ওরা এমন করছে?

—ব্রাহ্মণের জাত মারবে বলে।

—হতে পারে, আপনার কথা সত্যি হতে পারে। চন্দা সিং খারোয়ারের কাছে যায় মাধো। মাধোকে লেখাপড়া শিখিয়ে তালিম দিচ্ছে দরপচাঁদজী। মাধো যাচ্ছে টাউনে। সেখানে কুশলপ্রসাদ ভকিল আর তার বন্ধুরা তো বন্ধুয়া নিয়ে খুব শোর উঠাচ্ছে। আর ওই কুশলপ্রসাদ কে, তা জানেন?

কেমনকরে জানব?

—ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছে এক ব্রাহ্মণ বিধবার সঙ্গে। তারা টাটায় থাকে।

—বিধবার সঙ্গে!

—হাঁ সরপঞ্চজী!

—দিনকাল খুব খারাপ হয়ে গেছে। সারদা দেবী কেস কেউ মনে রাখে নি। ওঃ! খুব বড় কেস ছিল।

—এখন কী করা যায়?

—তুমিই বলো। সব জায়গা মৌথাবানি নয়। আমরা কৌয়ার শাহী সিং নই। কামিয়া নিজের জায়গায় থাকবে, আমরা আমাদের জায়গায় থাকব, এটা তো দরকার। খারহাতে বড় বেশি বাইরের হাওয়া ঢুকে গেছে। এ ব্যাপারটা নিয়ে কোনো কিছু করা তো দরকার।

—ওই কথাই বলছিলাম। কাজ এমন করবেন, যাতে পরে কোনো আপশোষ না করতে হয়। কামিয়ার মেয়ে মালিকের ছেলে

ভোগদখল করেছে বলে কাটারি মারল। এখন তো আমরাই পারি ওদের টোলি জ্বালাতে, সবাইকে পিটাতে।

—খুব পারি!

—কিন্তু এখন তা করা উচিত হয় না। আপনাদের মধ্যেও একতা নেই। উদিতের মতো কত কথা বলছেন। রাজপুতরা মানবে আমি যা বলব।

—তোমার দামোদর আছে।

—সে তো আছেই। অনেক লোককে ভাতে মারতে পারে, অনেক লোককে ভাত দিতেও পারে আজ দামোদর। কিন্তু সে তো খারহাতে আসছে না। খারহা নিয়ে কথা।

—কী কথা?

—ব্লকে বসে শুনলেন তো সব। এখন টাউনে. কুশলের কাছে জানিয়ে দেব যে হাঁ, এখানে এত বন্ধুয়া আছে, আমরা চাই ওরা মুক্তি পাক। বন্ধুয়া প্রথা খুবই বর্বর প্রথা। আজকাল এমন প্রথা চালু থাকলে আমাদের বদনাম।

—তারপর?

—ওদের নাম লিখাব।

—পরিবার পিছু চার হাজার টাকা।

—জমিও মিলবে এক একর।

—আর বীজ-খাদান-বয়াল এ সবে চার হাজার টাকা। ভৈয়া, ঠিকই বলছে। তবে জমি তো দেবে বানঝারা টাঁড় জমি।

—না না, স্বরূপ সিং আছে না? এই ইলাকা চলে আসছে সেচ প্রকল্পে। সেচের ঠিকাদারি দামোদরের। আমরা সেচ এলাকায় জমি নেব।

—ওরা দখল চায় যদি?

—সরপঞ্চজী! পলামুতে ব্রাহ্মণ-সরপঞ্চ আর রাজপুত-মুখিয়া থাকতে বন্ধুয়া লোক খালাস পাবে, নিজের জমি পাবে, টাকা পাবে, এ কেমন করে হতে পারে?

—এখন তা হলে খার উঠাব না ?

—না না, এটা কি তার সময় ?

—কিছুই বলব না ?

—কাল গন্নুকে ডেকে ধমকে দিন। তারপর বলুন, জোয়ান মেয়েকে আটকে রাখা চলবে না। ননকুকে ডেকে পাঠাক। সে বউ নিয়ে যাক।

—সেচ প্রকল্প হবে ?

—নিশ্চয়।

—আমরা ডি টি চাই কুয়া পাব তো ? তোমার হাতেই সব।

—আগে আমরা নেব পরে পাবলিক। সেচ এসে গেলে জমি তিন ফসলী করে ফেলব।

—ওরা কিন্তু খালাস মাঙতে পারে ?

—কেন খালাস দেব না ? নিশ্চয় দেব। যার কাছে যা পাওনা আছে দিয়ে দাও, খালাস নাও চলে যাও। ওদের কে আছে ? কুশলপ্রসাদ ? সে বন্ধুয়াদের হয়ে কেস লড়বে ? পলামুতে বন্ধুয়া তো দু-তিন লাখ হবে। ও কি দুই-তিন লাখ কেস করবে ? করেছে তো হাজার খানেক। একটাও উঠেছে আদালতে ?

—কুশলপ্রসাদ এমন করছে কেন ?

—আরে বয়স আছে, ফুর্তি আছে, দুখীর ওপর দরদ দেখাচ্ছে। আমার তো মনে হয়, এটাও ওর একটা চাল। হয় তো ভোটে দাঁড়াবে। তাই পাবলিককে বুঝাচ্ছে যে সে কত ভালো লোক।

—এ সব উৎপাত আগে ছিল না।

—আরে, এগুলো বর্ষার আগাছা। রোদ লাগলে মরে যাবে। সনাতন সিং এখনো এদেরকে আমল দিচ্ছে না তেমন। এমন সময় তো নিশ্চয় আসবে, যে হয় সনাতন সিংয়ের পিট্‌ঠু হতে হবে, নইলে লাশটি পড়ে যাবে।

—নতুন ডি. সি. কেমন হবে ?

—কেন আপনি ছেঁড়া কথা ভাবেন বলুন তো ? সনাতন

রাজপুতের বাচ্চা। যত কনণ্টাক্টারি সব তার হাতে, আর জেলার প্রশাসনও তার পিট্‌ঠু। নইলে যুগল সিংকে খুন করল, এস. পি কুমার কেশরী সনাতনের গায়ে হাত দিল? সনাতন কার ছেলে? আরে! সনাতনের বাবা ফোন উঠিয়ে দিল্লীতে ইন্দিরাজীর সঙ্গে কথা বলে। নতুন ডি. সি যেমন হোক না কেন, পলামুতে সনাতনকে টপকে সে একটা কাজ করতে পারবে না। সনাতনের মদের আড়ত বন্ধ করতে গিয়েছিল তো পুরনো ডি. সি বদলি হল, না হল না?

—সবই জানি।...কিন্তু স্বরূপ! বিশ্বম্ভর আগে এমন দুর্বল ছিল না। এক সময়ে বজ্জাতি করেছিল বলে দুই কামিয়াকে উলঙ্গ করে সারা গায়ে লোহা পুড়িয়ে দাগিয়েছি, ভূঁইন আওরতকে লোপাট করে দিয়েছি, এমন কত কাজ করেছি। তোমার ছেলে মরদ বাচ্চা হয়েছে, তোমার বুকে জোর আছে। আমার ছেলেটা···ওর কারণেই আজকাল মনে সুখ নেই।

—হয় বিয়ে দিন ওর, নইলে জওয়ান কামিরা মেয়ে ধরুন কয়েকটা।

—দেখি।

এমনি করে সব বলা কওয়া হয়ে যায়।

ওদিকে সে রাতে গন্নুর উঠোনে মাধোও থাকে অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে। মনে তার একটা গর্ব থাকে। বিপন্ন বাসমোতি তার কাছে ছুটে গিয়েছিল। আজ রাতে অন্যদের সঙ্গে সেও এই বিপন্ন পরিবারকে রক্ষা করতে জাগছে।

জাগে, মনে জাগে চন্দা সিংয়ের কাছে শোনা টুকরো টুকরো কথা। পলামু তো প্রধানত বীরদের দেশ। চেরো অধিবাসীরা যেমন বীর, তেমনি দুর্ধর্ষ খারোয়ার আর্দিবাসীরা। সব টুকরো টুকরো কথা মনে পড়ে।

চেরো রাজাদের গৌরবের দিন কেমন ছিল তা প্রাচীন পলামু কিল্লা আর শাহপুরে গোপাল রায়ের ভাঙা প্রাসাদ দেখলে বোঝা

যায়। কত জানতে চেয়েছে মাধো, চন্দা জী! খারোয়াররা করেনি কিছু? তাদের কথা বলো।

—নিশ্চয় করেছে।

—কী করেছে?

—চেরো রাজারা যত লড়েছে মুগল, মারাঠা, ব্রিটিশের সঙ্গে খারোয়ার লোক সঙ্গে থেকেছে।

—বাস্, ওই পর্যন্ত?

—পলামু আর রাঁচি জুড়ে উইলকিনসনের কালে যে কোলদের বিদ্রোহ হয়, তাতে খারোয়ার জাতি বহোতহি লড়েছিল।

—আর কী করেছিল?

—কেন, এখন তো আঠারশো সতাবনের লড়াই নিয়ে কত কথা! পলামুর কথা কেউ বলে না মাধো। কিন্তু খারোয়ার বীর নীলাম্বর আর পীতাম্বর যে লড়াই করেছিল, সে লড়াই দেখে ব্রিটিশ তো বহোতহি ঘাবড়ে যায়। কেন কি, যত জায়গায় সতাবনী যুদ্ধ হয়, কোম্পানির ফৌজ তাতে ছিল, আর অন্য লোকরাও ছিল।

—পলামুতে···? চন্দাজী?

—এ তো ভূপেশ্বর সিং 'পলামু' কাগজে লিখেছে যে এক গণ-বিদ্রোহই ছিল। যাতে খারোয়ার বীর নীলাম্বর আর পীতাম্বর নেতা ছিলেন। সেই বিদ্রোহই দমন করতে আসে ডালটন সাহেব। যে বাজিরাবাগকে ডালটনগঞ্জ নাম দিয়ে গেছে।

—এ সব রাজপুত আর ব্রাহ্মণ ছিল না?

ব্রাহ্মণরা তো অনেক পরে উপরে উঠল। রাজপুতরা? কখনো মোগলের পিট্‌ঠু হয়ে ঢুকেছে, কখনো ব্রিটিশের। আর এ জেলার লোকরা যখনি ব্রিটিশের সঙ্গে লড়েছে, ওরা ইংরেজকেই মদত দিয়েছে। আদিবাসী ইলাকায় উঁচা জাত কখনো ঢুকেছে পিট্‌ঠু হয়ে, তারপর ব্যবসায়ী, মহাজন, জমিমালিক হয়ে খটমলের মতো ছড়িয়ে গেছে।

—আমরা, খারোয়াররা, কিছুই জানি না।

—লেখাপড়া কতজন জানি? উঁচা জাতের লোক কেতাব লিখে। তারা কেন আমাদের নাম লিখবে? মেদিনী রায়, নীলাম্বর, পীতাম্বর, কার নামে জিলাতে কী আছে? না কোনো রাস্তা, কোনো ব্রিজ, সদরে কোনো ইলাকা, কোনো মূর্তি, কোনো ফলক!

—আপনি লিখুন না কেন?

—ভৈয়া! আদিবাসী ডি. এস. পি সনাতন সিংয়ের রাগের মুখে পড়ল তো সাসপেন্ হয়ে আছে। আমি আদিবাসী ইলাকায় উপমুখ্য। মুচিকে দিয়ে নাগরা বানাচ্ছি, শহরে আর ব্লকে হেঁটে হেঁটে জুতা ছিঁড়ছি, আবার বানাচ্ছি। কিন্তু একটা নলকূপ, একটা সিচাই কুয়া, একটা ইস্কুল আমার ইলাকায় আনতে পারছি? আদিবাসী যদি পালামুতে কোনো পাবলিক কাজ করতে চায়, সরকারের, চাই পার্টির, পিট্‌ঠু বনে থাকতে হবে। কোই উন্নয়ন কা কাম না করো, ওহি হায় পলামুকে লিয়ে সবসে বড়া পাবলিক কাম। পলামুর আসল ইতিহাস লেখার ইচ্ছা তো আমিও রাখি।

—হাঁ হাঁ, আমরা এত গরিব ছিলাম না, সবাই কামিয়া ছিলাম না, এসব কথা জান্‌কারি চলে যায় তো মানুষে জানবে।

—গরিব কেন থাকব মাধো! জমি তো আমাদেরই ছিল।

—পলামু বড়ো অভিশপ্ত ভূমি।

— বড়ো অভিশপ্ত।

সব কথা মনে পড়ে মাধোর। বুকের নিচে কোয়েল নদীর বন্যা গর্জায়। বাসমোতি! বাসমোতির ওপর তার কোনো অধিকার নেই। কেন নেই?

সকাল হয়। না, ঘর জ্বলে না, লাশ পড়ে না। বেলার দিকে লালচে চোখ করে ননকু ভূঁইয়া আসে। কত তাড়াতাড়ি খবর পৌছল, কত তাড়াতাড়ি সে এল?

এসেই ঝনাত করে টাকা ফেলে দেয়। মাংস আনো, ভালো চাল এনো। তোমাদের খাবার খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

গন্নুর ইচ্ছে ছিল, জামাইকে সব ঘটনাটি খুলেমেলে বলে। জামাইয়ের রুক্ষ অসভ্য মূর্তি দেখে কোনো কথা বলতে ও সাহস পায় না।

ননকু একটি পোঁটলা ফেলে দেয়। রোলেকসের কাজ করা শস্তার নাইলন শাড়ি, রঙিন সায়া, জামা, পিতল ও দস্তার গহনা, রঙিন ফিতে।

—তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। আমি বাসমোতিকে নিয়ে চলে যাব।

—বেটা বারাহির বাস তো সন্ধেয়।

—ট্রাকে যাব।

—বেটা, বাসনবর্তন, কাপড়জামা…

—ছাড়ো ছাড়ো ও-সব বাহানা। আমি এখন সেই গাঁওয়ালী বুদ্ধুদের মতো বাসনবর্তন নিয়ে যেতে পারব না।

তেতরি ক্ষীণকণ্ঠে বলে, নতুন ধুতিটা!

ননকুর চুল 'নমকহালাল' ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের মতো ছাঁটা, হাতে ঘড়ি, গলায় চেন, এক হাতে ইস্পাতের বালা, পায়ে জুতো, শার্ট ও প্যান্ট খুবই কায়দার। গন্নু বোঝে, যে ননকু হলুদ ছোপানো ধুতি পড়বে না। ও তাড়াতাড়ি বলে, সঙ্গে দিয়ে দিস। এখন রান্না দেখ। ওরা কাজের মানুষ, ওদের সব ঝটপট চাই।

তেতরি তবু বলে, পাঁচজনকে ডাকব না? তারা আশীর্বাদ করবে না?

গন্নু রেগে ওঠে। কাল থেকে কেন, আগে থেকেই ননকু-বিষয়ে পাঁচ কথা শুনে তার মন বড় বিচলিত। বন্ধুয়া সে, ক্ষেতিবাড়ি কাজ করে। জমির কাজে রক্তে রোপিত হয়ে যায় ধৈর্য, অসীম ধৈর্য। আকাশের দিকে চেয়ে থাকা, জল হবে কি না। মাটির দিকে চেয়ে থাকা, বীজ অঙ্কুরিত হবে কি না। মালিকের দিকে চেয়ে থাকা লুকমা মিলবে কি না।

রক্তে সঞ্চারিত হয় ধৈর্য, অশেষ ধৈর্য। সেই ধীর স্থির, বোবা

মন বিচলিত হয়েছিল বড়। তারপর বাসমোতির প্রতি মাধোর আকর্ষণ, তাও তাকে বিচলিত করে। তারপর বাসমোতির সুচেতকে আঘাত হানবার দুঃসাহস তাকে খান্‌খান্‌ করে দেয়। বন্ধুয়ার মেয়ে উঁচুজাতের মালিকে মারল! কোথা থেকে সাহস পেল সে?

তারপর এ ঘটনার জন্যে উদ্বেগ, ভয়। গনু তো খানখান হয়ে যাচ্ছে ভিতরে। ননকুকে দেখে থেকে ওর কেবল মনে হচ্ছে যে বলে দেয়, তোমাকে দেখে আমার বুক বড় দমে গেছে। মনেই হচ্ছে না যে তুমি গ্রামের ছেলে। শহরের সেইসব মস্তানদের মতো লাগছে তোমায়, যাদের সবাই ভয় পায়। তেতরি কেন বুঝছে না, গনু যা বুঝছে? এর কাছে হলুদ ছোপানো ধুতি পরো, পাঁচজনে আশীর্বাদ করুক, মেয়েরা নিয়মরক্ষে গান করুক একটু, এ সব বলে লাভ কী? সে অনুভূতির সম্মান ননকু দেবে না। অসহায় দুঃখে ও তেতরির ওপর রেগে ওঠে, বাসমোতির ওপরেও।

—বুড়ি বকরির মত ব্যা ব্যা কোরো না। মেয়ে যা করল, এখন মানে মানে বিদায় হলে বাঁচি। তাড়াতাড়ি করো। মাংস সিদ্ধ হল কি না দেখো।

তেতরি বোধহয় এতক্ষণে অবস্থার গুরুত্ব বোঝে। সে সরে যায়।

ননকু বিশ্রী হেসে বলে, হাঁ হাঁ, এই তো ঠিক। মেয়েছেলে বুঝে পয়জার।

আটকানো নিশ্বাস ছাড়ার শব্দ হয়। দরজায় পাশ থেকে সরে যায় একজোড়া কাজলপরা চোখ। বাসমোতি ভিতরে যায় ও মাকে বলে, তুমি স্নান করতে যাও। আমি রান্না দেখছি

—থাক। তুই আর আমি একসঙ্গে যাব।

বাসমোতি উনোনে জ্বাল ঠেলে। 'মেয়েছেলে বুঝে পয়জার।' মায়ের মতো বয়সী কোনো মেয়েকে যে এমন কথা বলে, সে জানোয়ার। কেন সে মাধোর কথা শুনল না, কেন চলে গেল না তার সঙ্গে? যাকে দেখলে ভয় করে, তার সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাবে কেমন করে?

বাসমোতি আর তেতরি দুজনে দুজনকে জড়িয়ে যাবার কালে খুব কাঁদে। নতুন কাপড় ও গয়নায় বাসমোতিকে আর চেনা যায় না। গন্নুও কাঁদে খুব কাঁদে। ননকু বলে, আরে বাপ রে! মেয়ে কি মরে যাচ্ছে তোমাদের?

—খবর দিও ননকু। তোমাকে আদর জানাতে পারলাম না।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

—আবার এসো।

—সময় যদি মিলে!

—দেওয়ালিতে বাসমোতিকে আনব।

—দেওয়ালি টাউনে দেখবে।

—আসবে না?

—না না।

—গাঁওয়ালি মেয়ে···কিছু জানে না।

—আওরতের জানবার দরকার কী? মরদ যা জানাবার, জানাবে। এমন মজাদার মন্তব্য করে গন্নুকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে ননকু হেসে ওঠে, সিগারেট ধরায় ও ধোঁয়া ছেড়ে বাসমোতিকে বলে চলো, চলো।

যাবার কালে ঘোমটার মধ্য থেকে বোর গ্রামের দিকে তাকায় বাসমোতি। কাউকে দেখতে পায় না।

॥ ৪ ॥

বারাহি নয়, প্রথমে নওয়াডির কাছে একটি ইটভাটা সংলগ্ন ছোট পাকাবাড়িতে নামে বাসমোতি ও ননকু। ননকু বলে, এখন এ ঘরে শুয়ে বসে থাকো।

—এখানে?

—ট্রাক ঘুরে আসুক।

—ন্যাড়া ঘর, একটি খাটিয়া। প্রথমে বসে বাসমোতি, তারপর দেয়ালে হেলান দেয়। না, ননকু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টাই করছে না যে তাকে কোনো কথা জিগ্যেস করবে। ননকু বাইরে কার সঙ্গে কথা বলছে যেন। কথাবার্তার সামান্য কানে আসে।

—তা বলে নিজের বউ ?

—আরে ধান যখন কাটা হয়, সে অঘ্রান পৌষ মাসে মাঠের ইঁদুর দশটা বিয়ে করে। ননকু ভূঁইয়ার দিন পড়েছে এখন।

—তুই সাচমুচ জানোয়ার বনেছিস।

—তোমার কী ? ভাটায় বসে বাট্টা খাচ্ছ আর লম্বা লম্বা বাত ঝাড়ছ।

—বহোত পাপও করছি।

—অত ভাবো কেন ? দিন পড়েছে, মজা লুটে নাও। কে কার জন্যে ভাবে ? ভালো কথা তুমি তো নতুন মাল আনতে পারছ না।

—আসবে, আসবে। লেবার সাপ্লাই কাম করব, মাল আনব না, তা কি হয় ?

—জলদি করো। তাগদ নেই কারো, ফুটা মাল সব। দুই বছর না যেতে গোপীনিবাসে চালান হয়ে যাচ্ছে।

কথাগুলি বাসমোতি গভীর আগ্রহে শোনে। মানে বুঝতে পারে না। এসব টাউনের কায়দায় কথাবার্তা। দেহাতের সঙ্গে মেলে না। বাসমোতি শুয়ে পড়ে ঘুম আসে তার।

ট্রাক আসতে আসতে বিকেল হয়। এবার বাসমোতি বোঝে, যে ওরা বারাহি যাচ্ছে না।—আমরা কোথয়ে যাচ্ছি ?

—মেলা বকবক করলে থাবড়া মেরে গাল ভেঙে দেব। যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে যাচ্ছিস।

সেটা কোথায়, তাই ভেবে পায় না, বাসমোতি ! ট্রাকের তেলের গন্ধে ও ঝাঁকানিতে বমি পায় তার। তারপর এক সময়ে ওরা ডালটনগঞ্জে ঢোকে।

বাপ রে! কত বাড়ি ঘর, কত আলো, কত দোকান। বাজারের পিছনে একটি বড় দোতলা বাড়ি। বাপ রে! এত বড় একটা বাড়িতে তাকে আনল কেন ননকু? এরকম একটা বাড়ি তো তার হতে পারে না।

বাসমোতির হাত ধরে নামায় ননকু। হাত ধরে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে চলে। দুপাশে ঘর সরে সরে যায়। ঘর আছে, দরজা বন্ধ, আধখোলা, হাট করে খোলা। কি যেন গিলে নিচ্ছে বাসমোতিকে। অজগরের হাঁ যেন এটা। কত ঘর, কত উঠোন—বাসমোতিকে একলা ছেড়ে দিলে সে তো বেরোতেও পারবে না।

দোতলায় ওঠে ননকু। বোঝা যায় যে সবই তার চেনা। একটি ঘর। খুবই সাফ সুতরো ও সাজানো। তিনটি লোক বসে মদ খাচ্ছে। তার ঝাঁজালো গন্ধ। থমকে দাঁড়ায় ননকু! দুজন যুবক, একজন বয়সী সামান্য। বাসমোতি বিস্ময়ে হাঁ করে। একটি যুবক তো দামোদর সিং। খারহার স্বরূপের ছেলে।

—হুজুর!

—এনেছিস?

—হাঁ হুজুর। বাসমোতি, প্রণাম কর!

—এত দেরি হল?

—ট্রাক রতনগড় গেল।

—এ বাসমোতি?

—হাঁ হুজুর আমার বউ।

—বউ?

—হাঁ হুজুর। জিগ্যেস করুন।

—কি সনাতনজী, চলবে?

বয়স্ক লোকটি তাকায়, ঘাড় নাড়ে।

—আপনার তো দেহাত্তি ঔরত...

—কিছুদিন ভালো।

বাসমোতি হঠাৎ নিজেকে খুজে পায়।—না! বলে চেঁচিয়ে

ওঠে ও, ননকুর হাত ছাড়ায়। তারপর পালাতে যায়। বয়স্ক লোকটি অতীব ক্ষিপ্রগতিতে ওর হাত ধরে ফেলে। বলে, ভালো ভালো! একটু তেজও আছে।

ননকু ছিটকে বেরিয়ে যায়। বাসমোতি এখন বয়স্ক লোকটির হাতে বন্দী।

দামোদর মদের হিক্কা তুলে বলে, আরে, এ লোক পলামুর রাজা। তুই ধন্য হয়ে গেলি।

এমনি করেই বাসমোতিকে গিলে নেয়, ভয়ের অজগরটা। বয়স্ক লোকটি বাসমোতিকে শুকতে থাকে ও বলে, এই বুনো বুনো গন্ধটা, আঃ! এই গন্ধটা!

গন্নু আর ননকুর বাপ মুখোমুখি বসে থাকে। বারহিতে। দুজনের মাঝে থাকে একটি পোঁটলা, কিছু শস্তা আলুমিনির বাসন-বর্তন। পোঁটলাটিতে একটি হলুদ ছোপানো ধুতি, একটি গামছা থাকে। আর কিছুই আনে নি গন্নু, কুড়িটা টাকা এনেছিল।

হঠাৎ ওকে এ সব নিয়ে বারাহি আসতে দেখে খুবই অবাক হয়েছিল ননকুর বাবা। মালিকের কাছে ছুটি চেয়ে নিয়ে ও গন্নুর সঙ্গে এসেছিল।

ননকুর মা কপালে হাত রেখে বসে থাকে, বসেই থাকে আর ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

গন্নুকে দেখে ওরা খুবই অবাক হয়েছিল। গন্নু যখন মেয়ের খোঁজ করে, তখন ওরা আরোই অবাক হয়।

—ননকু বাসমোতিকে নিয়ে এসেছে! তুমি বলছ সে মাস-খানেক আগে!

—হ্যাঁ ভৈয়া। এর মধ্যে যে আসব, খোঁজখবর নেব, তা তো পারি নি। বাসমোতি কোথায়? এর আগে কিছুই জোগাড় করে উঠতে পারি নি। বাসমোতির মা বলল, যা জোগাড় হয়েছে তাই দিয়ে এসো। মেয়ে তো চিরকালের। ওকে পরে দেয়া যাবে। ননকু

তো কিছুই নিল না, থাকলই না একটুও। তোমরা কথা বলছ না কেন, কী হয়েছে?

ননকুর বাপের তোবড়ানো গাল দিয়ে শীর্ণ ধারে জল নামে, ও চোখ মোছে।—গন্নু! ভৈয়া!

—বলো, বলো! গন্নুর বুকটা উদ্বেগে ছিঁড়ে যেতে থাকে। তাহলে কি কোনো অঘটন ঘটেছে? বাসমোতির? ননকুর?

—আমরা তো কিছুই জানি না। তোমার কাছেই প্রথম শুনছি যে ননকু বাসমোতিকে নিয়ে চলে এসেছে। সে এখানে আসেনি। আমরা তার কোনো খবরই জানি না। আমরা খুবই দুঃখ পেলাম, আর তাজ্জবও হয়ে গেছি। ছেলে তো কোনো খবরই রাখে না।

—তবে কী হল ভৈয়া?

—কী বলব?

—কোথায় খোঁজতলাশ করব?

—ভৈয়া, আমার হাডহারামি মালিককে বলি। সে যদি ছুটি দেয় তো তোমার সঙ্গে যাব।

ননকুর বাপের মালিক ঘরে ছিল না। এই মালিকের বিড়িপাতা জঙ্গলের ঠিকাদারি আছে, সেজন্যে এক মুনশিও আছে। এই মুনশি হিসেবনিকেশে স্বভাবতই পটু, এবং বারাহিতে মহাবীরজীর একটি মন্দির করার জন্যে সে দৈবাদেশও পেয়েছে স্বপ্নে।

দৈবাদেশটি এ রকম,—মালিক জমি দেবে, মালিকদের কামিয়ারা মাঝে মাঝে পরিবার পিছু একটি করে টাকা একটি বড মুখ-আঁটা টিনে ফেলবে। মুনশিজী টিনটি নিয়েই বসে থাকে। সে কামিয়াদের বুঝিয়েছে, গ্রামে মন্দির করার যে পুণ্য, তা সে একা নেবে না। যারা পয়সা দিচ্ছে, সকলের পুণ্য হবে।

গন্নু ও ননকুর বাপের কথা ও মন দিয়ে শোনে। তারপর বলে, ননকু? তোমার বেটা ননকু? সে তো বহোত বড় খোঁটায় ঘোড়া বেঁধেছে।

—কৈসে, দেওতা ?

মুনশিজী প্রাচীনপন্থী কট্টর নীতিবাগীশ লোক। সে মাটিতে থুতু ফেলে বলে, ইলাকাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দেহাত থেকে মেয়ে নিচ্ছে, টাউনে চালান দিচ্ছে।

—বড় খোঁটা, দেওতা ?

—সনাতন সিং। তার পিট্‌ঠু দামোদর সিং। দামোদরের যত চোলাই ঠেক, সে তো ওরাই দেখে, ওর মতো কয়েকটা লাফাংগা লৌণ্ডা।

ননকুর বাপ ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, আমি শুনেছিলাম সে কোনো লেবার-কন্‌টাকটরের কাছে আছে। তার কাছে কাজ করে।

—হাঁ, ওহি তো। আমাকে বলে কি না, মুনশিজী, বিড়িপাতা তুলতে জওয়ানী মেয়েরা এলে আমাকে বলবেন। আমি ওদের টাউনে নেব, ঘোরাব ফেরাব, সিনেমা দেখাব। রাম রাম! আমি জাতিতেও উঁচা, বয়সেও বড়, আমাকে এমন কথা! পাপ, পাপে ভরে গেছে সব, বুঝেছ? এখন ধর্মের যুগ নেই।

—আমি যাব গন্নুর সঙ্গে ?

—যাও। গিয়ে লাভ হবে না কোনো।

গন্নু ভাবে, মুনশিজী ব্যাপারটি বোঝেন নি। সে বলে দেওতা! আমার মেয়ে তো ওর বিয়ে করা বউ। ননকু যত মন্দ হোক বাস-মোতি ওর বউ—

—ননকু একটা জানোয়ার। আমার মুখের উপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলে। চলতে চলতে আমার গায়ে যদি তোর ছায়া পড়েছে ননকুকে বাপ। তাহলে আমার জুতাকে কাঠি দিয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করেছিস—সে তো সেদিনের কথা। আর তোদের জাতকে পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা দিতে দিই নি আমরা। আজ ননকু আমার মুখে ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে! পলামুতে যত লীডার সব একদিন ব্রাহ্মণ হবে, তখন এ সব অধর্মের বিধান হবে। যেতে চাস্, যা!

আর গন্নুর ও ননকুর বাপের কাছে সব কথা শোনে দরপচাঁদ।

শুনে প্রথমটা সে খুবই অভিভূত হয়ে পড়ে। সে কয়েকদিন আসতে পারে নি। চন্দা সিং-দের গ্রামে থেকে গিয়েছিল। সেখান থেকে বেশ ভালো একটা কাজের কথা জেনে গিয়েছিল, আর মনটি খুব খুশি হয়েছিল ওর। গ্রামে ফিরে ও আরো বড় কোনো কাজের ভরসা পেয়েছে। তারপ জেনেছে এই কয়দিনের ঘটনাবলীর কথা।

—তাও ভাবলাম যে যাক্! মেয়েটাকে তার স্বামীই নিয়ে গেছে। এখন তোমরা বলছ...

গনু বলে স্বামীই নিয়ে গেছে।

—তবে চিন্তা করছ কেন?

ননকুর বাপ ননকুর উপর নানা কারণেই চটা। ওর সবচেয়ে রাগের কারণ হল, ননকু এখন কাঁচা টাকা নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু বাপ-মাকে খালাস করছে না। কোনো দোকান-টোকান করে বাপকে বসিয়ে দিচ্ছে না। বাপকে খালাস করে কিছু টাকা দিলে তবে তো শেষজীবনে ননকুর বাপ-মা খানিক শান্তি পেত। ননকু বাসমোতিকে কোথায় নিয়ে গেল, কী করল, এ জন্যে চিন্তা তো তারও হচ্ছে।

সে বলে দেওতা! স্বামীর সঙ্গে গেছে বলেই চিন্তা করছি। আমার ছেলে তো শুনতে পাচ্ছি...খারহার দামোদর সিংয়ের পিট্ঠু আর খুবই খারাপ হয়ে গেঝে সে।

—বুঝলাম।

গনু এখন নীরব কাঁদতে থাকে। তার তোবড়ানো গাল বেয়ে জল ঝরে। সে বলে, ছেলেদের উপর কোন্ ভরসা দেওতা? রামকে কামিয়ৌতি খাটতে দেব না বলে কত ছোটবেলা টাউনে পাঠালাম। তাকে তো আসতেও বারণ করেছি খারহাতে। কেন কি, দেখলে পরে যে কোনো মালিক ওকে নাকাল করতে পারে। আর সরপঞ্চজী তো বরাবর বলে আসছেন তোহার সে কাম ন উঠব্ করব্ রে গনুয়া! বেটা কো বুলয়া লেত্ করব্! সেও তো আসে না কতদিন। কতবার খবর দিলাম।

—তুমি সিধা আমার ঘরে এসেছ? কোঠিবাড়ি যাওনি এখনো?

—না।

দরপচাঁদ খুব আস্তে আস্তে বলেন, রাম তো এসেছে গন্নু।

—রাম! এসেছে।

—হ্যাঁ গন্নু। চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। কাজের কথা সে পরে হবে।

—আপনি...দিনের বেলা কোঠিবাড়ি যাবেন? গন্নু অবাক হয়ে জিগ্যেস করে। দরপচাঁদ খারহার ব্রাহ্মণ ও রাজপুত সমাজে পাত্তা পান না। সেবার কোঠিবাড়ি ও ঘোর টোলির কামিয়াদের কারণে মার খাবার পর তো তিনি নিজেকে খুবই গুটিয়ে নিয়েছেন। এখন সকলের চোখের সামনে দিয়ে দিনমানে কোঠিবাড়ি যেতে চাইছেন, সেটা তো খারহার সমাজ ভালো চোখে দেখবে না।

দরপচাঁদের চেহারা পাতলা, গায়ের একদা ফর্সা রং রোদে পুড়ে তামাটে। চুল ও ভুরু কাঁচাপাকা। চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, চোখের চাহনি সর্বদাই বিষণ্ণ ও চোখের কোণে অনেক রেখা।

ক্ষীণ হেসে দরপচাঁদ লাঠি নেন। সিধা পথে তবু হাঁটতে পারেন। একটু উঁচুনিচুতে ওঠানামা করতে হলে লাঠি দরকার হয়। পালামৌয়ে সাধারণ লোকের জীবন যেমন বন্ধুর, পথঘাটও তাই। একেবারে সমতল সিধা হেঁটে পালামৌয়ে কোথাও পৌঁছানো বড়ই কঠিন। খারহা থেকে কোঠিবাড়িতে যেতে হলেও অনেক ওঠানামা করতে হয়।—চলো। চলতে চলতে বলি।

—সরপঞ্চ তো দেখে নেবেন আপনাকে, তখন?

—গন্নু! সেই কথাই তো বলছিলাম। এখন আমি দশবার কোঠিবাড়ি আর ঘোর যেতে পারি। বিশ্বম্ভর, উদিত, স্বরূপ। সবাই বলবে যে হাঁ হাঁ দরপচাঁদ! যাও যাও, যাবে না কেন?

—আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

—দুষ্ট লোক যখন ভালো ব্যবহার করে, তখন জানবে যে তার নিশ্চয় কোনো ধান্দা আছে। কোন স্বার্থ সিদ্ধ করার ধান্দা আছে।

—দেওতা! কামিয়াদের কাছে মালিকদের আর কী ফায়দা উঠাবার আছে?

—তা কি থাকে না গনু? বাসমোতির ব্যাপারেই কত কি জানা যাবে হয় তো। আফশোস, বহোত হি, আফশোস। বাসমোতি... আমার সঙ্গে দেখাই হল না—আমিও ছিলাম না...

—সরপঞ্চজীর ঘর খুব চুপচাপ।

—হ্যাঁ। সুচেতের মা ছেলেকে নিয়ে মাণ্ডার গেছে। ওর বোনের বাড়ি।

—কেন?...হাতের হালত্ খারাপ?

—দূর দূর! বেগেমেগে জুড়াতে গেছে। ছেলের কারণে সে তো লঙ্কাকাণ্ড বাধাতে চেয়েছিল। কেউ মদত দেয়নি তাতে খুব রেগে গেছে।

—যাক্! আমি ভয় পেলাম যে সে মাণ্ডার হাসপাতালে গেছে দেখাতে।

—না, সে রকম কিছু নয়। আর তোমার শুনতে ভালো লাগবে না, ওই জানোয়ার সুচেতের কথাও আমি ভাবি। সরপঞ্চ যদি ওকে ছোটবেলা থেকে বাইরে রেখে বোর্ডিঙে পড়িয়ে মানুষ করত ··

—সুচেতও দামোদর সিং বনে যেত দেওতা।

—হাঁ। পলামুর মাটিতে আচ্ছা ফসল চাই, আচ্ছা আদমি হওয়া খুবই মুশকিল।

—ননকু তো বারাহির মুনশিজীর মুখে ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলছে, আমার মুখে ধোঁয়া ছাড়ল, বাসমোতির মাকে বলে বসল, আওরত লোগকো পয়জার দাবাকে রাখনা হি আচ্ছা হৈ! কেমন কথা, বলুন?

—ওই তো বললাম। পলামুতে ভুঁইয়া ছেলে, কামিয়ার ছেলে, সে এমন করছে কেন? এত সাহস তাকে কে দিল? গনু! গরিব ঔর দলিতকে সাহস দিতে পারে কোনো পার্টি, কোনো সংগঠন।

—তাই?

—কিন্তু পলামুতে তো কোনো পার্টি ভাবে না গরিবের জন্যে। সবাই ডালটনগঞ্জে বসে নাকা উঠাবার ধান্দা করে। রাঁচি দেখো, সিংভূম দেখো, কত আন্দোলন হচ্ছে। কাগজে কতবার নাম উঠছে। পলামুতে কিছুই হয় না।

—তবুও ননকুর সাহস কত!

—এই তো মজা। গরিবের জন্যে কেউ ভাবল না, কেউ কোনো কাজ করল না, তখন এ সব পলিটিকাল লীডাররা তো গুণ্ডা-বদমাশ ডাকু! ওরা মদত দিচ্ছে, আর ননকুও বনছে ওদের পিট্‌ঠু।

—পলামু খুব অভিশপ্ত জেলা।

—খুব।

—তবু তো আপনি আছেন—চন্দা সিং আছে—এমন সব ভালো লোক!

—মাধো খুব ভালো ছেলে।

—হাঁ—জরুর—গন্নুর বুকটি চাপা আবেগে ওঠনামা করে হাপরের মতো। মাধো আর বাসমোতি।

—দেওতা! বাসমোতি বেঁচে তো আছে?

—নিশ্চয়। মনে ভরসা রাখো গন্নু।

কথা বলতে বলতে ওরা পৌঁছে যায় কোঠিবাড়ি। গ্রামের পথে পা দিতেই গন্নুর বুকটা হা হা করে ওঠে। ওই পাথরটায় বসত বাসমোতি, বসেই থাকত। বাবা যখন ফিরবে, বাবার সঙ্গে ফিরবে। গ্রামে মাঝে মাঝে আসত এক রাওতাইন বুড়ি। পুরনো কাপড়ের বদলে বাসনবর্তন বেঁচে যারা, তাদের কাছ থেকে পুরনো কাপড়ের গাঁটরি কিনে নিত সে, গরিব ইলাকায় বেচত।

বাপ রে ননকুর জেল্লাদারি জামা প্যাণ্ট। জামায় পকেট কত, তাতে বোতাম বা কত। সব ঝলমল করছিল।

ওই রাওতাইন না এলে বোর, কোঠিবাড়ি, বারহি, মৌথাবনি এমন সব টৌলির মানুষরা জামাকাপড় কেনে নি পারতপক্ষে।

বাসমোতি ওই রাওভাইনের কাছ থেকে ঘাস বেচা পয়সা দিয়ে গন্নুর জন্যে যে অসম্ভব বড় শার্ট কিনে দেয়, আজও সেটা ওর একমাত্র জামা।

নাক বিঁধবার পর ঘা হয়ে গিয়েছিল। এখনো দাগ রয়ে গেছে। বাসমোতি ভুরা গুড়ের সরবত খেতে বড়ই ভালবাসত।

গন্নুর ঘরের সামনে তেতরি, রাম, মাধো, চন্দা সিং, মাধোর মা ঝালি। রামের গায়ে জামা, ধুতি আঁটসাঁট পরা, পায়ে মোটা ধাবড়া চটি। রামের চেহারা ও স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে। গন্নু চোখ কুঁচকে দেখে। না, ছেলের চেহারায় কোনো মন্দ ভাব নেই। রাম ওদের প্রণাম করে।—না, ছেলে সহবত ভোলে নি।

এ ঘর, ও ঘর থেকে খাটিয়া আসে। সবাই এগোয় দক্ষিণে। দক্ষিণ দিকে বোর টৌলি। কোঠিবাড়ি খানিক ঢালের আরো উপরে। দুই টৌলির মাঝে একটি তেতুঁল গাছ ও একটি বট গাছ। গাছ দুটি খানিক ঝুঁকে আছে। ঝড় জল হলে গাছ দুটি উপড়ে পড়বে, এমন কথা প্রতি বছরই বলা হয়। তবে গাছগুলি পড়ে নি। তেঁতুল গাছটিকে সংবৎসর অনেক ঢিল ও লাঠির বাড়ি খেতে হয়। তেঁতুল পাতা ও লঙ্কা দিয়ে মকাই-মাড়োয়া-গম বা কুরথি দানা সিদ্ধ করে ঘেঁটে নিলে একটা স্বাদ হয়।

গাছগুলির নিচে খাটিয়া পড়ে, সবাই বসে। গন্নু এখন যেন বুকে খানিক বল পায়, ছেলে এসেছে। এই পাঁচজনের জমায়েত থেকে ও খানিক ভরসাও পায়। আর গাছের পাতায় বহে চলা বাতাসে ওর মনে কোথাও লাগে উদাসীনতার প্রলেপ। ক্ষেতিবাড়ি কাজ করা মানুষের স্বভাব ও চরিত্র বড় অদ্ভুত। বড় বড় ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে মানিয়ে চলাই তার ধর্ম। রাম এসেছে, এত লোক এসেছে, কিন্তু বাসমোতি-সমস্যার কোনো সুরাহা যে হবে না তা যেন গন্নু বোঝে।

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর রাম বাপের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি তো টাউনে ছিলাম না বাবা। ভকিলবাবু আমাকে গারোয়া পাঠিয়ে দেয়। সেখানে কাজ ছিল।

—কি কাজ, রাম ?

—দরপচাঁদজী ! ছাপাখানার কাজ শিখছি, খানিক শিখেছি। ভকিলবাবুও পিওনের কাজ করান। হাঁ হাঁ, দু' জায়গাতেই কিছু পাই।

—কখনো তো দিস না।

—না বাবা। তোমাদের দিই না, নিজেও খরচ করি না। কয়েক বছরে কিছু জমিয়েছি। ঠিক করেছিলাম যে যখন তোমাদের কামিয়ৌতি খালাস হবে, তখন এই টাকা কাজে লাগাবে।

ঝালি বলে, রাম ! তোর বাবা-মার কামিয়ৌতি খালাস করার ব্যবস্থা করলি. আমরা কোথা যাব ?

—মৌসি ! মুরগি এখনো দোকানে, পেঁয়াজ কাটছ কেন ? খালাস বহোত দূরে। তাকে কাছে আনতে হবে। ঔর এ কথাই বা ভাবছ কেন, যে আমার বাবা-মা একা খালাস হবে ? তা কখনো হয় ?

রামের কথাবার্তায় বেশ আত্মবিশ্বাসের ভাব। বয়সে সে তো বাসমোতির চেয়ে কয়েক বছরেব মাত্র বড়, কিন্তু কত যেন বিচক্ষণ। গন্নুর মনে হয়. তার ছেলে দবপচাঁদ, চন্দা, এদের মতো হয়ে গেছে। যাক এটাও একটা সান্ত্বনা। গন্নু এবার গলা ঝাড়ে। রাম তাকায়।

—বাসমোতির কথা ! বাবার খবর পেয়ে আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। ননকুর বাবাও আছেন, তিনি মাপ করবেন আমাকে। আমি তো বলতে এলাম বাসমোতিকে পাঠাবার কোনো দরকার নেই।

—দরকার নেই ?

—না। ননকু আজকাল দামোদরের পিট্‌ঠু। এখানে বসে বলতে ভয়ও লাগে।

—নির্ভয়ে বলো। কেউ খুকরা নেই।

—হলেই বা কি এসে যায় চন্দাজী ! সাপকে সাপই বলতে হবে। ওই দামোদর সিং সনাতন সিংয়ের মদতে নানা গুণ্ডাবাজি করছে। বড় বড় ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। যত সরকারী ঠিকাদারি সব বাগাচ্ছে ভালো কথা। এখন খারহা-মৌথাবনি সেচ-প্রকল্পও

মঞ্জুর। বোর নদী আর কোহাই নালার মাঝে সিচাই খাল হবে। জমিও সরস হবে, জমির দামও বাড়বে।

—যদি হয়!

—দামোদর ঠিকা পেয়েছে। চুরিও হবে, কাজও হবে। কেন কি যত ব্রাহ্মণ আর রাজপুত ঠাকুরদের জমি তাতে সরস হবে।

—খাস জমিও আছে।

হাঁ চন্দাজী, তাতে ধান্দাও আছে ওদের। যা হোক দামোদরকে সনাতন বলেছে, তুমি চোলাই ঠেক করো আর রেণ্ডি বাজার দেখো। এখন ঠিকাদার—মস্তান—কত রকম লোকের হাতে পয়সা।

—বেটা; রেণ্ডি-ব্যবসা তো বহোত্ হি পুরানো। আমার ছেলে ননকু একটা জানোয়ার। কিন্তু...

—চাচাজী! দামোদর তো টাউন ছেড়ে আসবে না। ও পুষছে নানকু, দলজিৎ সিং আর হাসানকে। ওর কয়েকটা মুনশিও লাগানো আছে যারা কুলিচালান কারবার দেখে। ননকু দেহাতে ছিল, চেনে জানে। ও দেহাত থেকে একটা দুটো মেয়ে নিচ্ছে চালান দিচ্ছে।

—বাসমোতি তো ওর বউ।

—সনাতন সিং দেহাতী মেয়ে খোঁজে। কয়েকদিন তামাশা করে। তারপর বাজারে ছাড়ে তাদের।

সনাতন ওদেরকে দামোদরের হাতে ছেড়ে দেয়। দামোদর নিজে কোনো ময়লা ঘাঁটে না। ননকুরা ওদের থেকে পয়সা উঠায়। যখন একদম হাড় বেরিয়ে গেল, কি রোগ ধরে গেল, চলো সব গোপীনিবাস।

গোপীনিবাস কী?

—এক মন্ত্রীর সম্পত্তি। এক বড় হাবেলি। কোয়েলের ধারে ভাঙাচোরা ভুতের বাড়ি যেন। সেটা ডালটনগঞ্জের জঞ্জাল রাখবার পাত্র। রেণ্ডি পাবে, ভিখারি পাবে, কুষ্ঠরোগী পাবে।

—সব সেখানে ভুখা মরে যায়?

—না না। যারা এমন নিয়মে সংসার চালাচ্ছে তাদের তো

পুণ্যের দরকার সবচেয়ে বেশি। শেঠানী আছে কয়েকজন। তারা রোজ ওখানে মুটঠিপর সত্তু আর এক টুকরা গুড় বিলায়।

দরপচাদ ঈষৎ হেসে বলে, ওটা হল খণ্ডনব্রত। ওই ব্রত করলে জনমভোর বিলাবে।

—সত্তু আর গুড় নিবার জন্যে ওখানে কুষ্ঠী, ভিখারি আর রেণ্ডিরা এ-ওর গলা টিপে ধরে। কতজন মরেও যায়। কোয়েলে ফেলে দেয়।

—তারপর?

—ননকু জানে যে রেণ্ডি-কারবার, মদ-কারবার, এ সব নিয়ে যা বলবার, যা লিখবার, তা ওই ভকিলজী আর পত্রকারজী করে। ওর তো আমার উপর খুবই রাগ আছে। ইদানিং শুনছিলাম যে খুব তাড়াতাড়ি ননকু সনাতনকে টাটকা দেহাতী আওরত দেবে। তারপর...

তারপর কী হল?

—আমি ওকে ভালো কথায় বুঝালাম। বললাম, ভৈয়া! এ পথ ছেড়ে দাও। বড়লোকের ধান্দায় পড়ে তুমি গরিবের ছেলে, গরিবের কেন সর্বনাশ করছ? তাতে তো সে মানলই না। খুব রাগারাগি হল। আমিও দু-পাঁচ কথা বললাম। তখন বলল, বাসমোতিকে এই টাউনে এনে রেণ্ডি বানাব, তুমি আমাকে রুখতে পার? কী করবে তুমি?

—হা ভগবান!

—পুলিস কিছু করবে না?

—বাবা, সনাতন সিং যদি জিলার সব ঔরতকে উঠিয়ে নিয়ে যায় কেউ কিছু করবে না। টাউনে ক'টা লাশ সে ফেলল, কত বড় বড় লোকের লাশ পড়ল, কী হল তার? সে তো কোনো কাজ নিজে করে না। দামোদরের মতো বহোত্ পিট্‌ঠু আছে তার। আরে! আগেকার জেলা কমিশনারের গাড়ি সে ভেঙে দিল ট্রাক চালিয়ে, কী হল তার?

—তাহলে আমরা হাত-পা তুলে বসে থাকব? বাসমোতিকে খুজব না?

—বাবা। সনাতন সিং যদি তাকে আটকে রাখে, যে খুঁজতে যাবে সেই খুন হবে।

—কি করা যাবে রাম?

—বাবা! তুমি তো টাউনে থাক না। আমরাই দেখব। তবে এটা জেনো, যে বাসমোতিকে আমি যেমন করে হোক খুঁজে বের করব।

—গরিবের জন্যে কেউ নেই!—এ কথা বলে ননকুর বাবা শূন্য চোখে সকলের দিকে তাকায়। তারপর গন্নুকে বলে, ঘর চলি ভৈয়া!

—বোসো, বোসো। তোমার কী দোষ?

—আমার দোষ নয়, তোমার দোষ নয়, বাসমোতির দোষ নয়, কারো দোষ নেই তো বাসমোতিকে ননকু নিয়ে গেল কেন? না ভৈয়া, আমার বুক ভেঙে গেছে।

দরপচাঁদ বলেন, এখন তো এমন করে লাভ নেই। তোমরা যদি বলো তো, অন্য কথা বলি?

—বলুন দেওতা।

—একটু জল খেলে হত।

চন্দা সিং বলে, জলের কলসি আর লোটা আনো মাধোর মা। তেষ্টা সকলেরই পেয়েছে। বলুন দরপচাঁদজী।

—একটা তো কথা, সেটা মৌথাবনির জন্যে ভালো যে চন্দা সিং বলছে, ওখানে স্কুল মঞ্জুরি আছে, কার্যক্ষেত্রে চলে না। এবার ও মঞ্জুরি স্কুলের জন্যে পাকা ঘর মঞ্জুর করাচ্ছে। সে ঘরে সে-সব মাস্টারকে ঢুকতে দেবে না, যারা টাউনে বসে দোকান চালায় আর মাইনে নেয়।

—আপনি চালাবেন?

—হ্যাঁ।

—আপনার বেতন কে দেবে?

—সেটা চন্দা সিং মঞ্জুর করাবে। যারা আসে না, পড়ায় না তাদের বদলে আমায় নাম ঢুকাবে বলছে।

—পারবে?

—অনেক ঝামেলা হবে, তবে পারব।

—আর একটা ভালো খবর বলি, ওই পাকা স্কুল বাড়ির জন্যে চন্দা সিং খারোয়ার, উপমুখ্য মৌখাবনি বনে ঠিকাদার।

—এ কী তাজ্জব বাত চন্দা জী!

—ভৈয়া এস্টিমেট দিয়েছি একটা ঘরের, কিন্তু আমরা তো নিজেরা বানাব। ওই খরচে দুটো ঘর হবে, দুটো বোর্ডও হবে।

—খুব ভালো। তা আপনি কেন সিচাই খালের ঠিকাদারি নিয়ে নিন না?

ভালো বলেছ। এখন তো ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করার দিন নেই। ঠিকাদারি লড়াইয়ে জিততে পারলে তবে কোনো খারোয়ার আবার পলামু জিলায় রাজা হতে পারবে।...যাক! বলুন দরপচাঁদজী।

—এ কথাটা ননকুর বাপেরও জানা দরকার!...রাজ্য সরকার বলে পলামুতে কামিয়া মোটে হাজার-চৌদ্দজন। বেসরকারী হিসাব বলে লক্ষ লক্ষ। সে যাই হোক! এতদিন বাদে আবার বন্ধুয়া মুক্তির কথা হচ্ছে। কিছু হয় তো মুক্ত হবে। সরপঞ্চ আর মুখিয়া বলছে, দরপচাঁদ! আমাদের খারহা গ্রামে যত মালিক, তাদের কামিয়াদের মুক্ত করতে হবে। আমাদের কথাগুলি তুমি ওদেরকে বোঝাও।

—দরপচাঁদজী, এ কথা তো আমরা জানি।

আরে শোনো না। আমি তো হাঁ হাঁ, কেন নয়, বলে খুব গল্প-সল্প জুড়লাম। তারপর শুনলাম যে, তোমাদের ডাকা হবে খারহাতে। তশীলদার, মহকুমা হাকিম, ব্লকবাবু সকলের সামনে তোমাদের মুক্ত করা হবে। সেচখাল যেখানে হবে, সেখানে জমি মিলবে, চার হাজার টাকা।

—আমরা সব মেনে নেব?

আর মালিকরা টাকাও নেবে, সেচখালের পাশে জমিও নেবে?

—আমি বলি কি, ওদের কথায় 'হাঁ' বলো।

—তারপর?

—সেমরাতে ওরা হক আদায় করেছে, 'বন্ধুয়া সমিতি' গড়ে নিয়েছে।

—আমরা যে শুনলাম, পায়নি?

—ওরা লড়ে লড়ে আদায় করেছে।

রাম বলল, সে কথা সত্যি বাবা। আমরা কেন পড়ে পড়ে মার খাব?

—কী করব?

—প্রথমে খালাস নেবে। তারপর ব্লক থেকে মহকুমা হাকিম, সেখান থেকে সদরে যাও, বলো যে সরপঞ্চ আর মুখিয়ার হাত দিয়ে নয়। সিধা সাহারা চাই।

—মালিক লোক খুব লড়বে।

—জরুর লড়বে।

—বহোত মারবে।

—জরুর মারবে।

—অনেক কৌশল করছে যাতে বন্ধুয়া দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আসে।

—জরুর কৌশল করছে। আমি তো আগেই বলেছি যে দুষ্ট দুর্জন যখন মিঠা কথা বলবে, তখন জানবে যে তার খুব বড় কোনো ধান্দা আছে। গোহুমন সাপ যখন ফনা নামিয়ে রাখে, সে ছোবল মারার ধান্দাই করে।

চন্দা সিং খারোয়ার বলে, তোমার যা পাওনা তাও তো লড়াই করেই নিতে হবে। তবে ভেবে নাও, ওরা কোন্‌দিকে উলটা মার দেবে।

গনু অনেকক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, যা হবে তা হবে। মালিক কবে ভালো হবে, কবে কামিয়ৌতি বন্ধ করবে, সেজন্যে বসে থাকলে কয়েক জন্ম কেটে যাবে।

মাঙ্গারাম বলে, কাজকাম আর দেবে না।

মাধো বলে, তখন বাইরে খাটতে যাব।

—সেখানে বা কোন্ সুখ ?

—কিচ্ছু না। কিন্তু কামিয়া তো থাকবে না। রামকাণ্ডার মতো এখানেও স্কুল হবে বোর্ডিং হবে। যদি নিজেদের পাওনা পাও তাহলে জমিও পাবে।

গন্নু এতক্ষণে চাপা আনন্দে বলে, মালিকরা যা চটবে, যা শোর উঠাবে।

—মুক্তি না দিলে কুশলপ্রসাদ ভকিল কেসও দায়ের করবে। বন্ধুয়ার হয়ে কেউ মামলা করছে পলামুতে এও তো আগে ভাবা যেত না গন্নু।

গন্নু, ননকুর বাবা, মাঙ্গারাম, ঝালি, তেতরি, দুঃখী মানুষগুলি যেন আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করে যে এটাও একটা পদক্ষেপ।

যার কেউ নেই তাদেরকে নিজেদের জন্যে নিজেদেরই দাঁড়াতে হয় গন্নু।

হাঁ দেওতা। চলুন ঘরে যাই।

—তোমরা যাও। আমি চন্দার সঙ্গে যাব।

সবাই হাঁটতে হাঁটতে ফের গন্নুর ঘরেই আসে। ঝালি বলে রাম তো আটা লবণ ডাল এনেছে।

তেতরি বলে, হ্যাঁ, চুলা ধরাই।

—তোর জন্যে কাপড় ?

—বাসমোতির জন্যে এনেছিল।

—কত বুঝদার ছেলে !

—হ্যাঁ খুব ভালো ছেলে।

—ছেলের বিয়ে দে।

রাম হেসে বলে মৌসি। জীবনে কতগুলো বিয়ের ঘটকালি করলে বলো তো ?

—অনেক। বাসমোতির বিয়ের কথাও আমি ঠিক করি। কি করে জানব যে এমন হবে।

—ওর কথা থাকুক।

অনেক যত্নে তেতরি রান্না করে। ডাল রুটি আচার। ননকুর বাপ মন দিয়ে খায় না। তার মনটি খুবই ভারি। খুবই উদাস হয়ে গেছে। ননকু যদি বউকে বেচে দিতে পারে, তাহলে বাপকে খুন করতেও পারে। সে কোন্ পাপে ননকুর মতো ছেলের বাপ হল তা কে বলে দেবে? বন্ধুয়া-মুক্তির ব্যাপারটাও তেমনি আগ্রহী করে না তাকে। ও সব স্বপ্ন কথা, অবাস্তব।

যাবার কালে সে রামকে বলে, ও সব হাঙ্গামায় তুমি খুব মেতে উঠ না বাবা। মালিকরা মেরে দেবে। আর রাম? ননকু যা করল কী আর বলব! মাঝে মধ্যে আমার খানিক খবর নিও।

—আপনিও বন্ধুয়া-মুক্তির কথাটা সকলকে বলবেন, সবাই জানুক।

—বাবা! তুমি বলছ যখন তখন তো নিশ্চয় বলব। কিন্তু আমার মালিক বড় সাংঘাতিক লোক। সেই তো বারাহির খারোয়ার-টোলির সব আদিবাসীদের জমি দখল করেছে। তারা আপন জমির খাজনা দেয়, জমিতে চাষও করে। কিন্তু ফসল তুলে মালিক, ওদের এক ভাগ দেয়। তার হাত থেকে খালাস মেলা খুব কঠিন।

—ননকুর মিলেছিল।

—ননকুর পিছনে থোড়াবহোত মদত ছিল অন্য লোকের, তাতেই খালাস দেয়, সেটা পরে বুঝেছি! তবে সেজন্যে দেড়শো টাকাও নিয়েছিল।

—ওটাও বেআইনী। দশ-বিশ টাকার জন্যে তিন পুরুষ কামিয়া খাটবে আবার টাকা দিয়ে খালাস হবে, এ তো হতে পারে না।

—তাই তো হচ্ছে বাবা। মালিকরা বলছে, ভারত সরকার বহোত্ প্রেম সে মুক্তি দিবার আইন করেছে। তোরা খালাস নিয়ে

নে। আমি আধা লুকমায় মজুর পাব। কিন্তু যার কাছে যা পাওনা সব দিয়ে তবে খালাস নিবি। কার ঘরে দুশো-পাঁচশো টাকা আছে, যে খালাস নেবে তাই বলো ?

—খুবই গণ্ডগোল সব কিছুতে।

হাঁ বাবা, তাতে সন্দেহ নেই। চলি আমি, আর তোমার বাপ-মা যেন আমাদের দোষ না দেয়। কিছু জানি না বাপ! মালিকের ঘরে খাটব, নিজের ঘরে পড়ে ঘুমাব। কিছু জানিনা।

খারহার বন্ধুয়াদের মুক্তির তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, বাসমোতি জানেনি। সে জানেনি যে মাধো সিং খারোয়ার আর তার দাদা রাম তাকে খুঁজছে আর খুঁজছে।

সনাতন সিংয়ের বুনো দেহাতী গন্ধের নেশা ফুরাতে বাসমোতি ডোমটোলির উপান্তে, কোয়েলের তীরে সেই ঘরে এসে জমা হয়েছিল, যেখানে ওর মতো আরো মেয়েরা আগেই এসেছে।

কতদিন ও সেখানে আছে, সে হিসেবও ও করতে পারেনি। কোঠিবাড়ির বাসমোতি খুব জীবন্ত মানুষ ছিল। সব বিষয়ে ছিল তার কৌতূহল। কাঠবিড়ালির ছোটাছুটিও সেই বাসমোতি মন দিয়ে দেখত। আর ঘাস কাটতে কাটতে সে বাসমোতি কখনো লিটিরিটি পাখির বাসা ভাঙেনি। পাখিগুলো ঘাসের কোলে বাসা বাঁধবে, পাথরের ফাটলে বাসা বাঁধবে। আর ঠিক দুপুরবেলা যখন গরুর গলায় বাঁধা পরকির শব্দ ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই, পাখি-গুলো উড়ে উড়ে ডাকবে, লি—টি! রি—টি!

ডালটনগঞ্জের বাসমোতি কোনো হিসেব করতে পারে না, হাসতে পারে না, কাঁদতে পারে না। এই বাসমোতি শুধু পুতুলের মতো ঘরে বাতি জ্বেলে বসে থাকতে পারে। ওদের কসবীটোলি পেশাদারী নৈপুণ্যে চলে। নেকিচাঁদ ও জাঠা সিং খদ্দের আনে, টাকা তোলে। বাসমোতিরা খদ্দেরদের চাহিদা মিটায়।

রাতে খদ্দের, দিনে নেকিচাঁদ! নেকিচাঁদের কথা না মানলে সে একসঙ্গে তিন-চারজনকে ঢুকাতে পারে।

ননকু হপ্তায় হপ্তায় আসে, নেকিচাঁদের কাছে জমা তোলে। খোরাকি খরচ ফেলে দিয়ে যায় নেকিচাঁদের হাতে।

বাসমোতি রাঁধে, খায় ঘুমোয়। স্নান কোয়েলের জলে, শৌচাগার কোয়েলের বালি। কোয়েল বিষয়ে বাসমোতির এখন একটা আলাদা চেতনা, সেটা খুবই প্রখর। কোয়েলের বুকে যখন সন্ধ্যা নামে, তখন ঝড়তিপড়তি মেয়েরা পাড়ে দাঁড়ায়, খদ্দের ধরে, কোয়েলের বালিতে শুয়ে নিজেদের বিক্রি করে।

বাসমোতি বুঝেছে যে দামোদরের রেণ্ডিদের জীবনটা ছকে বাঁধা। প্রথমে সনাতন সিংয়ের কাছে অস্থায়ী, ক্ষণিকাবাস। তারপর এই টোলিতে নেকিচাঁদ ও জাঠার হেপাজতে প্রতি রাতে নিজেকে বারবার বিক্রি করা। তারপর যখন তুমি ঝড়তিপড়তি ছিবড়ে হয়ে যাচ্ছ, তখন আর ঘর তোমার জন্যে নয়। নেকিচাঁদের হেফাজতিও তুমি পাচ্ছ না। কোয়েলের পাড়ে দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরছ। তোমার খদ্দেরও ঝড়তিপড়তি লোক সব। সকাল হলে কসবীটোলিতে কারো দাওয়ায় ঘুমোচ্ছ। তারপর, যখন অন্ধকারে কোয়েলের বালিতে তোমার কাছে আর কোনো খদ্দের আসছে না, তখন তুমি স্বাধীন।

চলে যাও গোপীনিবাসে। কোয়েলের পাড়ে রাজ্যমন্ত্রী বিক্রম-কেশরী নওনেহাল সিংয়ের বাড়ি গোপীনিবাসে। বাড়ি একটি, ভাগীদার অনেক, মামলাও অনেক। রাজ্যমন্ত্রীর জীবন বা মন্ত্রীত্ব-কালে সব মামলা মিটবে বলে মনে হয় না। মন্ত্রীর বাসনা ছিল কোয়েলের তীরে তিনি একটি ছোটখাট 'পাকিজা' বাড়ি বানাবেন। বাড়ির সামনেটি লক্ষ্ণৌয়ের নবাবী-প্রাসাদের মতো হবে। স্থপতি ও বাস্তুকার বলেছিল যে সে দশ লক্ষ টাকায় 'পাকিজা' ছায়াচিত্রকে মনে পড়ানো এক বাড়ি করে দেবে। কিন্তু তাঁর সৌতেলা, বা বৈমাত্র ভাইদের ইচ্ছে, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো গম্বুজবিশিষ্ট এক বাড়ি। বিমাতার সাফ কথা, ছয়তলা বাড়ি করব সরকারী আপিস ও ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেব।

গোপীনিবাস কাহিনী খুবই জটিল। মন্ত্রীর তিন বিমাতা

ছিলেন, নিজের মা গতাসু। দুই বিমাতার তিন ছেলে, অপুত্রক তৃতীয় বিমাতা, মন্ত্রী নিজে, প্রত্যেকে বাড়িটির দাবীদার। কেসের ম্যারাথন প্রতিযোগিতা আর শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ সব মামলা দশ বছর আগে শুরু হয়েছে।

বিতর্কিত বাড়িটি জীর্ণ, ভেঙে পড়ছে। দরজা-জানালা-কাচের শার্সি, সবই উধাও। দীর্ঘকাল ও বাড়িতে কুষ্ঠী-ভিখারী-গলিত ও পরিত্যক্ত রেণ্ডিদের বাস। বাসমোতি জানে, যে কসবীটোলির এই যান্ত্রিক জীবন অস্থায়ী, কোয়েলের বালিও অস্থায়ী। স্থায়ী একমাত্র গোপীনিবাস।

অন্য মেয়েরা হাসে, কাঁদে, ঝগড়া করে। তারা বাজার থেকে ভালো খাবার কেনে মাঝে মাঝে। খদ্দেরদের কাছে লুকিয়ে কিছু নেওয়া তাদের ক্ষেত্রে বৃথা। কেন না নেকিচাঁদ ও জাঠা সব খুঁজে খুঁজে বের করে নেয়। তবু ওরা কিছু সরাতে চেষ্টা করে। কাপড়-চোপড়, সাবান, তেল, সবই কোম্পানির খরচে চলে।

বাসমোতি দেখতে পায় যে এখানেও ওরা কত জীবন্ত, ব্যস্ত, দুঃখের মধ্যে সুখ খুঁজতে চঞ্চল। বাসমোতি ওদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। সর্বদা চুপ করে থাকে সে।

নেকিচাঁদ অন্য মেয়েদের বলে, বাসমোতির মতো থাকতে পারিস না? কোনো কথা নেই, কাম উঠাচ্ছে, যা বলছি তাই শুনছে। আর বাসমোতিকে বলে অন্য মেয়েদের মতো কথা বলো, হাসো, রাগ করো, যেমন সবাই থাকে তেমনি। মনে কী গুমরায়?

বাসমোতি সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে। অর্ধেক সময়ে মনে হয় ওর শরীর এখানে আছে, মন এখানে নেই। নেকিচাঁদ বিরক্ত হয়ে ওকে ছেড়ে দেয়।

ননকুকে ও বলেছে, বাসমোতি বেশিদিন টিকবে না।

—ভাগবে বলে মনে হয়?

—না, তা নয়। খদ্দের খুশি হল, না হল না, কিছুতে কিছু এসে যায় না ওর।

—মারো ভালো করে।

—মেরে দেখেছি। একই রকম চোখে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—কী ব্যাপার!

—জানি না ওস্তাদ। খাওয়াদাওয়ার যত্ন করে না, কখনো হাসে না। এ রকমই ছিল সেই ধোবিন্ বউটা. কত তাড়াতাড়ি মরে গেল।

আমি দেখছি ওকে।

—খুব তাড়াতাড়ি ও কোয়েল কিনারে যাবে, দেখো। খুব তাড়াতাড়ি যাবে গোপীনিবাস।

—যাঃ! দু-তিন মাসও হয় নি, এরই মধ্যে যাবে গোপীনিবাস? তা কেমন করে হয়?

—আরে সে ধোবিন্ বউটা কোলের বাচ্চার জন্যে শুষত না? তাতেই তো মরে গেল।

—বাসমোতির তো বাচ্চা নেই।

—জানি না। রহিস রহিস গাহক এনে দিই। তারা সবাই বলে, নেকিচাঁদ! চার নম্বর আওরত কথা বলে না, হাসে না, উসিসে মজা উঠতা নেই।

—আমি যাব, পিটাব।

—এমন কাজও কোরো না ভৈয়া। বাসমোতির উপর নিস্পেক্টর বাবুর থোড়াবহোত কিরপা আছে। উনি তো লিখাইপড়াই লোক, বাসমোতিকে পছন্দ করেন। কাপড়ও এনে দিয়েছেন দুটো।

ননকু খানিক দমে যায়। বাসমোতিকে সে এনে দিয়েছিল। সনাতন সিং দিন পনেরো খুব খুশি ছিলেন। ওই খুশিয়ালির সময়কালেই দামোদরের সিচাই খাল ঠিকাদারি হয়ে গেল, দামোদর কাঁচা বয়সেও রেণ্ডিও পেল একটি। দামোদরের লাভই হল।

কিন্তু বড়লোকের মন, না মতি! সেদিন দামোদর ফট করে বলে বসল, ননকু! তুই টাউন ছেড়ে লেবার চালানে যা। নেকিচাঁদ আর জাঠা চালিয়ে নিচ্ছে। আর মাল যা আসবে, তা লেবার থেকেই মিলবে।

—কেন হুজুর। কোনো দোষ হয়ে গেল ?

দামোদর মদের ঘোরে ছিল। সে বলল, রেণ্ডি আনিস, মেয়ে আনিস, সরাসরি নিজের বউকে নিয়ে এলি ? তুই তো গাহ্মন সাপ রে !

ননকু দামোদরের মানসিক গতিবিধি বোঝে নি। দামোদর কত মেয়েকে ভাড়া খাটাচ্ছে, তারা কে কার মেয়ে না বোন, বউ না কচি ছেলের মা, তা সে ভাবেও নি। কাঁচামাল ছাড়া ব্যবসা হয় না। এ কারবারে কাঁচা মাল কিনতে পয়সা লাগে না। বিনিয়োগ ব্যতিরেকে মোটা মুনাফার কারবার। চালিকা শক্তি, মেয়েগুলির অপার নির্বোধিতা, অজ্ঞতা ও অসাগর দারিদ্র্য।

সেসব মেয়েরা অত্যধিক ব্যবহারে ঝটপট গোপীনিবাস যাচ্ছে, না কোয়েলে মুখ থুবড়ে পড়ে মরছে, তা সে ভাবেও নি। কিন্তু ননকুকে সে বিশ্বাস পাচ্ছে না। পরের বউকে আনা যায়, তা বলে নিজের বউকে ? সরাসরি তুলে এনে সনাতন সিংকে ভেট দেয়া ?

দামোদর এখন রেণ্ডি ও মদের ব্যবসা থেকে ঠিকাদারিতে প্রোমোশন পেতে চলেছে। মস্তানি-গুণ্ডাবাজির দ্বিতীয় ধাপে উঠছে। প্রোমোশন মানে দায়িত্ব বাড়া। দায়িত্ব বাড়লে বুদ্ধিও খানিক পাকা হয়। এ সময়ে বেশ দায়িত্ববান ও বিচক্ষণ এ প্রমাণটা থাকলে সনাতনের কাছে দাম একটু বাড়বে।

এখন তারও মস্তান পিট্‌ঠু দরকার। তবে ননকুর মতো নয়। আরেকটু দক্ষ ও পালিশযুক্ত। সনাতনও বলেছে, গাঁওয়ালী ঝুট-ঝামেলা হটাও

দামোদর সেইখানে উঠতে চায়, যেখানে উঠলে সরকারী অফিসারের সামনে চেম্বার বের করে চোখে কালো চশমা এঁটে টেণ্ডার ধরানো যায়। দামোদর সেইখানে যেতে চায় যেখানে গেলে যুগল সিংকে খুন করলে কুমারকেশরী তাকে বাঁচায়—সে আদালতে গেলে তার বন্দুকধারী পিট্‌ঠুরা পুলিশ ও আদালতকে কলা দেখিয়ে আদালতে ঘোরে।

দামোদরের সে সব স্বপ্নে ননকুর মত জনোয়ারকে জায়গা দেয়া কঠিন।

ননকু বুঝতে পারছে না এটা বরখাস্তের হুকুম, না হুঁশিয়ারী।

নেকিচাঁদ বলল, বাসমোতি কেন, কোনো মেয়ের গায়েই হাত দেবে না তুমি। ওরা দামোদর সিংয়ের সম্পত্তি, তাই নয়?

ননকু নিশ্বাস ফেলে বলল, মারব না। বুঝাতে তো পারি।

—আমি একটা কথা বলব?

—বলো।

—সব ভালো থাকতে থাকতে ফুটে যাও।

—ফুটে যাব?

—হাঁ। সিনেমার মতো। ভ্যানিশ। টাকাপয়সা তো কম পাওনি, জমিয়েছো কিছু?

—হ্যাঁ···কিছু...

—মিছে কথা বলছ।

—আছে দু-পাঁচশো।

—ওটা কি কোনো টাকা নাকি? ও টাকায় কিছু হয় না। আজকাল পানের দোকানও নয়।

ননকু ভেবে পায় না, কাল অবধি তার কপাল ভালো ছিল, হঠাৎ মন্দ হল কিসে, টাকা তো তেমন পায়নি। যা পেয়েছে তা জামা-কাপড়, হিন্দী ফিলমি গানের ক্যাসেট, প্লেয়ার, ট্রানজিস্টর, সাইকেল এসব কিনে উড়িয়েছে। দেদার খেয়েছে, দেদার পান করেছে, মাঝে মাঝে রেণ্ডি ধরে ফুর্তি করেছে, অজস্র সিনেমা দেখেছে।

বাসমোতির কাছে যেতে পারছে না বলেই ওর মনে হল যেতে পারলে হত। পরদিন ও গেল ঢুকল। বাসমোতি শুয়েছিল, শুয়ে থাকল।

—কি রে বাসমোতি?

বাসমোতি চেয়ে থাকল। সবিস্ময় চোখ, যেন ও ননকুকে চেনে না।

—নেকিচাঁদ বলছিল তোর নাকি মন ভালো নেই, কথা বলিস না ?

বাসমোতি পাশ ফিরে শুল। ননকু অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে বেরিয়ে এল।

অন্যমনস্ক ভাবে ও চলছে, চলছে, হঠাৎ ওকে কে ডাকল, অশ্লীল গাল পেড়ে ডাকল। চমকে উঠে পিছনে ফিরে রাম ও মাধোকে দেখে ও ঘাবড়ে গেল। রাম ছুটে এল।

—ননকু! তোকে পেয়েছি।

—ছোড় দো রাম।

—বাসমোতি কোথায় ?

—আমি জানি না।

—তোকে মেরে ফেলব আজ, বল্ বাসমোতি কোথা ?

—মাধো! ছেড়ে দাও।

—আগে বলো তাকে কি করেছ।

ওরা দুজনে ওর দু হাত ধরেছে। ননকু ঘাড় ঘুরিয়ে শরীর মোচাড়তে থাকে। মজা দেখতে কিছু লোক দাঁড়াচ্ছে, আর যারা বুদ্ধিমান তারা চলে যাচ্ছে। কসবীটোলির কাছে একজনের হাত দুজনে চেপে ধরলে নিমেষে সোডার বোতল থেকে বোমবাজি এবং মাঝে মাঝে গুলি বা চাকু সবই হতে পারে। যারা ননকুকে চেনে তারা আগে পালায়।

এমন সময়েই ননকু নেকিচাঁদ ও জাঠা সিংকে দেখে। ওরা মজা দেখছে। মজা দেখছে, না ও কি বলে তাই শুনছে ? ননকু ভয়ে হিম হয়ে যায়।

—লাগছে মাধো!

—তাই তো চাই।

—আমি বাসমোতির খবর জানি না।

—আমরা জানি, যে তুমি তাকে এনে দামোদরের কাছে বেচে দিয়েছ সনাতন সিংয়ের জন্যে।

নেকিচাঁদ ও জাঠা এগিয়ে আসে।

—আমি...আমি তাকে আনছিলাম...তারপর রতনগড়ের কাছে ট্রাক থামাতে ও বলল যে পিসাব করব। নেমে গিয়ে সেই যে পালায় আর···আর জানি না, আমিও তাকে খুঁজছি।

রাম ও মাধো ওকে ছেড়ে দেয়। ছাড়ার আগে মাধো ওর ডানহাতটি মুচড়ে ভেঙে দেয়। ননকু ককিয়ে ওঠে। রাম বলে, আমরা চার-পাঁচশো লোক টাউনে এসেছি ননকু। বন্ধুয়াদের নিয়ে। রতনগড় যাব আর আসব। যদি ঝুটা বলে থাকো তবে দেখবে।

—কেন এসেছ?

জিলাধিকর্তার কাছে যাব।

রাম ও মাধো সাইকেল চেপে বেরিয়ে যায় সাঁ করে। ননকু ভাঙা হাত নিয়ে পথে একা দাঁড়িয়ে থাকে। নেকিচাঁদ কাছে আসে। বলে, বহুৎ খুব ননকু ভূঁইয়া! কার জন্যে এনেছ বউকে, কার কাছে দিয়েছ, তা পাঁচশো লোককে জানিয়ে এসেছ।

—আমি কিছু বলি নি।

—ওদেরকে কে বলল? খবরটা তো রেডিওতে বলে নি, বা কাগজে বেরোয় নি? ভালো, খুব ভালো। মানা করলাম, তবু বাসমোত্তির ঘরেও গেলে। ভালো। মালিক খুব খুশি হবে।

ননকু নিজের ডেরার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। জাঠা বলে, আরে ভূঁইয়া কে বাচ্চে! আগে তো মালিকের ডেরায় চল্। মালিক রাঁচি গেছে, আসবে, দেখা হবে।

—ভৈয়া! হাতটার জন্যে ডাক্তারের কাছে যাব। হাতের ছবি তুলাব।

—ভৈয়া! নেকিচাঁদ ভৈয়া! এখন তো ননকুর হাতেও চোট লেগেছে। ওকে তো একা ছেড়ে দেয়া মোটেই ঠিক হয় না।

—না না, ও আমাদের বন্ধু! টা টা ননকু!

ননকু কাঁদে, কিন্তু বাধা দেয় না। জাঠা সিং যদি ননকু ভূঁইয়াকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায় ডালটনগঞ্জের পথ ধরে—নিয়ে যায়

দামোদরের কাজ চালাবার বাড়ির দিকে, যাতে অনেক ঘর, অনেক উঠোন, যার বাইরের ঘরগুলিতে বহু লোক ও বহু মালের বাক্স শুধু যাওয়া আসা করে—ননকুর বাধা দেয়া নিরর্থক। হাতের যন্ত্রণা বেশি, না ভয়ের ?

পলামুর মানচিত্র থেকে ননকু এভাবেই বিদায় নেয়। এরপরে তার কি হল তা জানাও যায় না। পলামুর মানচিত্রে মানুষদের প্রবেশ ও প্রস্থানের হিসেব রাখা খুবই কঠিন।

বাসমোতির ঘরের খুব কাছে সব ঘটে যায়। বাসমোতি কিছু জানতে পারে না। ঘুমোয় সে। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে বিকেল হয়। নেকিচাঁদ মনে করিয়ে দেয়, আজ নিসপেক্টারবাবু আসার দিন।

বাসমোতি চেয়ে থাকে।

—আজ বুধবার না ?

বাসমোতি চেয়েই থাকে।

ননকুর ব্যবস্থা করার পর নেকিচাঁদ একটি সৎ কাজ করার আনন্দে খুব তৃপ্ত ও প্রসন্ন। ননকু এতই তুচ্ছ ছিল, যে সে কাকে কি বলল, বা না বলল, তাতে এসে যায় না কিছু। কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট পাথরের কুচিও পথ থেকে সরাতে হয়। দামোদরের পিট্‌ঠুরা বুঝুক যে সে সামান্য দোষেও ভয়ংকর শাস্তি দেয়। তারা ভয় পাক। বহুজনকে ভীত ও সন্ত্রাসিত রাখলে তবেই ওপরে ওঠা যায়।

নেকিচাঁদ বাসমোতির কাছে ঘন হয়ে এসে বলে, নিসপেক্টরবাবু চলে গেলে আমি আসব। তুই একটু হাসবি, একটু কথা বলবি তো ?

বাসমোতি ওর দিকে চেয়ে থাকে। নেকিচাঁদের আজ অযৌক্তিক ইচ্ছে যায় ওর ঔদাসীন্যকে ভাঙতে।

—আজ···ননকু ভুঁইয়ার···খেল্ খতম হয়ে গেল জানলি ?

বাসমোতির চোখে প্রশ্ন ফুটে ওঠে।

—দু'জন ছোকড়া···গাঁওয়ালী হবে···খুব হট্টাকট্টা জোয়ান, তাঁরা ওকে ধরেছিল তোর কথা বার বার শুধাচ্ছিল...রাম আর মাধো ·· তারা কে রে ?

বাসমোতির চোখে কোনো বিপন্নতা চমকে ওঠে। কি সব বলছে নেকিচাঁদ ? যে বাসমোতি এখন আর নেই, সেই কোঠিবাড়ির বাসমোতির শোনার মতো সব কথা ডালটনগঞ্জের নেকিচাঁদ কেন বলছে ?

—ওরা কোথায় ?

—এই তো বুলি ফুটেছে।

—কোথায় ?

—টাউনে এসেছে। বন্ধুয়াদের মিটিং করবে···তাই তো বলল।

—বন্ধুয়াদের...মিটিং...মিটিং ?

—বাঃ! বহোত খুব। নিসপেক্টার সাহেব আজকে খুব খুস হবেন। তুই কথা বলছিস। এই তো ভালো। তোর জওয়ানি আছে, বয়স আছে, ওরকম পাথর হয়ে থাকবি বা কেন? ওরকম পাথর হয়ে থাকলে আওরত বহোত জলদি মরে যায়, নয় তো গোপীনিবাস পৌঁছে যায়।

—হাঁ, গো-পী-নি-বা-স !

—তুই গোপিনিবাসের কথা ভুলে যা। নিসপেক্টর সাহেব বহোত খুশ হবেন আজ। আর উনি চলে গেলে আমি যখন আসব তখন আমাকেও খুশ করে দিস।

বেরিয়ে এসে নেকিচাঁদ জাঠা সিংকে বলে, আজ বাসমোতি কত কথা বলল! আরে! ওই ভুঁইয়া জানোয়ারটা ওকে ডাঁটাত, তাতেই ও চুপ করে থাকত। যেই বলেছি ননকুর খেল্ খতম, অমনি কত কথা বলল।

—খুব ভালো, খুব ভালো।

—এখন ননকু নেই, আমাদের কাজও বাড়ল, বাট্টাও বাড়বে।

—হাঁ, তাই ভালো হবে।

—তবে টাকা জমাস জাঠা! কারবারে তেজীমন্দী থাকে। মালিকের মনও কারবার থেকে উঠে যেতে পারে!

—আমার লাইন আছে। রাঁচিতে সিনেমার টিকিটে ব্লাকি কারবার।

—ভালো, ভালো।

ওরা কথা বলে। বাসমোতির ভিতরে কেবলি কোঠিবাড়ির বাসমোতি জেগে ওঠে কেন? ঘুমোক, ঘুমোক সে। এখন তো নিসপেক্টার বাবু আসবে। সে ডালটনগঞ্জের বাসমোতিকে দুটো শাড়ি দিয়েছে। লাল আর নীল। নাইলন ছাপা। বাসমোতি লাল শাড়িটা পরে। লাল শাড়ি, হলুদ জামা, চুলে বেণী, আঁচলটা টেনে সামনে দেয় সে। দেশের দেহাতের বাসমোতির মতন। চোখে কাজল, কপালে টিপ। কি সব নাম বলল, নেকিচাঁদ? রাম আর মাধো। রাম? মাধো? নেকিচাঁদ জানল কেমন করে? ক্রিং করে সাইকেলের বেল বাজে। নিসপেক্টারবাবু এসে পড়েন।

ঘরেই ঢুকেই তিনি বলেন, বাঃ!

রাত বাড়ে। রাত যখন অনেক বাড়ে, তখন ডালটনগঞ্জে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু কোয়েল নদীর দেখো ঘুম নেই। তার ক্ষীণ জলধারা বয়েই চলেছে, বয়েই চলেছে।

কত রাত! কোয়েলের বালিতে কোনো যুগল ছায়া জড়াজড়ি করছে না। হাবেলিতে হাবেলিতে ঘরগুলি অন্ধকার। বড়জোর কোনো ট্রাক বেরিয়ে যাচ্ছে, অথবা ঢুকছে শহরে। গোপীনিবাসে যারা থাকে তারাও ঘুমোচ্ছে।

কসবীটোলি এখন প্রায় ঘুমঘুম। বাসমোতির ঘরে নিসপেক্টার-বাবু ঘুমোচ্ছেন। আজ তিনি বহোৎ হি খুশ, ফলে ঘরে ফেরা হল না। নেকিচাঁদ বিরক্ত হয়ে গুলাবির ঘরে ঢুকে গেছে। বাসমোতি আস্তে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে।

না কোনা কড়া রাতপাহারার বন্দোবস্ত নেই। কেননা কোনো দিন কোনো রেণ্ডি পালায় নি এখান থেকে। বাসমোতি নিঃসাড়ে নদীর দিকে চলে।

পাড় ধরে নামে ও, বালির পর জল, জলের পর বালি। নদীর বুক পেরিয়ে ও চলে। তারপর ব্রিজের কাছাকাছি সাহপুরঘাটে এসে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে ওঠে।

এই তো সাহপুর। আর ওই যে সেই ভাঙা প্রাসাদ। এই পথ ধরে পশ্চিমে যেতে, যেতে, যেতে, যেতে এক সময়ে নিশ্চয় পৌঁছবে খারহা। এই পথ ধরেই বাসমোতি ডালটনগঞ্জে ঢুকেছিল। রাম আর মাধো ওকে খুঁজতে এসেছিল। বেশ তো। এ পথ ধরে তো ওদের ফিরতে হবে। আর তো পথ নেই।

কি যেন বলত মাধো? এ প্রাসাদ যেন কে করেছিল? কোন্ চেরো রাজা? সব ভুলে গেছে বাসমোতি।

কত রাত! তারাগুলো যেন সাঁতার কেটে চলছে। দরপচাঁদজী জানে কোন্ তারাটার কী নাম। সকালে ওরা খুঁজবে বাসমোতিকে? নেকিচাঁদরা? খুঁজুক। এদিকে খুঁজতে আসবে না।

ভাঙা প্রাসাদের চত্বরে বসে থাকে বাসমোতি। এ জায়গাটা উঁচু। পুবে তাকালে ডালটনগঞ্জ শহর, সামনে কোয়েল। এভাবে বসে থাকতে থাকতেই সকাল হয় ক্রমে। সূর্য উঠতে উঠতে বাসমোতিকে রাঙিয়ে দেয়। আর আরেকটু বেলা হতে কোয়েল পেরিয়ে সার সার লোক যখন উঠে আসতে থাকে পাড় ধরে, তখন বাসমোতিকে না দেখে আর উপায় থাকে না।

সবাই ঘিরে ফেলে ওকে। বাসমোতি কাকে কী বলবে? হাসবে, না কাঁদবে?

মাধো রাতজাগা চোখ টান করে নিশ্বাস ফেলে বলে, কিত্তে তান্ করাইল্ বাসমোতি? কিত্তে ঘুমাইল্? অব্ চল্, ঘর চল্।

ওরা ঘর চলে। না, জিলাধিকর্তার সঙ্গে দেখা হয় নি, মালিকদের সঙ্গেও শত্রুতা বেড়ে গেছে, কিন্তু সদরে তো আসা হল, বাসমোতিকে তো পাওয়া গেল। পলামুর ইতিহাসে এমনটিই বা আগে কবে ঘটেছে?

গো ষ্ঠ ম নি

গোহুমন হল গোখরো সাপ। তা বিশাল ভূঁইয়ার বিধবাকে সবাই গোহুমনি বলে। নাম একটা ওর ছিল, ঝালো। তা কতকাল ধরেই তো ওর নাম ছিল সোনা দাসীর মা। ছেলে আর মেয়ে হলে কে আর কাকে "ঝালো" বলবে তাই বলো? বলাটা ঠিকও নয়।

কেচকি গ্রামের ঝালো ভূঁইন কেন "গোহুমনি" নামে পরিচিত তা জানতে চেয়েছিল লছমন সিং। লছমন সিং ঠিকাদার। ঠিকাদারিতে ওর না কি লাইসেন্ আছে।

একথা অবশ্যই বিশাল ভূঁইয়ার দাদা সাতবান স্বীকার করেনি। সাতবান কেচকির কামিয়া সমাজে একজন মাতব্বর লোক বলে গণ্য হয়. কেননা সে সকলকে নিয়ে দল পাকিয়ে বাগাত ঝামেলা তুলে কামিয়ৌতি ছাড়াবার কথা বলে।

কামিয়ৌতি থেকে খালাস মিলবে, অলীক ঋণবদ্ধ ক্রীতদাসগুলি দাস অবস্থায় আধপেটা খেয়ে মরবে না,—মুক্ত অবস্থায় অনশনের অধিকার পাবে,—সে কথা কামিয়ারা ভাবে না।

ওরা জানে যে পূর্বপুরুষ ঋণ করে থাকে যদি তাহলেও ওরা কামিয়া।

নিজে ঋণ করলে তাহলেও কামিয়া।

পলামুর পাহাড়-জঙ্গল-নদী যতদিনের, কামিয়া-প্রথাও তেমনি পুরনো।

অন্তত তাই ওরা জানত। তবে বোর গ্রামের মাধো সিং খারোয়ার মাঝে মাঝে আসে। সে বলেছে, ওসব মিছে কথা।

—কী মিছে কথা?

—কামিয়ৌতি অত পুরনো নয়।

—কে বলল?

—লেখাপড়া করো, জানতে পারবে।

—তুই তো অনেক পড়েছিস, এ মাধো! তুই বল্‌না? আমরা লেখাপড়া শিখব, বইকেতাব পড়ব, তবে জানব, তাহলে তো এ জন্মে হবে না।

—পলামুতে আগে চেরো জাতি রাজা ছিল। তারা কাউকে কখনো কামিয়া বানায় নি।

—কে বানাল ?

—খারোয়ার জাতিও বিদ্রোহ করে আর ইংরেজের সঙ্গে বহোত হি লড়াই করে।

নীলাম্বর আর পীতাম্বরের নাম তো আমরা জানি। ওরা খারোয়ারই ছিল, তাই নয় ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—আর কারা ছিল ?

—ভৈয়া! চেরো, খারোয়ার, কোল জাতি, ভুসাদ, গঞ্জু, ঘাসি, নাগেসিয়া, পারহাইয়া, এমন অনেক জাতই ছিল। অনেক জাতের মানুষ ছিল।

—এখনো তো আছে।

—তা তো আছেই।

—এখন সব জাতে কামিয়া।

সব পরে হয়েছে।

—কবে ?

—ওই তো মজা ভৈয়া! রাজপুত, পাঠান, সব এল মোগলদের পিট্ঠু হয়ে। মরাঠা এল, ইংরেজ এল ওদের পিট্ঠু হয়ে যারা এল, ওর এ জেলার মানুষদের ঠেঙাল, মারল—তারাই বেইমানির বখশিস পেল যত জাগীর-উগীর।

তাই তো পেল।

—মহাজন, ব্যবসায়ী, পূজারী পুরোহিত লোক, সব জমি-মালিক হতে থাকল।

হাঁ হাঁ, পলামু কিনে নিল ওরা।

—তা ওরা কি হাতে করে জমি চষবে ? যে হাতে লাঙল ধরে চাষ করে, তাদের হাত থেকে জমিমালিকানা যখন চলে গেল, তখন তো এইসব উঁচাজাতের লোকের কামিয়া দরকার হল।

—তাই বলো!

—কামিয়ৌতি আগে ছিল না?

—কেমন করে থাকবে? তুমি যতদিন নিজের···আরো! ধরো না কেন, তুমি জমিমালিক। তুমি কি নিজে চাষ করবে, না লোক রাখবে?

—জরুর নিজে চাষ করব। আরে! জমি তৈরি করব। বীজ ছিটাব, নিড়ান দেব–সব নিজে করব। তখন হাতও চলবে চটপট।

—কিন্তু ব্রাহ্মণ, চাই রাজপুত, এরা?

—বাপ্‌রে! ওদের তো কামিয়া চাই।

—তবে? বুঝেছ তো?

—হাঁ বেটা, খুব বুঝেছি।

—এখন ভাবতে হবে···কি, সোনার ভৈয়া?

—বেটা! তুমি যা বললে, তাতে তো বুঝলাম যে পলামুর মাটিতে কামিয়ৌতি বেশিদিনের নয়। তবে এত জলদি এ প্রথা এত বেড়ে গেল?

—ভৈয়া। ধান-গম কুরথি-মকাই চাষ হতে কয়েক মাস লাগে। উখালার বীজ কত তাড়াতাড়ি ছড়ায় আর মাটিকে ঢেকে ফেলে তা বলো।

—মন্দ জিনিস তাড়াতাড়ি বাড়ে।

সাতবানের নাম সাতবাহন না সত্যবান নামের অপভ্রংশ তা জানা খুবই কঠিন। ছোট ভাই বিশালের মতই তার দেহের কাঠামোটা মস্ত বড়। সাতবানের বৈশিষ্ট্য হল ওর বুক পিঠ, কান, আঙুলের গাঁটে লোমের প্রাচুর্য।

মালিক নিম ও করঞ্জা বীজ থেকে তেল পিষে বের করে। সাতবান এই বিক্রীতব্য পণ্যটি সুযোগ পেলেই মাথা ও গায়ে মেখে নেয়। ওর এমন কাজ করার যুক্তি আছে।

গাছগুলো তো কারোই নয়। পঞ্চায়েতী কুয়া ঘিরে গাছগুলি আছে সরকারের জমিতে। মালিক তার ওপর দখল কায়েম করল কেন?

ঠিক আছে। তর্কের খাতিরে মানা গেল যে মালিকের যে কোনো ব্যাপারে দখল ঘোষণা করার রীতি আছে। এটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

সাতবান হলদে দাঁতে হ-হ-হ শব্দে হেসে বলে, তাহলে আমিও একটা নিয়ম চালাচ্ছি বলতে পারো। মনিবের নিমতেল পেলেই মাখব, তার ক্ষেতের মূলা বেগুন পেলে কাঁচা কাঁচাই খেয়ে নেব।

সাতবানের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল, সে কোনো ব্যাপার নিয়ে বেশিক্ষণ কথা শুনতে পাবে না। ঝটপট কাজের কথায় যেতে চায়।

সাতবানের বউ, ঝাগোর বড় জা অথবা জ্যেঠাইন ছিল অন্যরকম। সে সামান্য ঘটনাকেও সবিস্তারে বলতে ভালোবাসত। সাতবান অত কথা শুনতে চাইত না। ফলে ওদের মধ্যে বেশ বিবাদ হত।

মাধোর কথা শুনতে শুনতে সাতবান হাতের তেলোতে খৈনি ডলে নেয়, মুখে দেয়, এবং বলে, বুঝলাম তো সবই। এখন কী করতে হবে তাই বলো।

—কিসের কী করবে?

—কামিয়া কি আমরা থেকেই যাব?

—কী করবে?

—কানুন করে তো এ নিয়ম উঠে গেছে।

মোরি পারহাইয়া বুড়ি হয়ে গেছে এখন। সে পিঠের কাপড় সরিয়ে বলে, এই দাগ? সাতবান?

—হাঁ হাঁ মোরি, ও কথা জানি।

—যখন জোয়ান ছিলাম, তখন···

—মালিক দেগে দিল লোহা পুড়িয়ে।

—তখন আমি জোয়ান। আর···আমাকে যে বাবু রাখনি করতে চেয়েছিল, সেই সরকারী ডাক্তার বাবু বলেছিল যে কামিয়ৌতি বেআইনী করে দিল সরকার। তাতেই তো আমি...

মোরির প্রৌঢ়া মেয়ে বাসনি বলে, খুব ভালো কাজ করছিলে। আমাকে ফেলে পালাচ্ছিলে বাবুর সঙ্গে।

মোরি বলে, কাহে ন ভাগি? তোহার বাপোয়া হমনিকে রোটি দেতর্ করত্ কা?

—তারপর?

মাধো সহাস্যে বলে। কেন না বহুবার শোনা এ কাহিনী। তবু যদি সে না শোনে কাহিনীটি মোরি বড় দুঃখ পাবে।

বাপ্‌রে! মালিক তো আমাকে ধরে ফেলল। কি রে মোরি? কামিয়া হয়ে ভাগছিস তুই? বাবুর জাত উঁচা, জাত মারছিস। বাবুতো কুর্মী ছিল।

তারপর কী হল?

আমি বহোত্ হি তেজী সে বললাম যে, বাবু সব বলেছে আমাকে। কামিয়ৌতি খতম এখন! তখন মালিক হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেল মাটিতে। আর তখন ওর গরু দাগানো হচ্ছিল। হাসতে হাসতেই আমাকে চেপে ধরে পিঠ দেগে দিল। যা এখন! তোকে ছাপ দিয়ে দিলাম। পালালেই ধরা পড়বি।

—নৈয়া, তুমি কি খুব সুন্দরী ছিলে?

—আরে আরে! এ কত সরমের বাত বলছ। তা, বনের মোর যেমন পেখম খুলে নাচে, তখন কত না সুন্দর দেখায়। আমিও সুন্দরী ছিলাম ছোটবেলা থেকে। তাতেই নাম হল মোরি।

মোরি সকলের দিকে সগর্বে তাকায়। হতে পারে যে ঘটনাটি ষাট-বাষট্টি বছর আগে ঘটেছিল। কিন্তু ঘটেছিল তো! এখন মোরির চেহারা রোগা কাকের মতো, কিন্তু এক সময়ে তো সে সুন্দরী ছিল।

বাসনি নিজে দিদিমা হয়ে গেছে, এতই তার বয়স। কিন্তু মার সঙ্গে তার ঝগড়া বা প্রতি কথায় মতান্তর, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে। এক চালাতেই বসবাস, একই সানকিতে ঘাটো খাওয়া, একই বিড়ি ভাগ করে টানা, তবু এ বিবাদ শেষ হয় না।

বাসনি বলে, মায়ের লাজসরম খুবই কম। এসব কথা বলতে লাজ লাগে না?

সাতবান বোঝে, যে এখনি মোরি ও বাসনি ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু করতে পারে। তাই সে কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরায়।

—মোরি মৌসি যখন জোয়ান ছিল, সেই ষাট-পঁয়ষট সাল আগেই কামিয়ৌতি বন্ধ. কানুন হয়েছিল কি রকম? এ কথা কি সত্যি?

—হাঁ হাঁ, কেন সত্যি হবে না? ইংরেজ সরকার তো তেষট্ বছর আগেই বিহার ঔর ওড়িশায় কামিয়ৌতি বন্ধ্ আইন করেছিল।

—তবে ফের কোন সাত বছর আগে কানুন করল ভারত সরকার? আগে তো কানুন ছিল।

সে কানুনে কাজ হয় নি।

—এ কানুনে বা কি কাজ হচ্ছে?

—সরকারী দপ্তরে অনেক হচ্ছে।

—সে তো মিছা।

—ভৈয়া সাতবান। কামিয়া যদি খালাস চায় তো তাদেরকে এককাট্টা হতে হবে।

—তারপর?

—ছিন্ লো খালাস। সরকার তো বলছে যে বন্ধুয়া লোক খালাস হবে, সকলের অনেক মদত মিলবে। পলামুতে এমন খুবই কম হয়েছে যদিও।

—তুমি বুঝিয়ে দাও তো আমাকে। সব বেটা কামিয়াকে বুঝাব আমি।

মোরি মাধোকে বলে, হাঁ হাঁ। সাতবানকে বুঝিয়ে দাও সব।

এমন এক দায়িত্ব পাবার পর থেকে সাতবানকে সবাই বেশ মাতব্বর বলে ভাবতে শুরু করেছে। মোরি এ কথাও বলেছে, তুই ছাড়া তো আমাদের নেতা বনবার মতো মানুষও নেই। তা তুই বনে যা হামানিকে লীডর। খাই, চাই না-খাই, কামিয়া নেই, আমি এটা জেনে মরতে চাই।

—মৌসি, তুই এখন মরবি না।

—আর কতদিন বাঁচব?

—মৌসি, তুই মরলে আমি চবুতরা বানিয়ে দেব, ঔর মিটিন্ ভি করব।

—হাঁ হাঁ, চবুতরা বানাতে সিমেন্ লাগে, ইট লাগে, কত কি লাগে।

—মৌসি! ফরেস আর পি. ডবলু. ডি. যত ফলক লাগিয়ে রেখেছে বনে পাহাড়ে, পথের ধারে, ধড়াধড় খুলে আনব আর গেঁথে দেব।

বাসনি বলে, মা যত কৌটা জমিয়েছে, তাতেই চবুতরা হয়ে যাবে।

টিনের ছোট ছোট কৌটোর ওপর মোরির দুরন্ত আকর্ষণ। কী সুবিধের জিনিস ও গুলো! জল খাও, চা খাও, চা করো, জল ধরে রাখো, একটু ছাতু বা লবণ পেলে রাখো। এর কাছে ওর কাছে, মালিকদের ঘরে চেয়ে চেয়ে মোরি অনেক কৌটো জমিয়ে ফেলেছে। বাসনির নাতি-নাতনি তাতে হাত দিলেও বুড়ি ধুন্ধুমার কাণ্ড করে। যে মাচাঙে মোরি ঘুমোয়, তারই একপাশে কৌটোর পাহাড়। ঘুমোবার কালেও হাত দিয়ে দেখে, সবগুলো আছে কি না।

সাতবানকে সবাই মানে, তার আরেক কারণ, ও বিশালের দাদা।

বিশাল মরে গেছে বছর তিনেক। তা সবাই জানে। সাতবানের বউও মারা গেছে কবে। সাতবানের ঘর করত, সঙ্গে থাকত, তাতে অবাক হত না কেউ।

এটা খুব লক্ষ্য করার মতো বিষয়, যে সাতবান ও ঝালো কখনো তেমন কোনো আগ্রহ দেখায় নি। আর বিশালের জীবিত কালে দুই ভাইয়ে তেমন ভাব ছিল না। কিন্তু একদিন যখন খবর এল, যে বিশাল মরে গেছে—সাতবান কয়েকদিন পর থেকে বিশালের ছেলে মেয়ের খবর নিতে থাকল।

ঝালো, অথবা সোনার মা, অথবা গোহুমনি, এখনো এমন ডাঁটো আর শক্তসমর্থ, যে ওর সঙ্গে ওর ভাসুরের কোনো সম্পর্কই নেই, তা বিশ্বাস করাই কঠিন।

বিশালের ঘর মালিকের মামলাধীন জমিটির কিনারে। বস্তুত বিশালের ঘর দিয়েই কেচকির লাঠা টোলির শুরু।

পলামুর অন্যান্য জায়গার মতো, অন্যান্য সমৃদ্ধ গ্রামের মতো কেচকি হল পথের ধারে। চুনকাম করা সারবার মাটির শক্তপোক্ত বাড়ি, বাহির-দেওয়ালে গন্ধমাদন বহনরত মহাবীর, বুক চিরে রাম-সীতা দেখানো মহাবীর। রাম সীতার পায়ের কাছে জোড়হাতে মহাবীর, দেবতা রূপে সিংহাসনে বসা মহাবীর, সমুদ্র লঙ্ঘনরত উড্ডীয়মান মহাবীর, এমন অনেক চিত্র।

বাড়িগুলির মাঝ দিয়ে সরু রাস্তা, তাতে ছাগলের নাদি, মোষের গোময়। গোবর ঘুঁটে খড় বিচালির গন্ধ বাতাসে। বাড়ির অন্যদিকে মোটামোটা ঘুঁটের চাবড়া।

উঠোনগুলিতে ধান ও গম শুকায়, ইঁদারায় ক্যাঁচ কঁ্যাচ শব্দে জল তোলা হতে থাকে, ঘরগুলির জানালা অনেক উঁচুতে, যথেষ্ট ছোট। ঘরের দরজা, বাড়িতে ঢোকার দরজা খুব পুরু, পোক্ত, আলকাতরা মাখানো। কয়েকটি বাড়িতে শোবার ঘরে দেয়ালে বন্দুক আছে।

এমনি গ্রাম পলামুতে যথেষ্ট দেখা যায়। শ'তিনেক বছর ধরে পলামুতে রাজপুত ও ব্রাহ্মণ ও ভূমিহার জমিমালিকরা এক ভাবে বসবাস করছে। সাধারণত যেমন দেখা যায়, এখানেও মালিকরা কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে জমিজমা দিয়ে বসত করিয়েছে। দেবতা ও ভক্তদের মধ্যে যেহেতু সরাসরি যোগাযোগ রাখা অসম্ভব, সেহেতু ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হয়ে থাকে।

কেচকি গ্রামের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের আনা আবশ্যিক ছিল। মালিকরা সবাই রাজপুত। কেচকিতে সেদিনও এরা ঘোড়া রাখত। এখন সাইকেল রাখে।

এই মকাই গম-পানচাক্কি মহাবীরের ছবি-ঘুঁটের স্তূপ যেমন কেচকির এক রূপ, তেমনি তার আরেক চেহারাও আছে।

কেচকির মতো অন্যান্য গ্রামের এমন সব ঘর থেকেই এখন ঠিকাদারের অধিন ছোট ঠিকাদার, কখনো স্বাস্থ্যসেবক, কোনো প্রাথমিক শিক্ষক বেরোচ্ছে।

মেয়েদের পোশাকে নাইলন ও ছেলেদের ক্ষেত্রে রঙীন চশমা, প্রচণ্ড কেশসজ্জা, সিনথেটিক সুতোর শার্ট প্যান্ট ও স্কুটারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ব্যাটারিচালিত ক্যাসেটরেকর্ডার, ক্যামেরা, এখন প্রচুর।

এভাবে টুকটাক করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বর্তমান ভারত ঢুকছে পলামুর মানচিত্রের মধ্যযুগে। রাজনীতিক ব্যাপারটা মস্তানরা নিয়ন্ত্রণ করছে।

কেচকির ব্যাপারেও কিছু কিছু এমন ঘটনা ঘটেছে। মালিকদের ঘরে কেরোসিন স্টোভ দেখা যাচ্ছে। স্কুলে মালিকদের ছেলেরা থোড়াবহোত বেশি যাচ্ছে জবরদস্ত ঠিকাদার বা মস্তান বা ব্যবসায়ী কেচকি এখনো তৈরি করতে পারে নি। তবে উকিল একজন হবে। সে পাটনায় আইন পড়ছে।

মালিকদের দুটি ছেলে বাড়ির তহবিল ভেঙে চিত্রতারকা হবার দুরাশায় বম্বে ঘুরে এসেছে। যদিও পুলিস তাদের ফিরিয়ে এনেছে, তবু তারা সাফল্যগর্বে গর্বিত। কেন না ফোটোস্টুডিওর সহায়তায় তারা চিত্রতারকাদের ছবির পাশে নিজেদের চেহারা বসিয়ে বেশ জমকালো কিছু ছবি নিয়ে ফিরেছে।

কেচকির দলীপ সিং ও রাজবংশ কেশরী সিং-এর পাশে অমিতাভ বচ্চন ও রতি অগ্নিহোত্রীর ছবি এখন ওদের বাড়িতে ঝোলে দেয়ালে। পাশেই ক্যালেণ্ডার কেটে বাঁধানো মুলগাঁওকর অঙ্কিত রঘুপতিরাঘব ও গণেশ দেবতার ছবি।

দলীপ ও রাজবংশের বাবারা খুব গর্বিত। তারা থানা দারোগা, ব্লকবাবু, জঙ্গলবাবু, এমন সব মহান লোকদের ছবিগুলি সগর্বে

দেখায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ছেলে। অমিতাভ বচ্চনের বহোত ভারি দোস্ত।

দারোগা বলে, হতেই হবে। আমগাছে ভালো আমই ফলে। নিমফল তো হয় না।

এটা কেচকির ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এটাও ঘটনা, যে কেচকির রাজপুতদের মধ্যে দ:হজের কারণে বউকে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারও ঘটেছে।

এখানে নয়, দিল্লীতে। গ্রামের সরপঞ্চ সমুন্দর সিংয়ের ইনজিনিয়ার জামাই দিল্লীতে এই কাজটি করেছে। পুলিশ কেস করেছে বলে সমুন্দর বড় ক্ষুন্ন। মেয়ে তো ফিরবে না আর। কেস করে ঘরের কেচ্ছা বাজারে ছড়িয়ে কী লাভ হবে?

আফশোস, বড়ই আফশোস এসব। আগে এ সব নিয়ে সোরগোল হত না। কেচকির জোতদার হিসেবে সমুন্দর সিং লাখ দুই খরচ করেছিল। সে তো শুধু জোতদার নয়, সরপঞ্চও বটে।

সব কিছুর পরেও বলতে হবে যে কেচচির রাজপুত মালিকরা রাজপুত হয়েও তেমন সুবিধে করতে পারছে না পলামুতে। পারা উচিত ছিল, কেননা পলামুর "চাহে কা‚রেস চাহে জন্‌তা" দুটো রাজনীতিতেই রাজপুত জমিদাররা প্রচণ্ড ক্ষমতাধারী।

কেচকির রাজপুতরা সবশুদ্ধ একত্রিশটি পরিবার। এদের যথোপযুক্ত রমরমা হচ্ছে না, তার কারণ নিজেদের মধ্যে ঐক্যের অভাব।

বহুকাল ধরে জমিজমা নিয়ে এরা এ-ওর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। এ লড়াই কখনো দেওয়ানী, কখনো ফৌজদারী। এরা পারতপক্ষে ডালটনগঞ্জ যায় না। গেলে মামলা করতে যায় এবং আরো নতুন কেস ঠুকে দিয়ে আসে। টাউনে যায়, ভকিলের ঘরে নিজ নিজ কেসের গাড়িগাড়ি কাগজ আছে, এ কথা এরা সগৌরবে বলে থাকে।

এই সব মামলার কারণ হচ্ছে সাড়ে বাইশ একর জমি—যার পাঁচ একর টাঁড় ও বানঝারা এবং বাকিটি সরস। জমিটির সাড়ে

সত্তেরো একরই হল সরস। ওখানে ভূপ্রকৃতি এমনই যে এই জমিটির আকার যেন গামলার গলদেশের মতো।

যেটুকু বৃষ্টি পড়ে, তার জল গড়িয়ে নামে। এ অঞ্চলে নাকি নয়া জরিপ হবে, বহু জমি চলে যাবে বনবিভাগের দখলে। সেখানে সমাজভিত্তিক বন সৃজন হবে। সে জন্যে খাল কাটা হবে। সিচাই খালের সুবিধা পেলে জমিটি আরো উর্বর হবে।

এই বিতর্কিত ও মামলাধীন জমির কারণে কেচকির মালিকরা বড় পিছিয়ে পড়ছে।

এটা পলামুর বৈশিষ্ট্য যে উচ্চবর্ণের লোকরা এককাট্টা হয়ে বসবাস করে। অন্যদের যতটা সম্ভব দূরে ঠেলে রাখে। ফলে লাঠা একটি টোলি, যা কেচকির মধ্যে পড়ছে।

লাঠা দূরে। সেখানে ভূঁইয়া, দুসাদ তিনঘর রবিদাস আছে। পারাহাইয়ারা একসঙ্গে সাত ঘর। নাগেসিয়ারা সব সময়ে পাহাড়ের ঢালে ঘর বাঁধে। তিন ঘর নাগেসিয়া আছে ঢালে।

এই লাঠা টোলির শেষ যেখানে, বিতর্কিত জমির শুরু সেখানে। এরই প্রান্তে বিশালের ঘর। বিশালের বিধবা গোহুমনি সেখানে সোনা ও দানীকে নিয়ে সপাটে সতেজে বাস করে। "গোহুমুনি" নামটি সে বিশেষ একটি ঘটনার পর অর্জন করেছে।

সে ঘটনাটি কেচকির জগতে এমনই বড় ও গুরুত্বপূর্ণ, যে গোহুমনিকে আর কেউ চট করে ঘাঁটাতে যায় না।

গোহুমনি মানে মাদী গোখরো। কে ওই মেয়ের গায়ে হাত দেবে? ও কামড়ে দেবে। ওকে ঘাঁটানো আর সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকানো একই কথা।

অনেকেই মনে করে, যে গোহুমুনি ওরকম খরখরে মেয়ে বলেই সাতবান ওকে ঘাঁটায় না।

এমন যে কেচকি গ্রাম, সেখানেই লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদার এসে হাজির হয় একদিন। সরপঞ্চের কাছে তার আবেদন।

সরপঞ্চ খুব খুশি হয়। লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদার যে আসবে, সে কথা

তার ভকিল বলেছে। এ কথাও বলেছে যে, ওহি লক্ষ্মণ সিং থেকে কেচকিতে একটা বড় কাজ হবে। রাজপুত মালিকদের মধ্যে একতা আসবে।

—কৈসে?

—আরে? এ কথা বুঝতে হলে তো আমাকে অনেক গোপন কথা ফাঁস করতে হয়।

—বলুন না।

—ভালো কথা! মেয়ের ব্যাপারে কেস কেমন চলছে তা কিছু জানেন?

—না। জানতেও চাই না। আমার মেয়ে তো আর ফিরবে না। পরের ছেলেকে জেলে পাঠালে তো তাকে ফিরে পাব না।

—মেয়ের ব্যাপারে জামাইকে মাপ করতে পারছেন। জমির ব্যাপারে জ্ঞাতি-বন্ধুকে ক্ষমা করতে পারছেন না? ও জমির ব্যাপারে কোনো একজন জিতবে না।

—ভকিল সাব? আপনি কায়স্থ লোক, রাজপুতের গোঁ বুঝবেন না। আমরা বহোতহি লড়াকু জাতি। ইতিহাসে পড়ে নেবেন। পলামুতে আমরা আদালতে লড়ে যাই, কখনো লড়াই ছাড়ি না। যে রাজপুত পরিবার জমিজমা রাখে, কিন্তু মামলা করে না, তাকে আমরা কাপুরুষ বলি।

— আপনাদের হিসাবে আলাদা।

—কি যেন বলবেন বলছিলেন?

—দেখুন, এখন আপনাকে বলছি, কিন্তু আপনার মাথায় কি ঢুকবে কিছু?

—বলুন না।

—বনবিভাগে আমার আত্মীয়স্বজন সব ঠিকাদারি কাজে আছেন। ভগবানের কৃপায় তাঁরা রাঁচি, টাটা, ডালটনগঞ্জে সবাই দর্শনধারী বাড়ি বানিয়েছেন, ট্রাকের কারবারও আছে।

—সে তো জানি।

—মনোহর লালের নাম জানেন ?

—খুব জানি।

—উনি তো আমার বোনের নন্দাই, ওঁর ঠিকাদার মহলে নামী লোক। ওঁরা রাখেন বনের খবর।

—কী খবর ?

—বহোত দিনে সরকার বের করেছে খবর যে আপনাদের ওদিকে অনেক জমি বনবিভাগ নিয়ে নেবে। আর জমি সিচাই করে ওখানে ফরেস নার্সারি প্লান্টেশান করবে। ওই জমিটাও তাতে যাবে।

—ক্ষতিপূরণ কে পাবে ?

—দেখুন, এসব হতে হতে দুই-তিন বছর লাগবে। আপনারা সবাই কেন দখলদারি দাবী করছেন ? মিটমাট করে নিন। তাহলে ক্ষতিপূরণও এসে যায়। সিচাইও আসে।

—ভকিল সাব ! প্লান্টেশন যদি হল, তবে সিচাই দিয়ে আমাদের লাভ ?

—সিচাই যখন হবে তখন তো করাবে মনোহর লাল, আর সামনে রাখবে লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদারকে। তখন আপনার জমি তো অনেক জল পাবে।

—অন্যরা মানবে ?

—বুঝাতে থাকুন। লক্ষ্মণ সিং এখন ওদিকে যাবে। সরকারী লৌহ আকর খনিখাদানে লেবার চালান দেবে। লেবার তো আছে আপনার ওখানে।

—লাঠাতে কামিয়া বেশি। যারা কামিয়া নয় তারা যাবে।

—আছে তেমন ?

—হাঁ হাঁ, অনেক।

সমুন্দর সিং অন্যমনস্কভাবে বলে, কামিয়াদের মধ্যে, আমার কথা বলতে পারি···আমার কামিয়াদের মধ্যে যদি যেতে চায় কেউ, তো যাবে।

—এটা তো আজীব বাত হল।

—আপনি বুঝবেন না। দিনকাল পালটে যাচ্ছে এখন···এ বছর তো জল নেই, চাষও নেই। কাজও করাতে পারছি না, তাতে লুকমা দিতে বহোত খরচ তের জনকে!

—আপনার তের জন ?

—হ্যাঁ···তো কাজের ফিকিরে ওরা এদিক-ওদিক যাচ্ছে। সাতবান বলল, মালিক! সরকার তো ব্লক থেকে রিলিফ থোড়াবহোত দিচ্ছে। আপনি আনান না কিছু। আমরা খেয়ে বাঁচি। কাঠ কাটব, কাঠ বেচব, এতে তো চলছে না আর। কেমন খচড়াই তা দেখুন!

—কী, রিলিফ আপনি তুলে নিয়েছেন ?

—কবে!

—আপনারা তো ওদের পয়জারে শায়েস্তা রাখেন বলে শুনতে পাই।

—ভকিল সাব! যা সব জায়গায় চলে, যাতে মালিকের ইজ্জত থাকে, তা তো কেচকিতে চলবে না। আমাদের মধ্যেই এ-সে ওদেরকে তাতাছে। বাবার আমলে, আমার আমলেও আগে, কামিয়ারা কখনো কথা বলতে সাহস পায়নি। এখন তো একতা নেই। একজন নাকাল হলে আরেকজন হাসবে। আর আমি যদি সাতবানকে জুতা পিটাই, তো আমার জাতভাই ওকে বুঝাবে যে টাউনে যা, কেস করে দিয়ে আয়।

—হাঁ হাঁ, ও তো জানি।

—কুশলপ্রসাদ জী তো আপনার ভাগ্নে।

—হ্যাঁ।

—তা উনি সবসময়ে বন্ধুয়াদের হয়ে মালিকের নামে কেস ঠোকেন কেন ?

—আরে সমুন্দরজী! ছেলে খুব শানদার, ওর মনে থোড়াবহোত আইডিয়ালিজমও আছে। তাই গরিবের হয়ে লড়ছে।

—কী আছে বললেন ?

—আদর্শ, আদর্শ।

—না না, এ ঠিক নয়। আপনি ওর আত্মীয়, আপনি তো ওকে বুঝাবেন যে উকিল হলে আদর্শ রাখা ঠিক নয়। তাতে মক্কেল ভেগে যাবে।

—করছে করুক না। বয়স কম, আদর্শ আছে অনেক। তারপর, আপনাকে বুঝানো খুবই মুশকিল! এমন কেস করলে ইজ্জত খুব বাড়ে। ওহি যে মৌথাবনীর কৌয়ার শাহী সিং দুটো কামিয়াকে ধরে জ্যান্ত জ্বালাচ্ছিল, সে কেস তো ওই করছে।

—ঠিক কাজ করছে না। ভকিলের কাজ, রাজার কাজ। এই তো আপনি কতবড় বাড়ি করেছেন, গাড়ি কিনেছেন, ছেলেদের বোর্ডিঙে রেখে পড়াচ্ছেন! কুশল যা করছে···ভকিল সাব! কেচকিতে রাজপুত মালিকদের একতা না থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সবাই ছোট থেকে বড়, সবাই পলামু জিলা ভূম্যধিকারী কল্যাণ সংঘের সদস্য আছি, চাঁদাও দিই।

—খুব ভারি সংস্থা।

—খুব। শাহী সিংয়ের নামে কেসের ব্যাপারে আমরা খুব চটে গেছি, আর কুশলপ্রসাদকে আমরা জিলা থেকে নিশ্চয় হটাব। ওকে তো কেস আমরা দেব না কখনো।

—ইজ্জতদার কেস করতে করতে ও নাম পেয়ে যাবে, দেখবেন।

—যা বুঝেন! আপনারা · কায়স্থরা এত লেখাপড়া করছেন বলে বুদ্ধি ঠিক থাকছে না।

—সমুন্দরজী! জমি-ভৈঁসা আর কামিয়া থেকে তো সকলের ফয়দা উঠবে না।

—এ কথাও ঠিক।

—লক্ষ্মণ সিংকে নিয়ে যান।

এমনি করেই লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদার কেচকিতে ঢোকে। তার দেহটি পাকানো, নাগরার শুড় পাকানো, গোঁফের ডগা পাকানো, দেখেই মোরি বলল, এ লোকটা কে? দেখে মনে হয় খরাতাপে সিঁটকানো ভিণ্ডি একটা।

ঢেঁড়স অপুষ্ট ও শীর্ণ হলে যেমন ডগা পাকানো হয়, তেমন দেখতে—মোরির মন্তব্য বেশ লাগসই হয়, সবাই হাসে।

লক্ষ্মণ সিং থাকল সমুন্দরের বাড়িতে। তারপর সমুন্দর, সরপঞ্চ হিসেবে লাঠা টোলিতে গেল বিকেলে। সরপঞ্চ হিসেবে সে সকলকে ডাকতে পারত। কিন্তু কেচকির বাতাস বর্তমানে খুব ঘোরালো।

নওনেহাল সিং, ভানুপ্রতাপ সিং, সমুন্দর সিং, সবাই জমিটির ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিপক্ষ।

কেচকিতে সমুন্দরকে সরপঞ্চ পদ থেকে সরাবার ব্যাপারে ওরা দুজন এক পক্ষ। নওনেহাল সরপঞ্চ হতে চায়। ভানুপ্রতাপ এখন মুখিয়া আছে, তখনো মুখিয়া থাকবে।

ভানুপ্রতাপও একদিন সরপঞ্চ হতে চাইবে নিশ্চয়। তখন নওনেহালের বিপক্ষে অন্যদের সঙ্গে জোট করবে।

ভানুপ্রতাপ অধৈর্য নয়, বোকাও নয়। সে জানে যে এ অঞ্চলে উন্নয়ন পরিকল্পনা আসতে দু চার বছর দেরি আছে। যখন আসবে, সেই সময়েই টাকা আসবে। তখন সরপঞ্চ হওয়া লাভজনক। এখন চুপচাপ থেকে যাওয়া ভালো।

সমুন্দর গ্রামে সকলকে ডাকলে নওনেহাল ও ভানুপ্রতাপ বলে বসতে পারে, যে সরপঞ্চ সকলকে রিলিফ দেবে বলে ডাকছে।

সত্যি বলতে কি মাত্রই একুশ হাজার চারশো ছিয়াত্তর টাকা তুলেছিল সমুন্দর।

সবটাই ব্লকে বসে ম্যানেজ হয়। ভানুপ্রতাপ পাঁচহাজার পেয়েছিল। অথচ তারপর থেকে সে এমন আলগা আলগা ভাব দেখাচ্ছে, যে সমুন্দর খানিক চিন্তিত।

ভানুপ্রতাপ একই সঙ্গে দু'ভাবে সমুন্দরকে নাকাল করতে পারে। কামিয়া ও অন্যদের বলল, সরপঞ্চ রিলিফের টাকায় জামাইকে জমি কিনে দিয়েছে আর তোমাদের উপোসে শুকাচ্ছে।

তাতে খানিক হাওয়া দূষিত হল।

তারপর সবাই মিলে সরপঞ্চের নামে দুর্নীতির অভিযোগ আনল, কেস করল।

দরকার কি ঝামেলায় গিয়ে। সরপঞ্চ হিসেবে লাঠা টৌলিতে গেলে ওরাও ধন্য হবে। হায়! গ্রামে কেন একতা নেই? ওই জমি কেন সমুন্দরের নয়? সবগুলো ব্যাপার যদি ভালোয় ভালোয় ভালোর দিকে যেত, তাহলে সমুন্দর কি কামিয়াদের এত বাড়তে দিত? যাক্, মহাবীরজী যা ইচ্ছা করবেন তাই হবে।

লাঠা টৌলিতে যাবার সময়ে সমুন্দর মাথায় টুপি পরল, হাতে লাঠি নিল। পুরনো আদবকায়দা সবচেয়ে ভালো। সমুন্দর পুরনো পোশাক ছাড়েনি। ধুতি, কুর্তা, পায়ে মুচির তৈরি মোটা নাগরা। এক জোড়া বালাও বহোত দিন পরে পরল।

নওনেহালরা বোঝে না। জমিজমা, ক্ষেতিবাড়ি করবে—তো প্যান্ট পরবে, সার্ট পরবে, সাইকেল চেপে ঘুরবে, এটা কি বেখাপ্পা লাগে না? আর কেমন সব কথা ছোকরাদের!

—বিজলি আনুন, বিজলি।

—ভৈয়া, কেন?

—বিজলি থেকে সিচাই চলবে।

—সিচাই!

—দেখুন সরপঞ্চজী, সব কথার জবাবে অমন বোকার মতন জবাব দেবেন না। বোকা তো আপনি নন।

—ভৈয়া……

—বিজলি তো উন্নয়নের জন্যেই চাই। বিজলি এলে স্যালো চলবে, ডি. টি. বসবে। সিচাই আসবে এলাকায়। বিজলি তো উন্নয়নের প্রধান উপায়।

—ভৈয়া, তোমরা যা বলছ তা মেনেও নিলাম। কিন্তু তবুও আমি বলব, ঔর জোর দিয়েই বলব যে আমার দেশে পুরানা রীতি-প্রথায় চাষবাস ভালোই চলে। তাতে অনেক বেশি লোক কাজ পায়।

নওনেহাল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ভারতবর্ষ এখন কত কিছু করছে, আর্যভট্ আকাশে যাচ্ছে. কপিলদেবরা কত বড় সম্মান আনল···আপনি দেখছি অঞ্চলকে সেই কেরোসিনের বাতি আর ভৈঁসা গাড়ির যুগেই রেখে দিতে চান।

ভানুপ্রতাপ এসব কথায় যোগ দেয় না কখনো। ও বোঝেনা যে সরপঞ্চ ও নওনেহাল বেকার উদ্যম খরচ করে কেন কথা বলে।

বিজলি একটা বাস্তবতা। বিজলি আসছে। পথে যখন আছে, তখন কেচকিতেও আসছে। যা আজ না হোক, আগামী কাল হবেই হবে, তা নিয়ে বকবক করে উদ্যম খরচ করা বড়ই বোকামি।

সমুন্দর ও লক্ষ্মণ লাঠা টৌলির দিকে চলে। ওই তো সেই বিতর্কিত ভূমিখণ্ড, যাকে নিয়ে কেচকির রাজপুত মালিকরা বিভক্ত হয়ে গেছে, মামলা করছে, নিজেদের সময় ও আয়ুক্ষয় করছে।

তবে এ কথা বলতেই হবে যে গাই-ছাগল-মোষ চরাবার পক্ষে এটি খুব ভালো জায়গা। মাঝে মাঝে বামন বামন পলাশ গাছও আছে। কেচকির মালিকদের চরোয়াহা কামিয়ারা গাইছাগল চরাবার পক্ষে একটা ভালো জায়গা পেয়ে গেছে। অন্যান্য গ্রাম থেকে চরোয়াহারা আসত এখানে। এ নিয়ে অনেক ঝগড়াবিবাদ ছিল। তারপর এই এলাকা জুড়ে নিয়ম হয়ে গেছে যে, এইখানে গাইছাগল চরাতে পারে, সরপঞ্চকে কিছু পয়সা দিয়ে।

বর্ষার পর শরতে এই এলাকার বাতাসে হিম এসে যায়। তখন এই জমিতে জন্মায় বড় বড় কাশফুলের গাছ। কাশ, জিগ্‌তা, ঠারি, এমন সব ঘাসে ও ঝোপঝাড়ে এ জায়গাটি ভরে ওঠে। কাশের ডাঁটি দিয়ে তো ঘরের বেড়া, গোহালের আগড় করে লাঠার লোকেরা। সেজন্যে কাশের ঝোপগুলিকে যথেচ্ছ বড় ও বুড়ো হতে দেয়া হয়। ডাঁটা মোটা হলে তবেই তো আগড় ভালো হবে।

খুব উঁচু হয় ঝোপগুলো। আড়ালে মানুষ লুকাতে পারে, বাঘও। সমুন্দর নিজে যখন বালক ছিল, তখন ওখানকার কাশঝোপ থেকে বাঘ এসে লাঠা টৌলির লোকদের ছাগল-গরু নিয়ে যেত।

ওই মাঠে ঘাসের ও কাশঝোপের আড়ালে বাঘ ঘুমাচ্ছিল। নওনেহালের ঠাকুর্দা শিকার করেছিল। সে খুব শিকারী ছিল, ঘোড়া চেপে জমিজমা দেখত, আর অনেক দেশ বেড়াত।

সমুন্দররা অত জানে না যে কোথায় বিকানির, কোথায় ভরতপুর, কোথা থেকে ওরা এসেছিল।

সে সবই জানত।

খুব উঁচু কাশের ঝোপ, মানুষ লুকাতে পারে। সমুন্দর মৃত বিশাল ভূঁইয়ার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।

—এ গোহুমনি! এ সোনাকে মৈয়া!

--কা, মালিক?

লাঠা টৌলিতে বিকেলের পড়ন্ত আলোতে অত্যন্ত ছোট একটি ঘরের সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি ধান ঝাড়ছে কুলোয়, সে হাতের কাজ থামায় না।

— সাতবান কোথায়?

—আমি জানি না। এ সোনা, তোর জ্যেঠা কোথার রে? দেখেছিস না কি তাকে?

বছব হুয়েকেব একটি ছেলে তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী একটি ছাগলকে ঘরে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে, জ্যেঠা দোকানে গেল। ডেকে আনব?

সমুন্দর বলে, বলে দিস্ ঘরে যেতে।

—কেন মালিক?

—এহি লছমন বাবু ঠিকেদার। কাজের কথা বলবে।

—কী কাজ?

লক্ষ্মণ গোহুমনিকে দু চোখে পান করছিল। কী কোমর! ময়লা, মোটা কাপড়ে ও জামায় ঢাকা শরীরের ওঠা-নামা বা কি চোখ জুড়ানো। মেয়েটি তার দিকেই তাকায়। চোখের হিংস্রতা খুব পরিষ্কার।

—খনিখাদানে কাজ।

—সোনার জ্যেঠা কী করবে, আমি বা কী করব? আমরা মালিকের কামিয়া।

সমুন্দর যেন এখানে দাঁড়াতে চায় না। সে বলে, এখন তো আমার কাছে কাজও নেই রে! দুই-তিন মাস তোরা খুব পারবি বাইরে যেতে।

—তাকে বলো!

সমুন্দর অন্যমনস্ক ভাবে পকেট থেকে সুপুরি বের করে গালে দেয় ও বলে, খুব আকাল!

গোহুমনি জবাব দেয় না। কাঁচা দু সের ধান তার প্রাপ্য লুকমা হিসেবে। সে ধান এমন কদর্য যে কুলোয় ঝেড়ে, তা বাদে কুটে তবে রাঁধতে হয়। সাতবান নিজের ভাগটিও নিয়ে আসছে তাই যা রক্ষে। বনের কাঠ বেচে তেল-নুন কেনো। দোকানী কাঠ রেখে নেয়, সওদা দেয়।

সাতবানের ঘর অন্য প্রান্তে। সাতবান উঠোনে খাটিয়া পেতে দেয়, "মালিক পরোয়ার" বলে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন অনেক কিছুই করে, যাতে সমুন্দর মনে মনে খুশি হয়।

কথা শুনে সে বলে, এ তো খুব ভালো কথা মালিক! আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি সকলকে বুঝিয়ে বলব এখন। আপনি ঘরে চলে যান।

—এঁকে আমার ঘরে পৌছে দিবি।

—নিশ্চয় দেব হুজুর।

—সকলকেই বলিস।

—হাঁ হাঁ, কামিয়া ঔর ন-কামিয়া।

—নাগোসিয়াদেরও বলিস।

—তা তো বলব হুজুর। কিন্তু অন্য মালিকরা যদি রেগে যান?

—তখন কামিয়ারা যার যার মালিকের কাছে হাত জোড়বে, বলবে যে, মালিক! এখন তো কাজ নেই। সবাই লুকমা দিতে পারছেন না! আমরা এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছি ঔর জঙ্গল ভরোসায় দিন

চালাচ্ছি। কৃপা করে অনুমতি করুন, দুই-তিন মাস কাজ করে আসি। ভালো করে বলবি কাজ হবে।

—তাই বলব মালিক।

—তোরাও টাউনের হাওয়া খাচ্ছিস, কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিস। তোদেরকে মাধো সিং খারোয়ার বুঝাচ্ছে, যে ভারত সরকার তোদের মুক্ত করে দিয়েছে। আরে বাবা! আমার কামিয়াদের তো আমি এখনি খালাস করে দিতে পারি। দেনেওয়ালা আমি, লেনেওয়ালা কোথায়।

হ্যাঁ হুজুর।

—যত যত করজ জমে আছে, সব দিয়ে দিলেই তোরা খালাস হয়ে যাবি।

—কোথায় পাব মালিক ?

—আরে! এ কথাটা বুঝলি না, যে ভারত সরকার তোদের খাওয়ায় না। মালিকরা খাওয়ায়। কামিয়ৌতি বন্ধ করবে, তোদের মুক্ত করবে, এসব কথা শুনতে খুব ভালো। কাজের বেলা ?

সমুন্দর সিং নাগরা মশমশিয়ে চলে যায়। সাতবান বলে, বলুন হুজুর। আপনার কী সেবা আমরা গরিবরা সাধন করতে পারি ?

—কাজের খবর ছিল।

—কেমন কাজ ?

—ম্যাগনেটাইট খাদানে।

—সরকারী, চাই রুংটা ?

—দুরকমই।

—আমরা কত পাব ? সরকারী রেট ?

—ভৈয়া! মিছে বলব না। সরকারের রেট তো পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা। আমি তোমাদের সাফ কথা বলব। ওই রেট পায় পাক্কা মজুর।

—আপনি কাচ্চা মজুর খুঁজছেন ?

—হ্যাঁ। আড়াই-তিন টাকা দেব রোজ।

—তাতে তো চাল হবে না এক সের।

—ভেবে দেখো।

মোরি খনখন করে বলে, ভাবলাম, দেখলাম। এখন তো জঙ্গলের কাঠ কেটে আমাদের চারটাকা হচ্ছে, ঔর তাতেও চলছে না।

সাতবান বলে, আমরা জানিনা যে এখানে কী হবে! তবে এখন তো লেবার-ঠিকেদার গ্রামে আসে। চাই ইটভাটা, চাই কয়লাখাদান, চাই অন্য কোনো কাজে লেবার খুঁজে। গরিবের নসিব। ঠিকেদাররা সরকারী রেটই উঠায়, ঔর গরিবকে দুই-চার টাকা দেয়।

—সে অন্যরা করতে পারে...

—আপনি তা করবেন না···

—ধরো ওটা খানিক বাড়াতে পারি।

—বলব সকলকে।

—আমি তো তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চাই। কেননা পরে এই এলাকাতেও কাজ হবে। তখন এলাকার লোকই নিতে চাই। এই সব কাজের জন্যে সম্পর্ক করা দরকার।

—হাঁ বাবু।

—আমি তো লাইসেন্ নিয়ে কারবার করি.

হাঁ বাবু।

—তাহলে সকলকে বোলো।

—বলব, চলুন। পৌঁছে দিই।

লক্ষ্মণকে পৌঁছে দিয়ে এসে সাতবান বলে, বহোত হি ঠাঠাবাজ, ধান্ধাবাজ। বলে কী! বরাবর লাইসেন্ নিয়ে কারবার করছে, ঔর টোরি ইলাকায় জঙ্গলের আমলকি, হরতকি, শালপাতা, ইলাকা-ইলাকায় ডিম ওর মুরগি, হাসপাতালে খাবার, সব ও লাইসেন্ নিয়ে চালান দেয়।

মোরি বলে, এখন চালান দিচ্ছে মানুষ।

—এ কাজে সবচেয়ে বেশি নাফা। মাথা পিছু কোম্পানি দিল ধরো পঁচিশ টাকা। এ তোমাকে দিল তিন টাকা। কোম্পানি বাবু, ইউনিয়ন, সবকে খাইয়ে তখন এর যদি পাঁচ টাকাও থাকে, আর লেবার থাকে একশো! তাহলে তো এ রোজ পাঁচশো টাকা পাচ্ছে। আরে, এর লেবার বিশটা থাকলেও রোজ একশো।

—হাঁ হাঁ, জরুর কোনো ধান্ধা আছে। সরপঞ্চ এনেছে যখন!

—সবাই খুঁজে কেমন করে গরিবকে সবচেয়ে কম দিয়ে লাগানো যায়।

—এর চেয়ে মালিকের মোষ হলেও ভালো ছিল। গরু আর মোষ তো খেতে পায়।

—মৌসি! গরু আর মেষের দাম কত হয় বলো? মানুষের তো দামই হয় না।

—তাও সত্যি।

—তবু বড়ো কষ্ট মানুষের। যে যেতে চায় সে যাবে। বলব সকলকে।

বাসনি বলল, যদি খেতে পাই, তাহলেই চলে যাব। একবার গেলে আর ফিরব না।

সাতবান বলে, এগুলো কোনো কাজের কথা হচ্ছে না। খালাস নিতে হবে, মদতও আদায় করতে হবে।

মোরি উপসংহারে বলে, এ লোকটা কে? দেখে মনে হয়, খরাতাপে শুকানো ভিণ্ডি একটা!

মন্তব্যটি খুবই লাগসই হয়। সবাই হাসে। মোরি সগর্বে বাসনির দিকে তাকায়। দেখো! আমি এখনো শুধু কথা বলেই সকলকে হাসাতে পারি।

সমুন্দরের বাড়িতে রুটি, ডাল আচার ও বেগুনের ভাজি খেয়ে লক্ষ্মণ একটি বিড়ি ধরায়। না, বড়ই তৃপ্তি হয়েছে তার। এখানকার জলও ভালো, ভকিল বলেছে। সে বলেছে, কয়েকবার তোমাকে ব্যবস্থা করে দিলাম। কোনোটাই তুমি রাখতে পারছ না।

—এখানে সব ঠিক থাকবে।

—এখানে চেপে থাকো, ভালো থাকবে। কেচকি গ্রামের জল খুব হজমি।

—কৈসে?

—হয়তো খনিজ কারণে। পলামুতে খনিজ সম্পদ অনেক।

তবু কোনো শিল্প নেই। পলামু কৃষি জেলা হয়েই রয়ে গেল আজও।

– ইনডাসটি তো হোনাই চাহিয়ে।

—কেচকিতে যাও। ওখানে নহলাতে লাটা নদীর এক কুণ্ডী আছে। জল হজমি খুব। এক শিব মন্দিরও আছে। পূজারী জল বেচত, খুবই আশ্চর্য যে সে কুণ্ডী শুকিয়ে গেছে। আর পুরা কেচকির জল মিঠা হয়ে গেছে।

—চেহারা ফিরবে আমার?

—দেখো।

—আপনার বহোত দয়া আমার উপর।

—আরো ভৈয়া! যতদিন ঠিকাদারি করছ, এতদিনে তোমার রাজা হয়ে যাবার কথা। হতে তো পারছ না। ফরেসেব মাল বলতে তুমি টোরিতে বসে আঁওলা চালান দিতে থাকলে! আরে! টোরি থেকে লাপরা এসো, দক্ষিণে যাও, বোরা বোরা আঁওলা তো জঙ্গলে মিলছে, পয়সাও লাগে না। না দেখলে শালগাছ, ওঃ!

লক্ষ্মণ এ কথায় বড় উসখুস করে। ভুই ঠিকেদার ঢুকেছিল টোরি এলাকায়। সুন্দরলাল ঠিকেদার লক্ষ্মণকে ভিড়িয়ে দেয় একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। সেই তুসাদিনকে নিয়ে লক্ষ্মণ থাকে ব্যস্ত এবং পাহাড় জঙ্গলে আমলকি বা আঁওলা তোলাতে থাকে মহাবীর আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে। আমলায় নাফা কম।

সুন্দরলাল নিজে লাপরা থেকে ষাট সত্তর বছরের পাকা শালগাছ কয়েক শত কেনে।

বিদায় বেলা আসে যখন, সুন্দরলাল মোটা টাকা, এবং লক্ষ্মণ জলভরা চোখ নিয়ে লাপরা ছাড়ে। ঘটনাটি এখনো যথেষ্ট মজা দেয় লোককে।

লেবার-চালান এখন খুব লাভজনক। সে জগতে ঢোকাই মুশকিল। ভকিল সাব লক্ষ্মণের জন্যে এখনো চেষ্টা করেন, কেননা ভকিল সাবের পত্নী এবং লক্ষ্মণের মা একই মঠে দীক্ষিত, একই গুরুর কাছে। এই গুরু বর্তমানে পলামুর রাজনীতিক নেতারও গুরু।

লক্ষ্মণ এবার নতুন করে জীবন শুরু করবেই করবে! সমুন্দরকেও খুশি করে দেবে।

—হাঁ সমুন্দরজী!

—বলুন।

—ওই মেয়ের নাম কি গোছমনি?

—না...আরো কোনো নাম আছে।

—তাহলে "গোছমনি" কেন বলা হচ্ছে?

— সে খুব উলটাপালটা কাহিনী।

—বলুন না।

— বলব···! অবশ্য বললেও হয়। কেচকিতে থাকলে, চাই যাওয়া আসা করলে আপনি কারো না কারো কাছে অনেক ঝুটামুটা বাত শুনবেন এ কথা নিয়ে। আমি যা জানি সেটাই সত্যি কথা। এ একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার. ঔর আমার ইজ্জতও যা খেয়েছে, অথচ মহাবীরজীর কসম, দুর্গা মাইয়ের কসম, এতে আমার কোনো দোষ ছিল না।

এ কথা বলে সমুন্দর দেয়ালে প্রলম্বিত ছবিগুলির দিকে তাকায়। ঘরে হারিকেন জ্বলছে। তার আলো দেয়ালেও। সমুন্দর দেখতে চায় মা দুর্গা, বা দুর্গামাইয়া-বেশী ক্যালেণ্ডারের ছবি। কোনো বাস্তব কারণে ক্যালেণ্ডারের দুর্গামাইয়া এবং অতীতের অভিনেত্রী নিরূপা রায়ের মুখে অদ্ভুত সাদৃশ্য। কারণ ব্যাখ্যাসাধ্য। নিরূপা রায় একদা পৌরাণিক হিন্দী ছবিতে দুর্গামাইয়া, গঙ্গামাইয়া, কালীমাইয়া সাজতেন। ক্যালেণ্ডারের ছবি সেসব সিনেমার পোস্টার দেখেই আঁকা।

সমুন্দর দেখতে চায় দুর্গামাইয়ার ছবি! তার চোখ পড়ে রাজবংশ ও রতি অগ্নিহোত্রীর ছবির দিকে। রাজবংশ ও দলীপ, অমিতাভ বচ্চন ও রতি অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে নিজেদের পাঞ্চ করা ছবি কেচকিতে কয়েকটি উপহারও দিয়েছিল।

ছবিটি সমুন্দরকে বড় বিচলিত করে। সে হারিকেনটি সরিয়ে রাখে, এবং ঝালো কেন গোছমনি হল, তার কাহিনী বলতে থাকে।

সবই মহাবীরজীর ইচ্ছায় ঘটেছে।

বিশাল ভূঁইয়ার বউ ঝালো। বিশাল, ঝালো, বিশালের দাদা সাতবান, এরা সকলেই সমুন্দরের কামিয়া। ওদের ঠাকুর্দা সাতবানের বিয়ে দেবার জন্যে সমুন্দরের বাবার কাছে একষট্টি টাকা ও এক বোরা চাল নেয়। তখন একমণ চালের দাম সাত টাকা।

এ ভাবেই ওরা কামিয়া হয়ে গেল। কামিয়ৌতি তো খতম হয় না কখনো। তাই সাতবানের ঠাকুর্দা, সাতবানের বাবা, সাতবান ও বিশাল, ওদের বউরা, সবাই কামিয়া হয়ে থেকে গেল।

বিগত বিশ-বাইশ বছরে ওরা অসুখে, আকালে, বিশালের বিয়েতে, বাপমায়ের মৃত্যুতে, যত ধার নিয়েছে,—(এমন ধার ওরা নিয়েই থাকে) সবই যোগ হয়েছে সেই আদি করজের সঙ্গে।

ওই পরিবারটি উনিশশো একষট্টি সাল থেকে কত কি নিয়েছে, সব মনে আছে সমুন্দরের।

সাতবানের বিয়েতে একষট্টি টাকা আর এক বোরা চাল।

তারপর সাতবানের মায়ের শোথজ্বরে এগারো টাকা। তারপর পেটের ক্ষুধা মিটাতে আধ বোরা কুরথি কলাই। তারপর বিশালের বিয়েতে পঁচিশ টাকা। বাপের দাহ ও শ্রাদ্ধে একুনে বত্রিশ টাকা, আর মায়ের পারলৌকিকে ছেচল্লিশ টাকা।

বাইশ বছর ধরে বারবার ঋণ নিয়ে ওদের ধার এখন দাঁড়িয়েছে একশো পঁচাত্তর টাকা, এক বোরা চাল ও আধ বোরা কুরথি কলাই।

পরিমাণটা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বেড়ে বেড়ে এখন তিনহাজার টাকায় পৌঁছেছে।

যতবার ধার নিয়েছে, ততবার ওরা টিপছাপ দিয়েছে। ফলে এখন কতকাল যে ওদের দাস হয়ে থাকতে হবে তা বলা কঠিন।

বছর চারেক আগে বিশাল খুব গোল পাকাবার মতলবে ছিল। বিশাল বরাবরই খুব তেজী, খুব পরিশ্রমী, আবার মেজাজটাও খুব কড়া।

বউকে পিটাত। সমুন্দরও কত সময়ে বলেছে, দেখো বিশাল! রাবণরাজা মন্দোদরীকে পিটাতেন। তাতেই তাঁর পতন হয়েছিল। কাহিনী এখানে পৌছালে লক্ষ্মণ বাধা দেয় মহোৎসাহে। কেন না ঠিকাদারী কাজে ঘুরতে ঘুরতে সে তেমন ধনদৌলত করতে পারে নি, কিন্তু রামায়ণ খুব পড়েছে।

—হাঁ হাঁ, এ কেমন কথা বললেন? রাবণ রাজা মন্দোদরীকে মারতেন? একথা কোথায় লিখা আছে?

—বলবন্ত দ্বিবেদীর লিখা রামায়ণে।

—এ কথা কেউ লেখে নি।

—কে লিখবে? কে জানে? পলামুতে হাটবাজারে ওঁর লেখা রামায়ণ বিক্রি হয়।

—ওঁর নামও শুনি নি কখনো।

—উনি খুব উঁচা দরের মানুষ ছিলেন। ওঁর পূর্বপুরুষ লঙ্কায় রাবণরাজার গৃহদেবতার পূজক ছিলেন। তাই অনেক কথা ওঁর রামায়ণে পাবেন, যা বাল্মীকিও জানতেন না। রাবণরাজা তাঁর রানীকে পিটাতেন। এই রামায়ণ পড়লে এ কথাও জানবেন, যে সীতামৈয়া রামচন্দ্রজীর জন্যে বনবাসের কালে ঠিকসে খানাউনা পাকাতেন না বলে তাঁর এত লাঞ্ছনা হয়। এসব কথা সবাই জানে না।

—খুবই তাজ্জবের বাত।

—নিশ্চয়। বলবন্তজীকে দেখলে আপনি কী ভাবতেন কে জানে। টিউকল বসাবার ঠিকাদার, কাটা কাপড়ের দোকান, বলবন্ত, দন্তমঞ্জন প্রস্তুতকারক,—এ লোকই রামচন্দ্রজী, রাবণরাজা, সকলের খবর জানতেন। এটা খুবই আফশোসের কথা, যে নিজের বউকে পিটাতে গিয়ে উনি পা পিছলে পড়ে গেলেন, মরেও গেলেন।

—যাহোক, বলুন! মরে যাবার কথা কে বলতে পারে যে কার মরণ কেমন ভাবে হবে।

—তাও বলা যায় ঠিকেদারজী! আমার মরণ হবে সাপ কেটে, গণক বলেছেন।

—রাখুন তো ওসব কথা !

—যা বলছিলাম···আমিই সর্বনাশ করলাম। বিশালকে পাঠালাম সেমরা। বিহার মিনারাল ডেভলপমেন্ কর্পোরেশানের খাদানে আমার শালার কাছে। সে ওখানে ওভারসিয়ার। ঘর থেকে কিছু পাঠাবার ছিল।

—ওটা চলছে তো ?

—খুব চলছে। ঠিকেদারের লেবারও নিচ্ছে। এক শো দরকার তো চারশো বসে থাকছে হাত জোড় করে। আপনাকে লাইন করে দেব। আমি পিছনে থাকব, কিন্তু শেয়ার নিব। লেবার যাতে পান, তাও দেখব।

—নিশ্চয়। তারপর ?

—বিশাল তো বহোত খচড়াই। চলে গেল সেমরা বন্ধুয়াটোলি। সেমরার কামিয়াদের সঙ্গে অনেক জোতানানা করল।

ওহি সেমরায় সরকার কামিয়াদের খালাসও করে, মদতও দেয়। সেই থেকে মচ্ছড় যেমন ভনভন করে, তেমনি বন্ধুয়া লোকও গুন্গুন্ শুরু করছে যে কামিয়ৌতি নেহি চলে গা।

—কৈসে ন চলে গা ? পলামু জিলায় তো সিরিফ কামিয়ৌতিই চলে।

—ভৈয়া ! ভারত সরকার তো জাতপাঁতের মহিমা বুঝে না। কামিয়ৌতি উঠাচ্ছ কেন ? উঁচা জাত কি হাতে লাঙল ধরবে, না বিহার সরকারের রেটে মজুরি দিয়ে চাষবাস করাবে ?

—সেই তো কথা !

—বিশাল ফিরে এসে যে কত রকম খচড়াই জুড়ল তা বলতে পারি না। টাউনে যায় আসে। কুশলপ্রসাদ ভকিলের কাছে বুদ্ধি নেয়।

—তাকে আমি জানি।

—নওনেহাল তার কামিয়া মেয়েকে পিটাচ্ছে, তাতে তোমার কী ? বিশাল যেয়ে নওনেহালের হাত মুচড়ে ধরল। বুঝুন !

—তারপর ?

—সকলকে নিয়ে এক কাট্টা হয়ে গেল। বলল, কামিয়ৌতি তো বেআইনী। বেআইনী খাটাবে, আওরত পিটাবে, তা হবে না। এ নিয়ে বহোত ঝামেলা উঠে। শেষে কুশলপ্রসাদের কাছে সেই আওরতকে নিয়ে গিয়ে কেসও করাল।

—আপনি কী করলেন ?

—কী করব ? কামিয়ার এমন আস্পর্ধা। আমাদের মধ্যে একতা থাকলে নওনেহালের জন্যে আমি লড়ে যেতাম। একতা একেবারে নেই। আর ওই যে জমিব মামলা চলছে, যার যার কামিয়া তার তার সাক্ষী।

—ওখানেই মিটে গেল ?

—হ্যাঁ, তখনকার মতো। তারপর বিশালকে বুঝালাম যে এরকম করা ঠিক নয়। ওকে যখন বোঝাব কি শাসন করব, ও তখন বলবে, হাঁ হাঁ মালিক। তুমি যা বলছ তাই ঠিক। তারপরই বিগড়ে যাবে।

—তারপর ?

—মেয়েকে দেখতে গারোয়া গেলাম। ফিরে এসে দেখি বিশাল নেই। কোন্ ঠিকেদাবেব সঙ্গে কথা বলে ওই সেমবার ওই খাদানে কাজ করতে গেছে গ্রাম থেকে চারটে কামিয়াকে নিয়ে।

—খুব তাজ্জব ! সাহস হল কোথা থেকে ?

—ঘরের মধ্যে বিভীষণ। ওখানে লেবার ঝামেলা হল। তাতে আমার শালাই ওকে রেখে নিল। বলছি না যে রাজপুত জাতের মধ্যে একতা নেই ?

—আপনি কী করলেন ?

—থানায় খবর দিয়ে ধরে আনালাম। কিন্তু দারোগা তো আদিবাসী। মুণ্ডা, তাতে ক্রীশ্চান। সে বলল, কামিয়া প্রথাই বেআইনী। জবরদস্তি আপনি কাউকে গোলাম খাটাতে পারেন না। সেখানেও ইজ্জত চলে গেল। শেষে ব্লক অফিসার থানায় বলে······

—সে দোষ মানল ?

—মোটেই না। আমার কাছে খুব চুপ করে থাকল। তারপর

একশো টাকা করজ নিল। এ-ক-শো টা—কা! কা খচড়াই রে বিশাল! সে টাকা নিয়ে রাতে পালাল কেচকি ছেড়ে।

—কোথায়?

—ধানবাদ কয়লা খাদানে।

—সেই কাজই করছে?

—এবার ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয় হয়ে গেল। কাজ করতে ভেগে গেল. তার তিন মাস বাদে খবর এল, যে খাদান ইলাকায় কোনো রাস্তা বানাবার জন্যে মাটি কাটতে কাটতে মাটির ধস নেমে অনেক লোক মরেছে। বিশালও মরে গেছে।

—মরে গেছে!

—হাঁ জী।

—আপনি কী করলেন?

—দেওতা বনে গেলাম। মহাবীরজীর ইচ্ছা সবই। ওর বউকে তাড়ালাম না। সেই একশো টাকা তো বিশাল নিয়ে ভেগে যায়। ওকে যদি কিছু দিয়েও থাকে, ওর বউ তা মানল না। সে বলে, যে টিপসহি দিয়ে টাকা নিল তার খাটার কথা। আমি টিপসহি দিলাম না, টাকা নিলাম না, আমি খাটব কেন?

—এও এক কথা।

—সবই মেনে নিলাম।

—গোহুমনি আপনার কামিয়া?

—কামিয়া তো ও ছিল, রয়েও গেছে। কিন্তু তখন ওর নাম গোহুমনি হল না। পরে...আন্দাজ আড়াই বছর আগে আমাদের মামলার কারণেই কেচকিতে সরকারী জরিপ তাঁবু পড়ল।

হাঁ হাঁ, জমির কথা শুনেছি।

—আমিন বাবু এক সৃষ্টিছাড়া লোক। জমি জরিপ পার্টি এলে মালিকরা তাদের চাল-খাসি-ঘি পাঠাবে। আচ্ছা আচ্ছা ঔরতও চাইলে ভেজবে, ওহি কামিয়া-ঘর থেকে। এটা কোনো ভালো নিয়ম নয়, কিন্তু পুরনো আদত, চলছে।

—নয়া আদতও তাই।

—এ আমিন বাবু তো এত বোকা, যে কোনো কিছু নেয় না, মাইনে ওই যৎ-সামান্য। তার উপর খুবই খিচখিচা মানুষ। এসেই বলে দিল, চাল-ডাল-আটা কাউকে বিনাপয়সায় দেবেন না। যা দরকার সব কিনে নেব, হিসাব দেবেন।

—সৎলোক খুব।

—ভৈয়া! তাতেই গণ্ডগোল বাধে জানলেন? সাচ্চা লোক, ঘুস খায় না, এ রকম বড় অফসর দুটো একটা দেখেছি। কিন্তু নিচু মহলে এত কট্টর বামনাই না আমি দেখেছি, না আর কেউ দেখেছে। বিহারে তো এমন আদত চলে না, ঔর পলামুতে কখনোই চলে না।

—তারপর?

—এ নিয়ে ওদের পিওন, চেনপিওন, কানুনগো, সকলের মধ্যে খুব অসন্তোষ ছিল। তশীলদারও এসেছিল। সে পলামুবাসী পাঞ্জাবী। তার রোখ খুব। সে মেয়েদের লালচ খুব করে। তা ঝালোকে দেখে ও ক্ষেপে যায়।

—হাঁ। খুবই সুন্দরী।

—ওহি জমিতে তো ওরা লোটা নিয়ে যায়। ঝালোও গিয়েছিল। তশীলদার কাশঝোপের পিছন থেকে দেখছিল, সে ওকে জড়িয়ে ধরে।

—তারপর?

—বাস! ঝালো তো চেঁচিয়ে উঠল, আর খুবই ঝটাপটি হল। শেষে ঝালো ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দেয় বাঘের মতো। তখন তো বহোত গোলমাল বেধে গেল। ঝালোকে শিক্ষা দিবার জন্যে আমি তৈরি হলাম। ওদের জাতে মেয়েদের তো এত ইজ্জত থাকে না।

—কোথায় আর থাকে?

—ঝালো আমিন বাবুর কাছে বিচার চাইল। হ্যাঁ সে এক দৃশ্য বটে। ঝালো কাঁদতে কাঁদতে এল আর বলল, পথের কুত্তারও যদি কখনো ছুটি মিলে, তবু আমাদের মিলে না। মালিকরা তো আমাদের

বিনি পয়সার রেণ্ডি করেই রেখেছে। ঔর তোমার সরকারী তশীলদার, একে কোন্ শাস্তি দেবে ? ওঃ বাপ্‌রে বাপ ! কী কাণ্ড !

—হাতে কামড়ে দিল ?

—সে তো তখন হাতের ব্যাথায় কাঁদছে।

—তারপর ?

—আমিন বাবু ওকে মা ! বোন ! বেটি ! বলে যতই মানায়, ও ততই বলে, মা-বোন-বেটি ! তোমার মা-বোন-বেটিকে এমন বেইজ্জত করলে যেমন শাস্তি দিতে। তেমন দিতে পারবে ? অপরাধী তো একদম চুপ, গুংগা যেন। চুপটি করে বসে থাকল। বেশ একটা গোল পেকেছে দেখে কামিয়া লোকও জুটে গেল। বহোত তামাশা লেগে গেল।

—বাপ রে ! এক ভূঁইনকে নিয়ে ?

—ভৈয়া ! পলামুর হাওয়া এখন পালটাচ্ছে। গরিব মেয়ে বলাৎকার হলে সে কেসও হচ্ছে। আগে এসব হত না। কেউ সাহস করত না ঝামেলা উঠাতে।

—এখনো তো হয়।

—হয়, হচ্ছে, এ তো ইলাকার নিয়ম। কিন্তু আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে সব।

—তারপর ?

—আমি তো সরপঞ্চ। আমাকেই সাতবানরা বলল, যে এমন অন্যায়ের বিচার আপনিও করুন। মেয়েদের উপর বেইজ্জতি যদি চলতে থাকে, তাহলে মারদাঙ্গা করে মানুষ ভেগে যাবে ইধারউধার। গরিবের তো ভকিল-উকিল, আদালত পুলিশে কোনো বিশ্বাস নেই। মারপিটাবে, ভেগে যাবে। আর এও খুব তাজ্জব, যে আমরা অছুত, আমাদের ছোঁয়া পানি অছুত, লেকিন আমাদের আওরতরা অছুত নয়।

—এখন এসব কথা হাওয়ায় চলছে।

—আগেকার দিন হলে ঝালোর মাথা নেড়া করে টাউনে পাঠিয়ে

দিতাম রেণ্ডি টোলিতে। উঁচাজাতের বাবু তোকে লালচ করেছ তো ধন্য করে দিয়েছে একেবারে। তা নিয়ে আবার কথা? কিন্তু এখন তো উলটা বাতাস বইছে। তাতেই আমিও বললাম, যে বিচার হোক।

—বিচার হল?

—খুব। আমিন বাবু ওই তশীলদারকে বহোত হি ডেঃট দাবড়ে ফেরত পাঠাল। ক্যাম্পও তুলে নিল। আর যাবার কালে সকলের সামনে ঝালোর মাথায় হাত দিয়ে বলল, মা! সতীত্ব রক্ষার জন্যে তুমি আজ যে কাজ করলে, সে তো অখবরে ছাপাই হবে, সরকার তোমায় পুরস্কার দেবে,—এমনটা অন্য রাজ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু পলামু বহোত অভিশপ্ত ভূমি। এখানে ভালো কাজ দেখালে খুন হতে হয়। ঔর চোর—চোট্টা—দাগাবাজ—ফরাবাজ—ধাপ্পাবাজ—বলাৎকারী—হত্যাকারী, সকলের মিলে নাফা সে নাফা, সৎনাম সে সৎনাম। তবুও মৈয়া, তোমাকে দেখে আমার বুক অনেক বড় হয়ে গেছে। চোরবাটেরা তোমার ইজ্জত লুটতে এসেছিল। গোহুমনির মতো ফুঁসে তাকে কেটে দিয়েছ।

—ওহিসে গোহুমনি!

—ওহিসে গোহুমনি।

আমিনের কাছে তখন কেঁদেকেটে পড়েছিল গোহুমনি। এ গ্রামের হালচাল জান না বাবা। আমাকে এখন মালিক লোকরা কত লাঞ্ছনা করবে, কাজ দেবে না। যার দৌলতে কপালে সিঁদুর আর হাতে কাচের চুড়ি পরতাম, সে তো নেই। দুটো সন্তান নিয়ে আমি তো হাওয়ার মুখে তুষের মতো উড়ে যাব কোথায়।

সরপঞ্চকে তখন মনের রাগ বুকে চাপতে হয়েছিল। বলতে হয়েছিল, না, না, কাজ তুই পাবি।

আর ওই বোকা তশীলদারকে গুনে গুনে পঁচিশ টাকা দিতে হয়েছিল। যাবার কালে আমিন বলে যায়, তোমাদের যার যা অভিযোগ আমার কাছে গিয়ে বলবে।

একজন দুজন ভালো লোক এখনো প্রশাসনে আছে। আমি তাদের কাছে ভেজে দেব।

ওই এক বোকা তশীলদারের জন্যে নানা রকম বিপদ ঘটে গেল যাকে বলে। এতকাল ধরে মালিকরা, বাবুরা, পুলিস, পিওন, ঠিকদার, মস্তান, ট্রাকচালক, জঙ্গলরক্ষী, সকলেই কামিয়া ও অন্য গরীব মেয়েদের যথেচ্ছ ভোগ করেছে।

ভোগ করেছে, বেচে দিয়েছে, রেণ্ডি করে দিয়েছে, কত রকমই না করেছে।

ওদের ধরে নিয়ে পেড়ে ফেলার পক্ষে মলত্যাগের পরের সময়টি ছিল উপযোগী।

এখন কেচকি গ্রামের ঘটনার পর সবাই বেশ চমকে গেল। গোহুমনি যদি পারে, তাহলে আমরাও বাধা দিতে পারব সাহসে কুলালে। এবং গোহুমনির বেলা যদি ক্ষতিপূরণ পঁচিশ টাকা হয়ে থাকে, তাহলে যত মেয়ে নিয়ত ধর্ষিত হয়, তারাও তো কামাই করে পঁচিশ টাকা করে।

সকলেই এ নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং এই নবচেতনার ভগীরথ গোহুমনিকে বলে, চল্! সবাই একটু আনন্দ করি।

—কৈসে?

—চল্ মদ খাই একটু করে।

—ছি ছি! আজ মালিকরা খুব বেশি অপমান হয়েছে। আজ বরং সাবধানে থাকার কথা রাতবিরেতে কোনো চোটও উঠাতে পারে।

বাসনি ঝরঝর করে কাঁদে ঘরে এসে। মার কাছে বসে কাঁদে।

—হায় মা! হায় মা! একবার ধরম নিলে পঁচিশ টাকা যদি হয়, তাহলে সরপঞ্চের কাছে আমার এক মাসে দশ পনেরো বার পঁচিশ টাকা পাওনা হয়। আর নওনেহালের ঠাকুর্দার কাছে তোর পাওনা হয়—

চুপ কর্, চুপ কর, কে কোথায় শুনবে! তখন সত্যনাশ হবে, নাশ হবে।

—না মৈয়া! চুপ করতে বলিস না।

সাহস করে ঝালো রুখে দাঁড়াল তো বড় কাজ করেছে। মাদের ইজ্জতও বেড়ে গেল। মালিকরা তো এও মানে না যে র আমাদের ছেলেমেয়ে আছে কি না। রেণ্ডিকাজে পয়সা লে এ তো তেমন হল না। এ তো জরিমানা আদায় করল লো! এ টাকায় ইমান আছে, না কি বলো?

—কাঁদিস না অমন করে। নে, বিড়ি খা।

মোরি তার টিনের কৌটোর সাম্রাজ্য হাতড়ে হাতড়ে বিড়ি বের রে, মেয়েকে দেয়। তারপর বলে, আয়! তোর উকুন চারটি ছে দেই। তুই আমার উকুন পরে বেছে দিস।

—হাঁ, দিই! হাট থেকে উকুন মারা ওষুধ আনব। সবচেয়ে লো তাই।

ঝালো, যে নাকি বিশালকে বহু, সোনাকে মৈয়া, সে কেমন করে গোহমনি হল, সে কাহিনী সবিস্তারে বলে সমুন্দর।

উপসংহারে বলে, ওর ব্যাপারে আমার তো এমন বেইজ্জত হয়েছে যে, ও যদি চলে যায় কাজ করতে, তাহলে আমি বাঁচি।

—স্বামী তো নেই।

—না।

—আর বিয়ে করতে পারে?

—খুব পারে। করছে কোথায়? দেখুন না! আমাদের সমাজে কোনো একতা নেই বলে এমন হচ্ছে। একতা থাকলে এক মালিকের অপমানে শোধ নিতে সকল মালিক রুখে যেত।

—সরপঞ্চজী! লেবার তো মেলা খুব দরকার। ধরুন না আশেপাশে ম্যাগনেটাইট লৌহ আকর খনি কতগুলো। রুংটা, বি. এম. ডি. সি, বি. সি. সি. এল, সবাই চালাচ্ছে।

—নাফা থাকে?

—নাফা না থাকলে চালাচ্ছে?

—তাও তো বটে।

—রেটও অনেক। একশো কিউবিক ফুট হিসাবে মজুরি হল, নর
মাটি কাটলে পঁচিশ টাকা ষোল পয়সা। নরম পাথর কাটলে একত্রি
টাকা ছেচল্লিশ পয়সা। শক্ত পাথরে ছেচল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

—এ তো অনেক।

—পার্মেণ্ট লেবার তো নেই কোথাও। থাকলেও যৎসামান্য
কাজ করবে বদলি লেবার। তার মধ্যে বাচ্চা ছেলেও অনে
ঢুকাব। সরকারী রেটে কোম্পানি দিবে। কেননা কোম্পানী
লোকজন. ইউনিয়ন, সবাই বাট্টা পাবে। আমার নাফাও থাববে।

—এরা কী পাবে?

—দুই থেকে পাঁচ। এদেরকে দশ-পনেরো দিলে আমাদে
কিছু থাকবে না।

—এরা যায় তো ভাল। নয় তো লেবার আপনি কতই পাবেন
একে গরীব, তাতে খরায় সব জ্বলে আছে।

—কামিয়া লোক নিলে এই সুবিধা যে ওরা ভাগতে পারে না
ভয় পায়। নইলে এখন চারদিকে যত ঠিকেদার ঘুরছে, বাইরে নিে
চলে যাচ্ছে। পাবে তো ফুটা পয়সা, কিন্তু বড বড় কথা শুনে চে
যাচ্ছে। খুব কষ্টে থাকে, খেতে পেলেও ভালো।

—খুব জানি। ভাদ্র মাসে চলে আসবে যত দালাল। মাথা
চুল থেকে উকুন কি দেখা যায়? এরাও তেমন লুকিয়ে পলামুে
ছড়িয়ে পড়ে। খুব খানাপিনা করাবে, লোভ দেখাবে, আগাম টাক
দিবে। তারপর কালীপুজা দিওয়ালির পর পরব-পুজা সেরে স
ভাগবে পাটনা-ছাপরা-আরা-কলকাতা।

—কামিয়া লোকও ভাগে?

—তাও ভাগে। ওদের তো ধরমবোধ নেই যে আমি মালিকে
বাঁধা গুলাম!

—না না, আমি দেখছি। আপনিও কোসিস করুন। আপনার
:নো খরচ নেই, যা হয় তাই নাফা।

—কামিয়ৌতি তো ওহি কারবারই ছিল।

—এখনতো আছে।

—থাকতে পারত। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো একতা নেই
ল এত ঝামেলা।

সমুন্দর কথা বলে চলে যায়। লক্ষ্মণকে বড় উতলা করে রেখে
়। ধানবাদের কাছে মাটি কাটা। মাটির পাঁজা ধসে অনেক
বার মরে গেল। সব এখান-ওখান থেকে আনা ছুটা লেবার ছিল।
এই একটা ব্যাজের জন্যেই তার বদনাম হয়ে গেছে অনেক।
থা ভকিলসাব একবারও উল্লেখ করে নি। কিন্তু ঘটনাটি সবসময়েই
:নের মনেই ছিল।

মাটিকাটা কাজ ছিল। লাভ তো মাটিতে। আধঘণ্টা খাটবে,
 একশো কিউবিক ফিট চৌকা কাটলে সেই হিসেবে বাইশ টাকা
রি।

এখন ভারতভূমে এমন ছুটা ফুরনবাঁধা মজুর লোকের কোনো
াব নেই। কাজ হবে খবর পেলেই সব চলে আসে। সবাই
:ন, যে আটঘণ্টা কেন, বারো-চোদ্দ ঘণ্টা খাটতে হবে। সবাই
জানে যে হাতে পাবে সামান্য। খোরাকি পাবে। তারপর
দার বলবে যে তোরা বাইশ টাকা তো রোজ পেটে খেয়েছিস।
দশ পনেরো টাকা দয়া করে দিচ্ছি।

এ ভাবে ঠকবে জেনেও ওরা রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল
গণা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পলামু থেকে আসে। আসে, যায়,—
:স, যায়—মানুষের হিসাব নেই কোনো।

তো খুব কম সময়ে অনেক মাটি কাটবার ছিল। তখন লক্ষ্মণ
টির পাঁজার পিছনে বাঁশ পুঁতে দেয়। বাঁশের আগে রুমালে মুড়ে
শো টাকার নোট বেঁধে দেয়। ওই বাঁশ অবধি মাটির পাঁজা
ও, আর যাদের হিম্মতে হবে তারা নোট জিতে নাও।

মাটি কাটা হচ্ছে, রেজা ও বালকরা উঠাচ্ছে, ফেলছে। লোকটা, নাম তার বিশালই তো, সে বলে, নেহি হোগা।

—কা নেহি হোগা?

ঠিকেদারকে উপেক্ষা করে মজুরদেরকে বিশাল বলেছিল, ঠিকে চল্লিশ মজুর লাগিয়েছে। মাথা পিছু খরচ করছে পাঁচ টাকা। থাকছে সতেরো টাকা। তা ওভারসিয়ার পাচ্ছে পাঁচ টাকা। থাকছে বারো টাকা। ভৈয়া। বহ্‌নো। আমাদের রোজানি আটশো আশি টাকা। ওভারসিয়ার পায় দুইশো, ও পায় চার আশি একেক দিন।

—হাঁ হাঁ, তাই তো পায়।

—এখন নোট বেঁধে লোভাচ্ছে। ভৈয়া, ইধার বনি গাহাঢ়া খ উধার বনি নরম গিলা মাটির পাহাড়। এ কাজ সুস্তিব কাজ, ব্যা নয়। টাকা তুলতে আমরা ব্যস্তি হয়ে যাব তো মাটির ধস্‌ যাবে।

—ঝুট!

ঠিকেদার ধমকে বলেছিল। আর সেদিনই সে কুলীধাও অনেক মদ পাঠায়। সকলকে বলে, বিশাল ভয় দেখাচ্ছে। কথা মেনো না। হিম্মতসে এ কাম খতম করো। ট্রাকে তুলে নি যাব চামসাডি। সেখানে পথ বানাবে। আমাকে ধরেছ তো কা অভাব হবে না।

কুলীধাওড়ায় এ নিয়ে খুব জল্পনা হয়। বড় অভাবে এসে জানোয়ারের মতো ঝোপড়িতে থাকছি, আর ভাতপিঁয়াজ খাচ্ছি একশো টাকা পেলে ঠিকেদারের কাছে আরো চাঁদা নেব, তার মাংস ভাত খাব।

—তোরা মরবি।

—না বিশাল, "না" বলিস না।

—পুরা হিসাব রাখছি আমি, ঠিকেদারের কাছ থেকে হিসাব নিব।

কেচকির যুবকরা বলেছিল, বিশাল পারবে। ও কাউকে ভয় পায় না।

—হিসাব নিয়ে ভেগে যাব।

ঠিকেদার বলেছিল, গেলেই হল? আমার কাছে ও তিনমাস কাজ করবে, চুক্তি হয়েছে।

এ কথা শুনে বিশাল বলেছিল, এ খুবই তাজ্জব বাত। মালিকও বলে তুই টিপসহি দিয়েছিস, বাঁধা আছিস। তুমিও বলো, আমি টিপসহি দিয়েছি, বাঁধা আছি। বিশাল ভূঁইয়ার তো কিছুই নেই। না জমি, না নিজের ঘর,—তাকে কেন করজেশর্তে বেঁধে ফেলছ সবাই? এ কেমন ধান্ধা তোমাদের? তোমার শর্ত-টর্ত মানি না আমি। ভেগে গেলে করতে পার কিছু?

এই লেবারদল ছিল খুব মিশ্রিত। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা বলেছিল, আমাদের মতো বউ ছেলে নিয়ে এলি না কেন? তাহলে তোর মন বসত।

—আমরা তো কামিয়া।

—কেমন?

—মালিকের কাজের গোলাম।

—কেমন করে?

—সে অনেক পুরনো কথা। এহি মানো যে তোমার বাবার বাবা দশ বিশ টাকা করজ নিল তো আজও তুমি গোলাম খাটছ আর সেই করজ আজ হাজার টাকা।

সাঁওতাল পরগণার ছেলেরা অনেক প্রবীণ। অনেক জায়গায় গিয়েছে তাঁরা খাটতে। নন্দ মুর্মু তো নবম শ্রেণী অবধি পড়েছে। সে বলে, এমন প্রথা আগেও ছিল আর এমন সব কারণেই আমাদের জাতির সিধু কানু যুদ্ধ করেছিল।

—কত আগে?

—ধরো দেড়শো বছর, বা কিছু কম। এর নাম ছিল বেগার প্রথা।

—উঠে গেছে ?

—নাম বদলেছে, ওঠে নি। ভৈয়া! ঠিকেদারের কাছে পুরা হিসাব চাইবে যখন, আমরাও থাকব। চাইলেই হাঙ্গামা হবে, তবু যা পাই।

—শও টাকার নোটের কথায় ভুল না। মাটি পিছনে তো নেই, খাদের কিনারায় পাহাড় বনে গেছে।

লক্ষ্মণ ঠিকেদার সবই জেনেছিল আর পরদিন ও দুশো টাকার দুটো নোট বেঁধে ওদের মৌত জারি করে দেয়। দুটো নোট দেখে লোকগুলির জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় যেন। খাদের ভিতরে লোক, মানুষ মাটির স্তূপে! অতজনের ঠেলাঠেলিতে মাটিতে ধস্ নেমেছিল।

—ভৈয়া! বাচাকে, আদমি বাচাকে—বিশালের অর্তনাদটি হটাৎ চাপা পড়ে। কত পুরুষ, কতজন পিঠে বাচ্চাবাঁধা মেয়ে মানুষ, কতজন বালক-বালিকা, কে তার হিসেব করছে। ঠেকেদার দুর্ঘটনা দেখেই গুরুত্ব বোঝে। ওভারসিয়ার তাকে ঠেলতে থাকে। ভাগ যাইও, চামড়া বচাও, পুলিস আয়েগি, লেবর ঝামেলা উঠেগি,—ভাগো! এখন যা ঝামেলা হবে, সে ম্যাও সামলানো তোমার সাধ্য নয়।

লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদার বোঝে যে ওটা লাখ কথার এক কথা।

- কে তোমাকে বলেছিল নোট দেখাতে ?

—ভাবলাম, লোভের চোটে ওরা···

—ভৈয়া! লোভে তো কারো ভালো হয় না। ঠিকেদারী কামে এমন ভুল আর কোরো না।

কারা এসেছিল ? কারা মারা গেল ? কোথায় তাদের ঠিকানা ? থাকে না, থাকে না কিছুই হিসেবে। যদিও এমন সব ঠিকেদারের মজুররা নতুন কামিয়োতি প্রথায় ওড়িশার জঙ্গল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, পলামুর গ্রাম থেকে ধানবাদ, ট্রাকে—ট্রেনে—বাসে নিয়ত চলে আর চলে।

এদের জন্যে দিল্লীতে উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন হয়, পাস হয়

বহিরাগত শ্রমিক বিষয়ক আইন। সরকারি মজুরি, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থা, আটঘণ্টা কাজ, এমন সব প্রতিশ্রুতি তাতে থাকে।

কোথাও মাটিতে ধস নামে, কোথাও কয়লাখাদানে, কোথাও বাড়ি ভেঙে পড়ে।

হিসেব নেই, ক্ষতিপূরণ নেই, একদিনের হইচইও কপালে জোটে না। আবার ঠিকেদার, আবার কাজের সন্ধান। পেটে খেতে পাব তো বাবু?

বাঁশে নোট বাঁধা রেখে মজুরদের তাতাবার চমকপ্রদ খবর হতে পারত, হয় না।

তবে লক্ষ্মণের খুব বদনাম হয়ে যায়, খুব। ইলাকা ছেড়ে পালাবার কালে ট্রেনে বসে ওর মনে হয়, এটা খুবই শান্তির কথা, যে লোকটি বহোত ঝুটঝামেলা পাকাতে পারত সেও মরে গেছে। বিশাল ভূঁইয়া। বিশাল এবং তার তিন সঙ্গীই গেছে।

আর একটা খুব আপশোসের কথা যে, যাকে তাকে হাজির করে, মৃতদের দাবীদার হিসাবে তাদের প্রমাণ করে ওই ওভারসিয়ার মৃতদের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতিপূরণ বের করে নেয়, টাকাও মেরে দেয়।

এরকমই নিয়ম, এমনই হয়ে থাকে।

আর এটাও খুব অদ্ভুত যে তারপরেও সেই ওভারসিয়ারই বাকি লেবারের হাতে পিটাই খায়, তাকেও পাওয়া যায় অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায়।

ওভারসিয়ার শুধুই পিঠাই খেল। লক্ষ্মণ থাকলে তাকে তো মেরেই ফেলত।

আর এ কেমন ভাগ্যের কৌতুক যে, সে আসবে কেচকি গ্রামে। আসবে লেবারের খোঁজে। এবং দেখতে পাবে বিশাল ভূঁইয়ার বিধবাকে।

গোহুমনি। গোহুমনিই বটে! খাওয়া নেই, মাথা নেই, শরীরে তবু ঝিলিক দিচ্ছে।

সমগ্র ব্যাপারটি লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদারকে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে।

তারপর তাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হচ্ছে। সেইজন্তেই ভকিলসাবের কাছে আসা।

এটা বড়ই লজ্জার কথা, যে বারে বারে তাকে ভকিলসাবের কাছেই দৌড়াতে হয়। ছোট-ঠিকেদার লাইনে সবাই বলছে এখন, তুমি শান্তিস্বস্ত্যেন করাও। কাল যে লাফাঙ্গা লাকড়া ছেলে সিনেমার টিকিট বেলাক করত এবং মা-মাসি থেকে ছোকরি যে কোনো মেয়ে দেখলেই "জিসকি বিবি মোটি" গাইত,—ছোট ঠিকেদারী পেয়ে আজই সে কত উন্নতি করে ফেলছে। তুমি তো স্থযোগ কম পাচ্ছ না। তোমার কিছু হচ্ছে না কেন?

বস্তুত, তুমি একটা ক্ষতি করছ দেশের। ঠিকেদাররা দেশ গড়ছে, ঠিকেদারী এখন ভারতের যুবসমাজের কাছে সব চেয়ে লোভনীয় পেশা। তোমাকে দেখলে তো লাফাঙ্গা-লাকড়াদের বুক দমে যাবে; তারা আর আসবেনা ঠিকেদারী লাইনে।

তা, কেঁচে গণ্ডুষ করতে হলে নতুন ইলাকা সব চেয়ে ভালো। এসব কারণেই কেচকি চলে আসা। কিন্তু সেখানে বিশালের ঘর কে জানত?

এখন ইটভাটা বলো, কোনো নির্মাণ প্রকল্প বলো, বড় বড় কারখানা বলো সবই তো ঠিকাদারের লেবার। কত হিসেব রাখতে পারো তোমরা, কে কোথা থেকে আসে। যত গরিবের জন্তে দীপান্বিতার বিজ্ঞাপন, তত গরিবের নাভিশ্বাস। ততই হতাশ ও মরিয়া গরিব কাজের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ছে।

না, এখানে কেউ ঘটনাটির কথা জানে না।

লক্ষ্মণ এমন তীব্র আবেগে বিশালের কথা ভাবতে থাকে বলেই আজ রাতে মৃতের জগৎ থেকে অবয়ব নিয়ে উঠে আসে বিশাল ভূঁইয়া।

বারবারই সে আসতে চাইছে, আসছে। কিন্তু এখনো সামনে আসছে না। মৃত ও জীবিতের জগতের মধ্যেকার সীমারেখা বড়ো দুর্ভেদ্য।

বিশাল ভুঁইয়া মৃতলোক থেকে ফিরে আসতে পারত কি না কে জানে। কিন্তু ঝালো তো তাকে কামনা করত, সবসময়ে কামনা করত। সাতবান চাইত সে ফিরে আসুক, মোরি চাইত সে ফিরে আসুক।

সকলের মিলিত আবেগের তীব্রতা বিশালকে ডাকতে থাকে। বিশাল সে ডাক শুনতে পায়। মৃত যদি জীবিতের কাছে আসতে চায়, তাহলে সে অন্ধকারই খুঁজবে। অন্ধকারের মতো বন্ধু কে আছে?

লাঠা টোলির জগতে শুরু হয় নড়াচড়া। লক্ষণ সিং ঠিকেদারের কথায় কাজ হয়। নওনেহাল, ভানুপ্রতাপ, গজানন, রামপরতাব এমন সব মালিকদের সঙ্গে বসে সমুন্দর সিং।

--আমরা কাজ দিতে পারছিনা সব সময়ে। আকাশ জল না দিলে চাষ নেই, কাজও নেই।

—হ্যাঁ, সব জায়গাতে একই হাল।

—সিচাই চাই, সিচাই।

—এমন সিচাই, যাতে সম্বৎসর জল পাই।

--জল পেলে তিনটে চাষ হবে।

—কামিয়ারা তো কাঠ কাটতে, পাথর ভাঙতে, বালির ঠিকেদারের হয়ে বালি উঠাতে যাচ্ছেই।

—হাঁ হাঁ, যাচ্ছে।

রামপরতাব যে কোনো কথাই খুব রেগে বলে। সে ঝেঁঝে উঠল, আর এদিক-ওদিক থেকে পাঁচ রকম বুদ্ধি নিয়ে আসছে। মাথা গরম করছে।

গজানন ঠাণ্ডা মাথার লোক। সে বলল, আজকাল তো আমার নাগর। মোটে ছিঁড়ে না। বেটাদের পিটাতাম, সেসব তো এখন বন্ধ।

ভানুপ্রতাপ মুখিয়া এবং সময়ের তালে তাল দিয়ে চলতে জানে। সে বলল, এটা ভালো যে আমরা পিটাই না। পিটাই মারাই যারা অতিরিক্ত করেছে, তাদের কারণেই কাগজপত্রে খবর বেরিয়ে পলামুর নামে কলঙ্ক উঠেছে।

সমুন্দর বলে, আমাদের মাঝে একতাও নেই, ঔর কামিয়ারা তার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। পাঁচ জায়গায় খাটতে গেলে বাইরের লোক-জনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়, বেকার বদবুদ্ধি মাথায় ঢোকে। এ ঠিকেদার সকলকে একই জায়গায় রাখবে, শাসনে থাকবে···দুই-তিন মাস ·

—যারা যারা যেতে চায়, যাক্।

—আরো কথা ছিল।

—বলুন না।

—এমন হতে পারে, যে ফরেস্ থেকে ওই মামলাধীন জমি নিয়ে নিল।

—নিয়ে নিল ?

—হতে পারে। জরিপে যদি দেখা যায় যে ওটা সরকারেরই ছিল, তাহলে নেবে।

—এ আপনার কোনো কৌশল।

ভৈয়া! এ প্রসঙ্গে আমি কোনো কথা বলব না। আপনারা যে যেমন ভাবে পারবেন, খবর নিবেন।

—আপনার কাছে কোনো খবর আছে ?

—শুনছি যে এমন হতে পারে।

—হলে কী হবে ?

—ক্ষতিপূরণ পাব ?

—সরকার জমি নিলে তো ক্ষতিপূরণ পাবারই কথা। কিন্তু এমন মামলা ও জমিতে যে, দেবে কাকে ?

—মালিককে।

—এখানে কে মালিক ? এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যত দাবীদার সবাই নিজকে নিজকে দাবীদার বললে কিছুই হবে না।

—তবে কী করা যাবে ?

—নিজেরা ভাবুন, খবরতালাস নিন। এক হতে পারে যে সবাই

মামলা উঠাব একসাথে ক্ষতিপুরণ বেটে নিব। কিন্তু রোহিত বর্মা যদি ল্যাণ্ডরেভিনিউ কমিশনে আসে, তাহলেই মুশকিল।

—কেন ?

—পুরানো কাগজ ঘাঁটলে দেখা যাবে ও জমি আদিবাসীদের। আর কোন্ আদিবাসীদের ?

সবাই এ সংবাদ সবিশেষ চমকিত হয়। রোহিত বর্মা অত্যন্ত সৎ, অত্যন্ত কড়া ও পাকা অফিসার। সে যে কোনো সময়ে দেড়শো বছরের পুরানো দলিল বের করতে পারে। আদিতে ওই জমি আদিবাসীর থাকলে পরবর্তী সকল হস্তান্তরই আইনের চোখে বেআইনি। খুবই সুখের কথা যে, আইনের একদা পবিত্র চোখে দীর্ঘকাল ছানি পড়েছে, গ্লুকোমা হয়েছে।

—আদিবাসীর···কোন্ আদিবাসীর, সরপঞ্চজী ?

—পারহাইয়া ও নাগেসিয়াদের। কেচকি খণ্ডই তাদের। আমরা তো কোনো কোনো জমির খাজনা এখনো মোরির বাপের নামে দিই। আর যে নাগেসিয়ারা পাহাড়ের ঢালে থাকছে পাহাড়িয়া ইঁদুরের মতন, ওরা ওই জমির মালিক।

— তবে তো জল বহুত ঘোলা।

—আমরা একতাবদ্ধ হয়ে থাকলে ঠিক বেরিয়ে যাব, লেকিন সবই সকলে ভাবুন।

সকলেই বোঝে যে এসব গোপন রহস্য প্রকাশ করে সরপঞ্চ হাতে পেল তুরুপের তাস।

গজানন বলে, হাঁ হাঁ, কাজ করতে যাক। আপনি ওই গোহুমনিকে পাঠান। ও থাকলে পরে গ্রামেঘরে ইজ্জত রাখা বহোত্ হি মুশকিল।

সমুন্দর বলে, তা কি জানি না ? মাগী এমন সতীপনা দেখাচ্ছে যেন ও জানকী মৈয়া। কোনো ছোঁড়াটোড়া যদি ফুসলেও ওকে বের করে নিত তো বাঁচতাম।

ভানুপ্রতাপ বলে, কোনো মতে টাউনে নিতে পারলে তো ভালো দামে বিকে যাবে।

নওনেহাল মুচকে হেসে বলে, ঠিকেদারজী ইচ্ছে করলেই পারেন। আপনার তো সেবা ধরম করতে একটা লোক দরকার হবে। গ্রামে এসে ঠিকেদার কি উপবাসী থাকবে?

লক্ষ্মণ সিং বলে, তোবা তোবা! ও সব কথা বলবেন না। তবে কাজের কথা বলব। আর কাজের কথা পাকা হলে মেয়েদের জন্যে শাড়ি ছেলেদের জন্যে ধুতি দেব। তাতেও অনেক কাজ হয়।

—ও গোহুমনি! সাবধানে যাবেন কাছে।

—কাটতে পারে, এমন কাছে যাব না।

এ ভাবেই কেচকি ও লাঠাটোলিতে অবস্থা বদলাতে থাকে। যারা এই সমগ্র ভূখণ্ডের মালিক, সেই নাগেসিয়া ও পারহাইয়ারা রাজী হয়ে যায় লক্ষ্মণের সঙ্গে যেতে। মোরি বলে, বাসনি! তুই যা। আমি থাকি, বাচ্চাদের দেখব এখন।

কামিয়ারা বেশ কিছু লোক রাজী হয়। ঘরে তো উপোস। সেখানে কেমন কাজ হয় দেখে আসি।

রাজী হয় না সাতবান, রাজী হয় না গোহুমনি।

লক্ষ্মণ সিং তার কথা রাখে। যারা যাবে, প্রত্যেককে দেয় নতুন ধুতি, নতুন কাপড়, পরিবার খরচার জন্যে দশ টাকা। দামগুলি লিখে রাখে নামের পাশে। একদিন এগুলি পাওনা থেকে কাটান যাবে। আজ দেওয়া হয় নিঃশর্ত দান হিসেবে।

গোহুমনির জন্যে একটি হলদে কাপড় নিয়ে ও গোহুমনির ঘরে যায়। আস্তে আস্তে বলে, কথা ছিল।

—কী কথা?

—কি করে শুরু করি...

—লাজ লাগছে?

—সত্যিকারের গোহুমনির মতো করিস না তো?...কাজ করতে যাবি না কেন?

—আমার ইচ্ছে।

—ঘরে পড়ে শুকাবি?

—কপালে থাকলে তাই হবে।

—আমাকে দেখাশুনা করার কাজ করবি ?

—কী করতে হবে ?

—আমি তো ঠিকাদারিতে ব্যস্ত থাকব সারাদিন। এই রেঁধে দিলি,...একটু দেখলি...

গোহুমনি চোখ কুঁচকে কি ভাবে।

—তোকে টাউন দেখাব, টাউন।

—টাউন ..দেখি, ভেবে দেখি।

—এই কাপড়টা···

—না বাবু! পনেরো টাকার কাপড়, হাত নেই, বহর নেই, এ তো আমরা হাটেই কিনি।

—ভালো কাপড় নিবি, ভালো কাপড় ?

—তুমি দেবে ?

—নিশ্চয় !

গোহুমনি হাসতে শুরু করে। বলে, যাও, বাবু। এখন ছেলেদের জ্যেঠা আসবে।

—আমি ভালো কাপড় আনব, তোকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

—কেন ?

—তোকে দেখে...

—বুঝেছি, এখন যাও।

পরে সব কথা শুনে সাতবান বলে, এটা ঠিক হয়নি। ও হয়তো আবার আসবে।

—আসুক। এবার এলে ওর গলাটা কেটে ছেলেমেয়ে নিয়ে পালাব।

—পালাবি কোথায়, লাঠা ছেড়ে ?

—পালাব না !

—না। আর এখন আমরা দুবলা হয়ে গেলাম। কত লোক চলে যাচ্ছে। মালিকরা না খচড়াই করে।

—কামিয়া থেকে ভিখারিও স্বাধীন।

—হাঁ, তাই তো।

—এখন মালিকরাই বলছে, যাও! বাইরে কাজ করো। কেন না তারা কাজ দিতে পারছে না। না কাজ, না লুকমা, যাও তোমরা ঠিকেদারের সঙ্গে। আর তোমার ভাইরা কাজ নিয়ে চলে গেল বলে কত দোষ হল।

— তোর জন্যে ডর লাগছে এখন।

—কেন?

—এমন একপাশে ঘর! আমি তো বিশাল নই। সোনা আর দানির জন্যে জীবনটা দিতে পারি। তাতে কি তোদের জীবনটা বাঁচবে?

—ওরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাক। তখন মোরি, বাসনির ছেলেমেয়ে তুমি, সব এখানে থেকো।

—তাই থাকতে হবে। ঠিকাদারটা এলে?

–আমি ঠেকাব।

সাতবান চলে যায়। মাচানের নিচে ছাগল। মাচানে সোনা ও দানির পাশে গোহুমনি। প্রত্যেহের মতো আজও সে প্রার্থনা করে, মৃতলোক থেকে ফিরে আসুক বিশাল।

সবাই বলেছে যে বিশাল মৃত। কেউ বলেনি যে বিশালের মৃতদেহ দেখেছে। গ্রামের শম্ভু রাওত ছিল সেখানে। সে বলে, সবই দলিত ও পিষ্ট দেহ। তবে লম্বাচওড়া জনই বিশাল।

সে বিশ্বাস করেনি, সাতবান বিশ্বাস করেনি। তবু ধরে নেয়া গেল যে সে মৃত।

এমন কাতর হয়ে এসো! এসো! বললে তো মৃত লোক দেখা দেয়। গোহুমনি তাই কাতর ব্যাকুলতায় বিশালকে ডাকে আর ডাকে। তারপর কাঁদে, তারপর ঘুমায়।

আর বিশাল আসে।

মৃত ব্যক্তি আসতে পারে অন্ধকারে। সে অন্ধকারে আসে।

দিনে লুকিয়ে থাকা, অন্ধকারে পথ চলা। খেয়ে না খেয়ে পথ চলা। চলতে চলতে আজ ভোরেই পৌঁছে গিয়েছিল এই জমিতে। কাশের ঝোপের মধ্যে পড়ে থেকেছে মড়ার মতন। জল-পিপাসায় ভাজাভাজা হয়েছে। সন্ধে হতে তবে দহে নেমে দুর্গন্ধ থকথকে জল খেয়েছিল খানিক। সত্তু ওর কাছে আছে। কিন্তু সত্তু খেলে তো জল চাই। ঘরের কাছে এসে এভাবে আটকে থাকা বড় কষ্ট।

রাত হল। আকাশে তারাগুলো ঘুরছে। বিশাল পোঁটলাটি বগলদাবা করে নিচু হয়ে এগোয়। কাছে আসছে ঘর, কাছে আসছে।

—সোনা কে মৈয়া!

গোহুমনি চোখ খোলে না। একেবারে সাড়া দিতে নেই। যদি অন্য কেউ হয়?

—এ সোনা কে মৈয়া! এই ঝালো, কী খচড়াই করছিস? আমি···আমি ··

—তুমি!

—নয় তো কে রে গাধী? বুড়ি বকরি, খচড়ি কাঁহিকা? গাধী! খচড়ী! বুড়ি বকরি! কত চেনা-চেনা শব্দ, কত চেনা গলা। হেসে কেঁদে অস্থির হয়ে ঝালো দরজা খোলে ও বিশালের গলা ধরে ঝুলে পড়ে, তুমি···। তুমিই তো! তুমিই তো!

—পানি দে পহিলে! পিয়াসে ছাতি ফেটে গেল।

এক ঘড়া জলই বিশাল খেয়ে নেয়। তারপর ঝালোকে বলে, বাইরে চল্ বাচ্চারা উঠে যাবে।

—উঠুক!

—না না, বাইরে চল্।

ঝালো হারিকেন নেয়। দুজনে হাত ধরাধরি করে দৌড়ায়। বড় বড় কাশঝোপ, কাঁকর পাথর জমি, বিশাল ঝালোকে জড়িয়ে ধরে।

—তুই ভেবেছিলি, আমি মরে গেছি?

—ইস্! কক্ষনো বিশ্বাস করি নি। সোনার জ্যেঠা করে নি, মোরি করে নি।

—হাতের সোহাগ-চুড়ি তো ভেঙেছিস।

—খবরটা এল···পাঁচজনে ভেঙে দিল...চুড়ি ভাঙলে কী হবে? চুড়ি তো পরা যাবে আবার।

—তা যাবে।

—কী হয়েছিল?

—আরে! মাটি চাপা পড়ে তো আমি মরি নি। কেমন করে বেঁচেছিলাম তাও জানি না। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল এগারো দিন পরে। তখন আর সেই জায়গায় ঢুকতে পারি নি। একে তো রটিয়ে দিয়েছে যে বিশাল ভূঁইয়া মরে গেছে।

—শম্ভু রাওত বলল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। কেন কি শম্ভু রাওত বলল, ও তুমিই! লেকিন মুর্দার মাথায় চুল বহোত কম।

—তাহলে সেই সাঁওতাল হবে।

—সোনার জ্যেঠা আর আমি! আমাদের মনে খুব শান্তি হয়ে গেল। তোমার মাথাভরা চুল, ঘন কত! কিন্তু তারপরে তিন বছর কোনো পাত্তা নেই, তাতেই...

—ভাবলি যে এবার মরেছে, তবে সাঙ্গা করি।

—ওঃ। দশটা সাঙ্গা করতে পারতাম।

—করলি না কেন?

—তুমি এসে চিপাবে না?

—আবে, আমি তো সে কাজের জায়গায় ঢুকতেই পারছি না। পুলিসে পুলিসে ঘেরাও। আমি কাছাকাছি লুকিয়ে থাকছি যে, ঠিকেদারকে মারব, আর ওভারসিয়ারকে। তা ঠিকেদার তো ভেগে গেছে। ওভারসিয়ার বেটা কোম্পানি থেকে মোটা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে লেগেছে।

—তোমার নামেও?

—সবার নামে। ধরলাম তাকে। টাকা দাও, নয় তো জানে

মেরে দেব। সে চেঁচাতে লেগে গেল। দিলাম মাথায় রড বসিয়ে। বাস্! মরে গেল বলে মালুম হল। তখন বুঝলাম যে ধরতে পারলে কোম্পানি তো আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে ব্যাস্ ভেগে গেলাম।

—পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে?

—হাঁ রে! কোথা টাটানগর, কোথা কলকাতা, কোথা পাটনা, কাজ পাচ্ছি তো চলে যাচ্ছি। তারপর, সাতদিন আগে রাঁচিতে ওহি ওভারসিয়ারকে দেখলাম। এই রোগা, লাঠি ধরে যাচ্ছে। ও আমাকে দেখে নি। কিন্তু একে তাকে পুছতাছ করে জানতাম ওই হচ্ছে হরবিশাল ওভারসিয়ার। দেখ কাণ্ড! ও মরে নি। আর আমি যেন ভূতের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে...

—এতদিন লাগল আসতে?

—এখানকার হালচাল জানি না। ওই ওভারসিয়ার আর ঠিকেদার এখানে কোনো ঝামেলা করেছে কিনা জানি না। তাতেই সাবধানে সাবধানে···

—যাক্! তুমি তো এসে গেছ।

—হ্যাঁ, ঘরে চল্।

—চলো।

—দাদার ঘরে যাই। ছেলেরা দেখলে সকালে হাল্লা তুলবে।

—যাবে। তাই চলো।

—সেও তো বহোত ভাবছে, তাই না?

—বহোত্। ঠিকেদার···

—চল্, পরে শুনব।

সাভবানের ঘরে চলে যায় ওরা। সাভবান বলে, সণ্ড্, খা, ঘুমা। কাল কথা হবে।

—মালিক সেই শও টাকার দাদ উঠাবে।

—কিসের শও টাকা? কালই বলে দিচ্ছি। না কেউ ঠিকেদারের সঙ্গে যাব, না কামিয়ৌতি খাটব আর। এখন তুই এসেছিস বুকে সাহস বেড়ে গেছে আমার, জানলি বিশাল?

—কামিয়ৌতি খতম করবে ?

—কোথাও কোথাও করেছে। বহোত চেষ্টায় করেছে। আমরাই বা পারব না কেন ?

—এখন তো খুব আকাল।

—আমরা কবে খাই ?

—হ্যাঁ, যা করতে হবে, তা তাড়াতাড়ি···

—মাধো সিংয়ের কাছে যাই আগে।

—তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই দাদা। এখন আমি এসে গেছি, এবারে সব করে ফেলব।

···হ্যাঁ···মালিকরা আছে···

—খবর নিয়েছি টাউনে। সকলের টিপ দিয়ে দরখাস্ত একটা সদরে ··

—অনেক, অনেক কাজ···

বিশাল ঘুমিয়ে পড়ে। কয়েকঘণ্টা আগেও সে ছিল মৃত, এখন সে জীবিত। সাতবান ও ঝালো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সবাই বলাবলি করত, সাতবান ও ঝালো কেন ঘর বেঁধে নেয় না। এমনটা তো অস্বাভাবিক নয়। একা সাতবান ও ঝালো জানত যে তা হয় না, হতে পারে না। কেননা ওরা কথনো মানে নি যে বিশাল মরে গেছে।

—ঘর যাক্‌ সোনার মৈয়া, ঘর যাক।

—দোরে আগড় দিক সোনার জ্যেঠা, আগড় দিক্‌।

—সোনা যেন আমার থালাটা নিয়ে আসে।

—না। এখন থেকে ও ঘরেই খাওয়া-দাওয়া হবে।

সাতবান বিড়ি ধরায়। ঝালো বেরিয়ে আসে। এ ভাবেই একটি নিরুচ্চার, ভারি প্রগাঢ় হৃদয় সম্পর্কের অবসান ঘটে। সাতবান এতদিন বড় যত্নে, বড় স্নেহে ঝালোদের আগলে রেখেছিল।

পরদিন বেলা হতে থাকে, নতুন রঙরুট কুলি রেজারা তখনো আসে না। সবাই নতুন কাপড় পরেছে। তারপর কেন গেছে গোহুমনিদের বাড়ি, কে জানে।

ওই টাকা, আগামের টাকা দিয়ে চাল-নুন-তেল-মশলা কিনেছে। মোরি পারহাইয়া একটি শুওর বেঁধে টেনে নিয়ে গেল। ঢোলই বা বাজছে কেন? সমুন্দর হতাশ ক্রোধে বলে, পোকামাকড় যত। ওখানে বোধহয় সাতবান আর গোহুমনির সাঙ্গা লাগিয়ে দিল। চলুন তো, দেখা যাক? এদের ভালো করবে কে? লাথ আর পয়জারেই ভালো থাকে ওরা।

ঢোলক বাজাছে, গান হচ্ছে, সবই দূর থেকে শোনা যায়। নওনেহাল, ভানুপ্রতাপ, সমুন্দর, লক্ষ্মণ, সবাই এগোয়। ভানুপ্রতাপ বলে, কাজে চলে যাবে তাই খানাপিনা করে নিচ্ছে। এরা তো যা পায় তাই উড়ায় তাতেই দুখ্ ঘুচে না।

গোহুমনির উঠোনে আনন্দ, মহা আনন্দ। গোহুমনির হাতে চুড়ি, দু কপালে সিঁদুর। মোরি বুড়ো শরীর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে সাতবানের সঙ্গে নাচছে। বেশ কিছু বোতল চলেছে ও চলছে। সমুন্দর মাথা নাড়ে। সাতবান আর গোহুমনি। সেই সাঙ্গাই করলি। মাঝে তিন বছর সতীত্ব দেখালি।

তারপরই ওরা চমকে, থমকে দাঁড়ায়। ঢোলক গলায় প্রমত্তচরণে প্রসন্ন হেসে এগিয়ে আসে বিশাল ভূঁইয়া।

—বিশাল, তুই।

বিশাল এখন ভীষণ মাতাল।

—হাঁ মালিক। সেই শও রূপেয়ার কোনো হিসাব দিব না। আমার—কামিয়ৌতি—খতম।

এবার সে লোমশ, লম্বা হাতটি বাড়ায়।—আইও, আইও বাবু লছমণ সিং ঠিকেদার। থোড়া হিসাব তোমার সঙ্গে তো আছে। সতেরোটা জান লছমন বাবু?

লক্ষ্মণ সিং ঠিকেদার বোঝে, তার নিয়তি তাকে ধরে ফেলেছে। সে সমুন্দরের দিকে চায়। লাঠা টোলির লোকেরা মালিকদের, লক্ষ্মণকে ঘিরে ঘন হয়ে চেপে আসে। সকলকে জ্যান্ত গোহুমন মনে হয়। নিঃশ্বাসে মৃত্যু।